সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ষষ্ঠ ভাগ।

১৮৮৮।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেণেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পত্রাঙ্ক।
অধ্যবসায় (প্রাপ্ত) ...	শ্রীবিনোদ লাল ঘোষ	১১৬
অন্ধের চক্ষু	শ্রীভুবনমোহন রায়	৩
আর্কিয়প্টেরিকস্ (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৪৮
আদর্শ-বালক	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩৩
আদর্শ-শিক্ষা	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	৮১, ১০২
আমরা	শ্রীভুবনমোহন রায়	১২৩
আলেকজেণ্ডার সেলকার্ক ...	শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ ...	১২৮, ১৪২, ১৪৯
আলোক-পরীক্ষা (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৬৭
আলোক-বিজ্ঞান (সচিত্র) ...	ঐ	৯৯
ঔদারতা	ঐ	৯৭
উদ্ভিদের আহার	শ্রীভুবনমোহন রায়	১০৯
উপহার	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার	১১৪
একটা গল্প (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৫৯
কাগজের খেলনা	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর	১১৩
কুকুরের বুদ্ধি	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	১৬০
[illegible] গেল মা? (পদ্য) ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	৮৮
[illegible]	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	৭৬
[illegible] (প্রাপ্ত)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪৮
[illegible]তি (পদ্য) ...	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১২১
[illegible]খী (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৭১
চন্দন	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর	১৪০
ছিয়াত্তরের [illegible]র ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৭৩
জগন্নাথ (সচি[illegible] ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১১৭
জলকণার গল্প	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি বি, এ ...	২৯
টর্নেডো বা ঘূর্ণবায়ু	শ্রীভুবনমোহন রায়	৫৯
ঠগী	ঐ	৬
তীতুমীর	ঐ	১৫৬
দুইখানি ছবি	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু	২৬, ৩৩, ৫৫
ধাঁধা (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৪৩
ধাঁধা	——— ...	৩২, ৪৮, ৬৪, ১৬০, ১৮৮
নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ বি, এ	১১
ঐ ঐ	ঐ	৪৯

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পত্রাঙ্ক।
নাগাজাতি (সচিত্র) ...	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	১৭, ৩৮
নানাকথা	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৭৭
নিষ্ঠুর আমোদ (সচিত্র) ...	ঐ	১৩২
নীতি ও বিদ্যা (প্রাপ্ত, পদ্য) ...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার	২২
নূতন খেলা (পদ্য) ...	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭০
পথের ছবি	শ্রীভুবনমোহন রায়	৭৯
পরিশ্রমের ফল (প্রাপ্ত) ...	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৪
পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ...	শ্রীবিহারীলাল গুহ বি, এ	২৫
প্রকৃত গৌরব (পদ্য) ...	ঐ	১৩৭
পৃথিবীর পূর্ব্ব কথা ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৫১
ফুলের সাজি	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২৪, ১২৯, ১৫৩
ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল (সচিত্র) ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	৫০, ৮৯
বসন্ত (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ বি, এ	৪৩
বালকের সততা	শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন বি, এল	
বাড়বানল	শ্রীভুবনমোহন রায়	
বিড়ালের স্মরণ শক্তি ...	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	
বিভিন্ন জাতির অভিবাদন প্রথা ...	ঐ	
বিলাসের শিক্ষা (প্রাপ্ত) ...	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী	
বীরত্ব	শ্রীভুবনমোহন রায়	
ভাই বোন	শ্রীবিহারীলাল গুহ বি, এ ...	৩১, ৯৩, ১৩৮, ১৪
ভিখারিণী (পদ্য)	শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
ভুলুবাবু ও তাহার বিড়াল (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সচিত্র) ...	ঐ	
মামথ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	
মুক্তি-ফৌজ ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার	
রাগ (পদ্য)	শ্রীমতী মাঃ	৩০
রামকৃষ্ণ পরমহংস (সচিত্র) ...	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৬১
লর্ড ল্যান্সডাউন (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৭৯
ষষ্ঠ বর্ষ	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	১
সত্য-প্রিয়তা	শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত	১৬৬
স্বভাব যায় না মলে আর ময়লা যায় না ধুলে	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	১১১
সাঁওতাল জাতির বিবরণ ...	ঐ	১২
সাজি	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৫, ৯৪
সোণার খনি (সচিত্র) ...	শ্রীবিহারীলাল গুহ বি, এ ...	৮

সিকদার বাগান
সন ১২৯৩ সাল।
... পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার

জানুয়ারি, ১৮৮৮।

ষষ্ঠ বর্ষ।

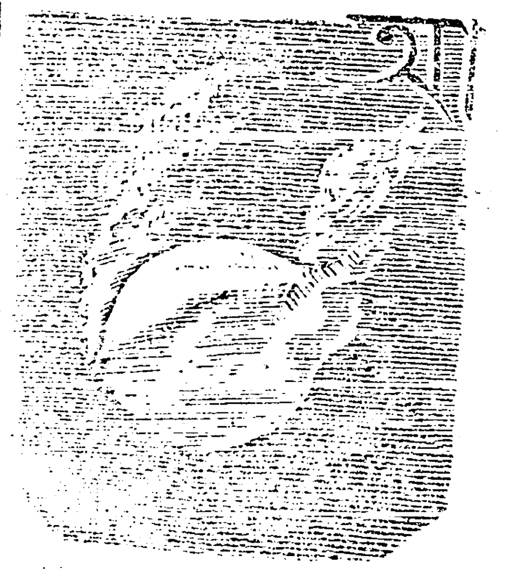

আজ আমাদের কি সুখের দিন। "সখা" দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাল বালক বালিকাদের বন্ধুর কাজ করিয়া আজ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাতে বালক বালিকাদের মনে সুরুচির ভাব উদিত হয়, যাহাতে তাহারা অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে ভালবাসে, যাহাতে তাহারা বিদ্যাভ্যাসে রত হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জনক্ষম হয়, যাহাতে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদের মন আনন্দিত করিতে শিক্ষা করে, যাহাতে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে মন প্রস্তুত করে—ইহাই 'সখা'র প্রধান উদ্দেশ্য। এই কয়েক বৎসরে সকল কর্ত্তব্য পালনেই যে 'সখা' কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা যে, এই পাঁচ বৎসর কাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। সমস্ত বঙ্গদেশের বালক বালিকাদের মন গঠিত করা, ভাল দিকে আকৃষ্ট করা এক সংবাদ পত্রের উপদেশ দ্বারা অসম্ভব। তবে, যাহারা 'সখা'র গ্রাহক হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 'সখা'র উপদেশ মত কাজ করিলেই "সখা"র জন্ম সফল হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে।

দুই জন বালক-গ্রাহক 'সখা' পরিচালন সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এই স্থানে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'সখা'র দোষ কেহ দেখাইয়া দিলে আমরা তাহা অবনত মস্তকে সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু কেহ অন্যায় রূপ দোষারোপ করিলে তাহাও আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। এক জন আমাদের নিকট লিখিয়াছেন যে,আমরা 'সখা'র অর্থোন্নতির দিকেই বেশী আকৃষ্ট,—'সখা'র দ্বারা মাসে মাসে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু কিসে 'সখা' বালকদের সখার কাজ করিবে সে দিকে মন দিতেছি না। আরও লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগর হইতে যে একটী বালক একটী প্রবন্ধ 'সখা'য় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত না হইয়া অন্য এক জনের রচনা প্রকাশিত হইল কেন?

এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর এস্থানে দেওয়া আবশ্যক। আমাদের অনুমানে বোধ হয় যে, এই বালকটীই প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে ছিলেন। সে স্থান

হইতে ইনিই একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবন্ধ প্রকাশ করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। উপযুক্ত না হইলে আমরা প্রকাশ করি না। বালক বালিকাদের প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু যে রচনা পাঠে অন্য গ্রাহকের উপকার হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই সেরূপ রচনা আমরা প্রকাশ করি না। যে সমুদয় বালকেরা 'সখা'য় কোন রূপ রচনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের দুইটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—প্রথমতঃ বিষয়টী এরূপ হওয়া চাই যে, তাহা পাঠে অন্যান্য গ্রাহকদের উপকার হইবার সম্ভাবনা; এবং দ্বিতীয়তঃ রচনাটীর ভাষা সরল হওয়া চাই। যাহারা এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন তাহাদের প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করিব।

এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। 'সখা'র দ্বারা এই পাঁচ বৎসরে একটী কাণা কড়িও লাভ হয় নাই। এই বালককে আমরা আরও বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি যে,এই কয়েক বৎসরে 'সখা'য় প্রায় ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে। 'সখা'র যে রূপ গ্রাহক সংখ্যা, এবং ইহার যেরূপ বাৎসরিক মূল্যের হার—ইহা দ্বারা ইহার মাসিক ব্যয় কোন মতেই নির্ব্বাহ হয় না। মাসে মাসে প্রায় ১০০৲ টাকা করিয়া আমাদের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

'সখা'র দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। 'সখা'র উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। 'সখা'র খরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং কিসে ভবিষ্যতে ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় এজন্য প্রত্যেক বিবেচক কার্য্যাধ্যক্ষের উপায় অবলম্বন করা উচিত। যেমন এক দিকে 'সখা'কে বালক বালিকার প্রকৃত বন্ধুর মত করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, নানাদেশের নানারূপ গল্প, নূতন নূতন ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি দ্বারা গ্রাহকদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেছি, অন্য দিকে আবার সেইরূপ যত্নের সহিত যাহাতে ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইতেছে। অর্থ ভিন্ন 'সখা'র আরও উন্নতি করা অসম্ভব। আশা করি আমাদের সমুদয় ঋণ এই বৎসরে শোধ হইয়া যাইতে পারে।

বিলাতে এই রূপ অনেক কাগজ আছে। তাহা হয়ত গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। কোন কোন কাগজের গ্রাহক সংখ্যা লক্ষাধিক। যে কাগজের গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী তাহার উন্নতি যে দিন দিন হইবে তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? বিলাতে খবরের কাগজ পড়া সকলেরই দৈনিক কাজ। আমরা যেমন প্রত্যহই মাছ, ডাল, তরকারী ইত্যাদি কিনিবার জন্য নগদ পয়সা দিয়া চাকরকে বাজারে পাঠাই; বিলাতের প্রত্যেক গৃহস্থই বাজার সামগ্রী ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন নূতন পুস্তক বা খবরের কাগজ কিনিবার জন্য চাকরকে পয়সা দেন। যাহারা ধনী তাহারা বার্ষিক চাঁদা একেবারে দিয়া বাড়ী বসিয়াই খবর কাগজ পড়েন,আর যাহারা দরিদ্র তাহারাই প্রত্যহ নগদ পয়সা দিয়া বাজার সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ ক্রয় করিয়া পড়েন। গাড়োয়ান পর্য্যন্ত কোচ বক্সে চড়িয়া, দোকানদারেরা দোকানে বসিয়া খবরের কাগজ পড়ে। যে দেশের আপামর সাধারণ লোকের পড়ার প্রতি এরূপ অনুরাগ, সে দেশের খবরের কাগজের উন্নতি না হওয়াই অসম্ভব।

আর আমাদের দেশের কথা ভাব। সমস্ত

বঙ্গদেশে 'সখা'র মত আর দ্বিতীয় কাগজ নাই। কত কাগজ বাহির হইল সকলই গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। বহুদিন হইল কেশব বাবু "বালক-বন্ধু" বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। ঠাকুর বাড়ী হইতে "বালক" বাহির হইয়া তাহাও গ্রাহকাভাবে উঠিয়া গেল। ইহা ভিন্ন আরও দুই এক খানি ছোট রকমের কাগজ বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র দেখা দিয়াছিল; কিন্তু বেশী দিন টিকিতে পারে নাই।

এখন কেবলমাত্র "সখা"ই বঙ্গদেশে বালক বালিকাদের সখার কাজ করিতেছেন। এই পাঁচ বৎসর এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ করা যাইতেছে না। এদেশে এখনও সংবাদ পত্র পড়িবার আবশ্যকতা সাধারণ লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এই জন্যই এত দুরাবস্থা।

আর একজন গ্রাহক লিখিয়াছেন যে,এই পাঁচ বৎসরকাল তিনি "সখা"র গ্রাহক আছেন, কিন্তু অন্যান্য সংবাদ পত্রের গ্রাহকদের ন্যায় উপহার পাইলেন না। এই দুঃখে দুঃখে তিনি গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লইলেন। এইরূপ শ্রেণীর লোককে আমরা এই বলিতে চাই যে, নানারূপ বাহ্যিক প্রলোভন দ্বারা গ্রাহক করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। 'সখা'য় লিখিত উপদেশ দ্বারা গ্রাহকদের মন সুপথে পরিচালিত হইবে, বালকেরা "সখা"র প্রবন্ধাদি পড়িয়া নিজের উন্নতি করিবে, 'সখা' পড়িয়াই 'সখা'র গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবে এই আমাদের ইচ্ছা। অন্যান্য প্রলোভন কিছুই নাই।

যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় এই পাঁচবৎসর কাল নানারূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া "সখা" ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিতেছেন তাঁহাকে এই নূতন বৎসরে প্রণাম করি। আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে এ নূতন বৎসরে আরও নূতন উৎসাহে 'সখা'র অনেক উন্নতি দেখিতে পাইব।

অন্ধের চক্ষু।

গরের বাহিরে অতি অল্প দূরেই একটী সামান্য পল্লী। পল্লীটী অতি সামান্য, এখানে ধনীর বসতি নাই;—কেবল কতকগুলি দরিদ্র লোক এখানে বাস করে। এই পল্লীর মধ্যে একটী কুটীরের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী বালক এবং একটী বালিকা, এক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সেই কুটীরের সম্মুখে উদ্যানে বেড়াইতেছে। বালকের বয়স চৌদ্দ, বালিকার বয়স দশ। কুটীর খানি অতি সামান্য, কিন্তু কুটীরের সম্মুখের উদ্যানটী অতি সুন্দর; নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল ও নানাবিধ ফলে পরিপূর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় যে, অতি যত্নের সহিত উদ্যানটী তৈয়ার করা হইয়াছে।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ঐ সামান্য

পল্লীতে আজ যে চিত্র দেখিলে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল না। যাঁহাকে আজ বয়সের ভারে অবনত দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কত শক্তি সামর্থ্য ছিল। আজ যাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ সাদা দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটী কেশও সাদা হয় নাই। আজ যাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখিতেছ, যাঁহার মুখ কালিমা মাখা দেখিতেছ, দশ বৎসরের পূর্ব্বে সেই মুখখানি কত সুন্দর—কত প্রফুল্ল ছিল। আর চাহিয়া দেখ—যে চক্ষু আজ কোটরগত—জ্যোতিহীন দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই চক্ষু কত সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু মানুষের আজ যাহা আছে, কাল আর তাহা থাকিবে না, কালও যাহা থাকিবে, তার পর দিন আবার তাহাও থাকিবেনা; এই রূপে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সকল হারাইতেছি।

কেন, কি চিন্তায় ইহাঁর ললাটে আজ এ গভীর রেখা পড়িয়াছে, কিসের জন্য ইহাঁর মুখ কালিমা মাখা হইয়াছে, চক্ষু কোটরগত জ্যোতিহীন হইয়াছে? পূর্ব্ব কথা;—এবং এই দুটী বালক বালিকার চিন্তা। আজ যাঁহাকে পর্ণকুটীরবাসী দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বৃহৎ অট্টালিকার অধীস্বামী ছিলেন। কত দাস দাসী ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল, ধন ঐশ্বর্য্যে ইহাঁর গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না; দশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি অট্টালিকাবাসী ছিলেন, আজ তিনি পর্ণকুটীরবাসী; শত দাস দাসী যাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত, আজ তাঁহাকে উদরান্নের জন্য নিজের হাতে কাজ করিতে হয়। কিন্তু এ চিন্তা অপেক্ষাও তাঁহার অধিক চিন্তা, এই দুটী বালক বালিকার জন্য;—ইহাদিগের কি উপায় হইবে! বালিকাটীর জন্মের অল্প পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে; এক বৃদ্ধ পিতা ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই। বৃদ্ধ ভাবিতেছেন তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারা কাহার কাছে যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে।

কিন্তু বৃদ্ধ এ চিন্তা হইতে শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইলেন; আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুই বৎসর পরে বালক বালিকা দুটীকে অনাথ করিয়া বৃদ্ধ সংসার হইতে বিদায় লইলেন। পিতাকে হারাইয়া ইহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, সেই দিন হইতে ইহারা অকুল সমুদ্রে ভাসিল। কিন্তু দুঃখে লালিত পালিত হইয়া, দুঃখের মধ্যে জন্মিয়া ইহাদিগের,—বিশেষতঃ বালিকাটীর যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল। দুঃখই আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দেয়, যে সুখের মধ্যে লালিত পালিত হয়, সে প্রায়ই প্রকৃত শিক্ষা পায় না। দুঃখকষ্ট ধীর ভাবে কি প্রকারে সহ্য করিতে হয়, তাহা ইহারা শিখিয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে ইহারা অনাথ হইল বটে, কিন্তু ধীর ভাবে তাহা সহ্য করিবার সংকল্প করিল। শান্তি এই অল্প বয়সেই গৃহকার্য্য শিখিয়াছিল। মেয়েটীর নাম শান্তি; বৃদ্ধ দারুণ শোকের সময় ইহাকে পাইয়া, কতক শান্তি পাইয়াছিলেন, তাই ইহার নাম শান্তি রাখিয়াছিলেন। ছেলেটীর নাম সতীশ। সতীশ পরিশ্রম করিয়া যে সামান্য অর্থ আনিয়া দিত; শান্তি তাহা দ্বারাই কোন প্রকারে দিন চালাইত। ভাই বোনের মধ্যে অতিশয় ভালবাসা ছিল; উভয় উভয়কে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিত, সুতরাং অন্য দিকে অনেক কষ্ট থাকিলেও ভাই বোনে মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এই রূপে দিন যাইতে লাগিল,—একটী বোঁটায় দুটী ফুল ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ভাই বোনে বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময় এক স্থানে একটী খুব সুন্দর ফুল দেখিয়া শান্তি বলিল, "দাদা আমাকে ঐ ফুলটী আনিয়া দাও না।" সতীশ অমনি ফুলটী আনিবার জন্য দৌড়িলেন, বোনকে ফুলটী দিয়া সুখী করিবেন। ফুলটী কতকগুলি কাঁটাগাছের মধ্যে ফুটিয়া ছিল, সতীশ তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গেল, এবং তাহাতে তাহার গায়ে এবং দুই চক্ষে কাঁটা বিদ্ধ হইল। ফুল আর তোলা হইল না। শান্তি কোন মতে সতীশকে লইয়া কুটীরে আসিল, এবং দাদার অবস্থা ও যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। সতীশের অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু শান্তির কষ্ট হইবে বলিয়া সে কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া, শান্তিকে বুঝাইতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু শান্তি কিছুতেই বুঝিল না। পাড়ার লোকেরা, বিশেষতঃ এক ব্যক্তি ইহাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিত। চিকিৎসক আনিয়া, তখনই ইহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সতীশ অল্প দিন পরেই আরোগ্য হইল বটে; কিন্তু জন্মের মত চক্ষু দুটী হারাইল। এ ক্লেশ শান্তির বুকে গাঁথা হইয়া রহিল, তাহার জন্যই যে সতীশ চক্ষু দুটী হারাইল, তাহা আর সে ভুলিল না। এই অল্প বয়সেই বালিকার প্রফুল্ল মুখ খানিতে বিষাদের ছায়া পড়িল, তাহার ললাটে চিন্তার রেখা পড়িল। সতীশ আর এখন কোন কাজ করিতে পারে না; শান্তিই পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতেই কোন মতে দিন কাটে। সেই অবধি সতীশের সকল কাজই শান্তি করে, সতীশকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করে। যেখানে যায়, সতীশের হাত খানি ধরিয়া লইয়া যায়; সন্ধ্যার সময় সতীশের হাত খানি ধরিয়া বাগানে বেড়াইতে লইয়া যায়। তখন পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া শান্তি কতই না কষ্ট পায়। এখন শান্তিই অন্ধের চক্ষু। সতীশ চক্ষু হারাইয়াও শান্তির যত্নে ও স্নেহে কোন অভাবই বুঝেন না।

এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। জন্মিয়া অবধি দুঃখের উপর দুঃখ পাইয়া, এবং কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে বালিকার শরীর ভগ্ন হইল;—কঠিন যক্ষ্মা রোগ বালিকাকে আক্রমণ করিল। এই দুঃসময়ে সেই ব্যক্তি, এই অনাথ বালক বালিকাকে তাহার নিজ গৃহে লইয়া গিয়া, যত্নের সহিত বালিকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। রোগের অসহ্য যাতনায়ও শান্তি দাদার কথা বিস্মৃত হয় নাই। সে জানিত তাহার মৃত্যু নিকট; সেই জন্য সে আরও আকুল হইল। তাহার মৃত্যু হইলে আর কে তাহার দাদাকে এমন করিয়া সেবা করিবে, দাদাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিবে? ক্রমে আরও কিছুদিন গেল, শান্তিরও শেষ দিন উপস্থিত হইল;—শান্তির চক্ষের জ্যোতিঃ নিভিল। অন্ধ হইয়াও সতীশ এতদিন তাহা যেন অনুভব করিতে পারে নাই; আজ সে "অন্ধের চক্ষু" হারাইল। এক বোঁটায় দুটী ফুল ফুটিয়াছিল, একটী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। স্নেহের যে শেষ বন্ধন ছিল, সতীশ তাহা আজ হারাইল।

আরও ১০ দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ আর সেই কুটীরের সম্মুখের উদ্যানে সেই দুটী বালক বালিকাকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু এখনও প্রতি দিন দেখিতে পাইবে, সন্ধ্যার সময় একজন শান্তির সমাধির ধারে বসিয়া রহিয়াছে, আর তাহার অন্ধ চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রুজল সেই সমাধির উপর পড়িতেছে!

ঠগী।

আমরা বাঙ্গলার ঠগীদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া ঠগীদিগের কথা শেষ করিব। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই ঠগদিগের অত্যাচার খুব বেশী ছিল। এই সকল স্থানে ঠগদিগের যে প্রকার প্রতাপ ছিল, বেহার ও বাঙ্গলায় ততদূর ছিল না। দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেবল মাত্র স্থল পথেই ঠগীর অত্যাচার ছিল। কিন্তু বেহার বিশেষতঃ বঙ্গে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই ইহাদিগের অধিক প্রতাপ ছিল। গঙ্গা নদীর মোহানা ডায়ামণ্ড হারবার হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ইহাদিগের চলাচল ছিল। তা ছাড়া বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায়ও জলপথে ইহাদিগের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঠগদিগের মত বাঙ্গলার ঠগেরাও এক একজন দলপতির অধীন হইয়া চলিত। ইহারা নৌকায় থাকিয়া এই নৃশংস কার্য্য করিত। এক একজন দলপতির অধীনে পাঁচ সাত খানি হইতে পোনের ষোল খানি পর্য্যন্ত নৌকা থাকিত। এই সকল নৌকায় পাঁচ সাত জন বা আরও বেশী লোক থাকিত, ইহারা সকলেই ঠগ। ইহারা নানা বেশে নানা স্থানে থাকিত। কোথাও ব্যবসায়ী নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত, দলের কতক লোক ব্যবসায়ীর বেশ ধরিত, অন্য সকলে নৌকার দাঁড়ী মাঝি হইত। কোন স্থানে দলের কতক লোক যাত্রীর বেশ ধরিয়া যাত্রীর নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত। ইহা ভিন্ন এই সকল নৌকা যাত্রীদিগকে তীর্থে এবং অন্য কোন গ্রাম বা নগরে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তখন রেলপথ ছিল না, নৌকারই অধিক চলন ছিল; অনেক স্থানে এখনও রহিয়াছে। পথ হাঁটিবার ক্লেশের ভয়ে অনেকে নৌকায়ই যাতায়াত করিত। এবং এই সকল নৃশংসদিগের হাতে পড়িয়া জীবন হারাইত।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গলায় ঠগদিগের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই লোক ছিল। বাঙ্গলার ঠগদিগের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার মুসলমান, বর্দ্ধমান জেলার কায়স্থ এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চলের মালো জাতিই অধিক ছিল। মুঙ্গেরের নিকট এক স্থানে তিন জন বাঙ্গালী ঠগ ধরা পড়ে। এই তিন জনের নাম, গঙ্গাহরি মিত্র, মাধব এবং কানাই; ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাহরি মিত্র একজন অতি প্রসিদ্ধ ঠগ ছিল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। অবশেষে ইহারা আপনাদিগের দোষেই ধরা পড়ে। মুঙ্গেরের কাছে, দরিয়াপুর নামক স্থানে একদিন মাধব একটা বাঁশের চোঙ্গ হাতে লইয়া দৌড়িয়া একটা সরাইএ উপস্থিত হয়; গঙ্গাহরি এবং কানাইও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধব বলে যে, ঐ দুই ব্যক্তি ঠগ, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। ঐ বাঁশের চোঙ্গে কতগুলি টাকা আছে, ইহা তাহারা জানিতে পারিয়া তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। গঙ্গাহরি ও কানাই বলে যে, ঐ ব্যক্তি তাহাদের নৌকা হইতে ঐ টাকা চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে। ইহাদিগকে এই প্রকার গোলযোগ করিতে দেখিয়া এবং ইহাদিগের কথা বার্ত্তায়

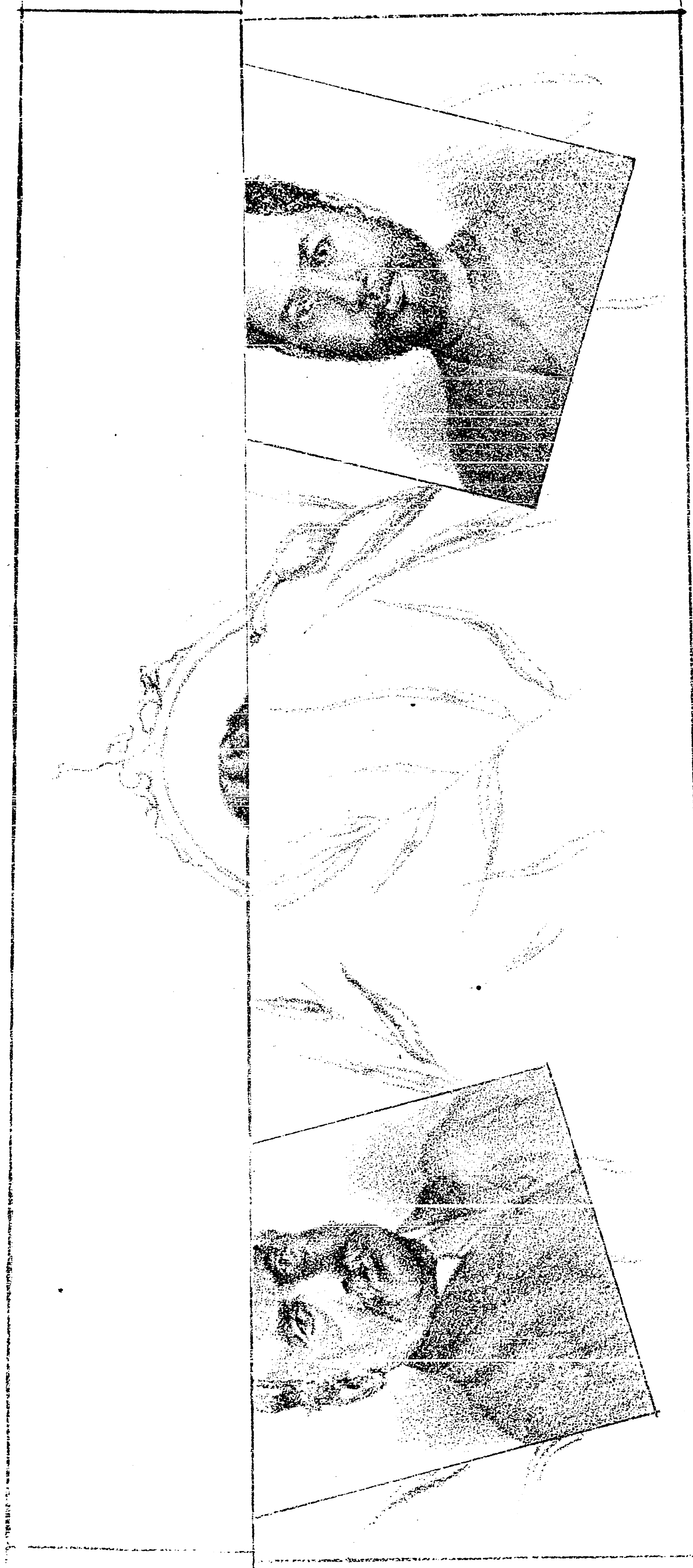

(১) মন মোহন ঘোষ
(২) নরেন্দ্র নাথ সেন
(৩) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
(৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(৫) কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠগী।

আমরা বাঙ্গলার ঠগীদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া ঠগীদিগের কথা শেষ করিব। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই ঠগদিগের অত্যাচার খুব বেশী ছিল। এই সকল স্থানে ঠগদিগের যে প্রকার প্রতাপ ছিল, বেহার ও বাঙ্গলায় ততদূর ছিল না। দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেবল মাত্র স্থল পথেই ঠগীর অত্যাচার ছিল। কিন্তু বেহার বিশেষতঃ বঙ্গে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই ইহাদিগের অধিক প্রতাপ ছিল। গঙ্গা নদীর মোহানা ডায়ামণ্ড হারবার হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ইহাদিগের চলাচল ছিল। তা ছাড়া বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায়ও জলপথে ইহাদিগের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঠগদিগের মত বাঙ্গলার ঠগেরাও এক একজন দলপতির অধীন হইয়া চলিত। ইহারা নৌকায় থাকিয়া এই নৃশংস কার্য্য করিত। এক একজন দলপতির অধীনে পাঁচ সাত খানি হইতে পোনের ষোল খানি পর্য্যন্ত নৌকা থাকিত। এই সকল নৌকায় পাঁচ সাত জন বা আরও বেশী লোক থাকিত, ইহারা সকলেই ঠগ। ইহারা নানা বেশে নানা স্থানে থাকিত। কোথাও ব্যবসায়ী নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত, দলের কতক লোক ব্যবসায়ীর বেশ ধরিত, অন্য সকলে নৌকার দাঁড়ী মাঝি হইত। কোন স্থানে দলের কতক লোক যাত্রীর বেশ ধরিয়া যাত্রীর নৌকা বলিয়া পরিচয় দিত। ইহা ভিন্ন এই সকল নৌকা যাত্রীদিগকে তীর্থে এবং অন্য কোন গ্রাম বা নগরে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তখন রেলপথ ছিল না, নৌকারই অধিক চলন ছিল; অনেক স্থানে এখনও রহিয়াছে। পথ হাঁটিবার ক্লেশের ভয়ে অনেকে নৌকায়ই যাতায়াত করিত। এবং এই সকল নৃশংসদিগের হাতে পড়িয়া জীবন হারাইত।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গলায় ঠগদিগের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই লোক ছিল। বাঙ্গলার ঠগদিগের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার মুসলমান, বর্দ্ধমান জেলার কায়স্থ এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চলের মালো জাতিই অধিক ছিল। মুঙ্গেরের নিকট এক স্থানে তিন জন বাঙ্গালী ঠগ ধরা পড়ে। এই তিন জনের নাম, গঙ্গাহরি মিত্র, মাধব এবং কানাই; ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাহরি মিত্র একজন অতি প্রসিদ্ধ ঠগ ছিল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। অবশেষে ইহারা আপনাদিগের দোষেই ধরা পড়ে। মুঙ্গেরের কাছে, দরিয়াপুর নামক স্থানে একদিন মাধব একটা বাঁশের চোঙ্গ হাতে লইয়া দৌড়িয়া একটা সরাইএ উপস্থিত হয়; গঙ্গাহরি এবং কানাইও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধব বলে যে, ঐ দুই ব্যক্তি ঠগ, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। ঐ বাঁশের চোঙ্গে কতগুলি টাকা আছে, ইহা তাহারা জানিতে পারিয়া তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। গঙ্গাহরি ও কানাই বলে যে, ঐ ব্যক্তি তাহাদের নৌকা হইতে ঐ টাকা চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে। ইহাদিগকে এই প্রকার গোলযোগ করিতে দেখিয়া এবং ইহাদিগের কথা বার্ত্তায়

একটু একটু সন্দেহ হওয়াতে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ইহারা ধৃত হইলে পরে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাধব, গঙ্গাহরি এবং কানাইকে ঐ টাকা হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, অবশেষে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইল।

কাপ্তেন লুইস্ সোনাতন দাস নামক বর্দ্ধমান অঞ্চলের আর একজন বিখ্যাত ঠগকে ধৃত করেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যখন ঠগীদিগের অত্যাচারের বিষয় গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন; তখনই এই ভয়ঙ্কর নৃশংস কাণ্ড যাহাতে রহিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রদেশে প্রদেশে ঠগীর অত্যাচার দূর করিবার জন্য এবং ঠগীদিগকে দমন করিবার জন্য কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইল। ইহাঁদিগের চেষ্টায় ও যত্নে ঠগীর অত্যাচার ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, এবং অবশেষে বেণ্টিঙ্কের সুশাসনে একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। তখন একটা রীতি এই ছিল যে, বিখ্যাত ঠগীদিগকে প্রায় কখনও প্রাণবধ করা হইত না। ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল, ইহাদিগের নিকট গভর্ণমেণ্ট অনেক সাহায্য পাইতেন। যে সমস্ত ঠগ ধৃত হইত তাহাদিগের হয় প্রাণবধ করা হইত, না হয় যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠান হইত। কিন্তু প্রধান প্রধান ঠগেরা নিজেরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, তাহা এবং অন্যান্য ঠগদিগের সন্ধান বলিয়া দিবে এমন প্রতিজ্ঞা যাহারা করিত, তাহাদিগকে আর ফাঁসি দেওয়া হইত না। কিন্তু ইহারা স্বাধীনতাও পাইত না। সর্ব্বদা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের চক্ষে চক্ষে থাকিত; কারণ একবার ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, আবার দল বল সংগ্রহ করিয়া নরহত্যায় লিপ্ত হইত। গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগের সাহায্য না পাইলে কিছুই করিতে পারিতেন না; ঠগীদিগের দমন করা অসাধ্য হইত। ইহাদিগের নিকট সন্ধান পাইয়া, ইহারা ঘরের কথা বলিয়া দেওয়াতেই, গভর্ণমেণ্ট এত শীঘ্র এই নৃশংস কাণ্ড রহিত করিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা ঠগীদিগের ভয়ে হয়ত আজও আমাদিগকে কাঁপিতে হইত। বর্দ্ধমানে রামলোচন সেন নামক আর একজন বিখ্যাত ঠগ ছিল; অনেক চেষ্টাতেও গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু এই রামলোচনের মাতুল শঙ্কর সরকারকে গভর্ণমেণ্ট ধৃত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন লুইস্ বলেন যে বাঙ্গলার ঠগদিগের মধ্যে শঙ্কর সরকারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং বিখ্যাত।

পাবনা জেলার কায়স্থ ঠগেরা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাদিগের অনেক মুসলমান অনুচর ছিল। ইহারা ঢাকা, ফরিদপুর, এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় ঠগদিগের সহিত একত্র হইয়া, ভগবানগোলা এবং কুমিল্লার মধ্যবর্ত্তী, গঙ্গার তীরবর্ত্তী সকল স্থানে, এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার সকল স্থানেই এই নৃশংস কার্য্য করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ঠগদিগের মধ্যে স্বরূপ দত্ত নামে এক জন বিখ্যাত ঠগ ছিল।

আমরা সংক্ষেপে ঠগীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে, "সখা"র স্থান হয় না। সামান্য যাহা লেখা হইল ইহাতে 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের তৃপ্তি হইল কি না জানি না। ঠগীদিগের সম্বন্ধে এমন সকল বিস্ময়কর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে, যে তাহা যতই শোনা যায় ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিলে কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে পারে। আজ ঠগদিগের

নৃশংস কাণ্ড আমাদিগের নিকট গল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যে সময় ঠগীর নামে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা, এবং কচ্ছ হইতে আসাম, এই বিস্তীর্ণ ভারতের এমন স্থান ছিল না, যেখানে ইহাদিগের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবিশ্রান্ত চলে নাই। অনেক স্থলে ধনী, জমীদার, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, এবং নিম্নশ্রেণীর পুলিশের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইহার প্রশ্রয় দিতেন; তাহা না হইলে ঠগীর অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি হইতে পারিত না। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে আজ সে সমস্ত অত্যাচার গিয়াছে, সমস্ত অত্যাচার দূর হইয়াছে।

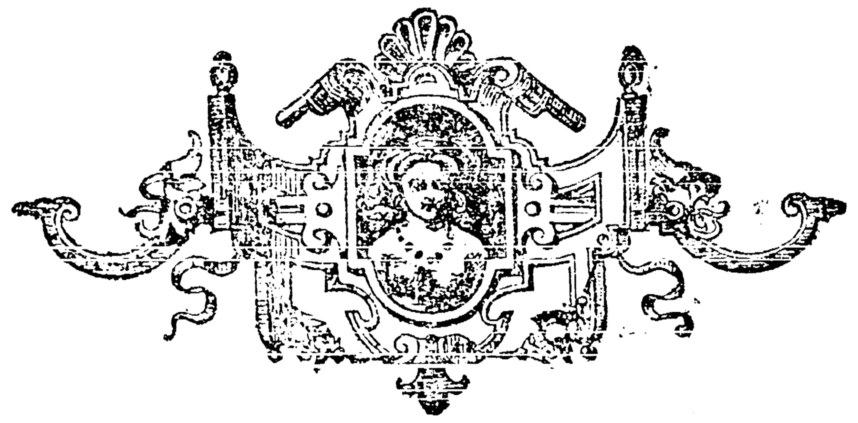

সোণার খনি।

বোধ হয় সকলেই সোণা দেখেছে। অনেকের ভাগ্যে সোণার মোহর দেখা না ঘটিতে পারে কিন্তু সোণার নানারূপ অলঙ্কার অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের না থাকিলেও পরের গায়ের গয়না দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা হইতে পারে। লোকের নিকট এই সোণার কত আদর তাহা সকলেই জান। অনেক মা, ছেলেকে আদর ক'রে "সোণা" "মনি" আরও কত কি বলিয়া ব'লে থাকেন, ইহাতেই বুঝা যায় সংসারে সোণার কত আধিপত্য। এখন একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সোণার এত আদর কেন? সোণারই বা এত আদর কেন, এবং অধিক উপকারী হইয়াও লৌহেরই বা এত অনাদর কেন? যাহারা "স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ" পড়িয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ লৌহের পক্ষই সমর্থন করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণের অনেক বেশী আদর। ইহা হইবার দুইটী কারণ আছে। ১ম,—স্বর্ণ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, যাহা অল্প পাওয়া যায় এবং পাইতে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহার আদর বেশী। একথা বুঝিতে বড় গোল হইবে না একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। আমরা প্রতিদিন দুইবেলা (অনেকে তিন বেলাও) ভাত খাই সুতরাং ভাত অতিশয় আবশ্যকীয় হইলেও তাহার বড় আদর নাই কিন্তু যে দিন লুচি কি পোলাও হয় সে দিন ছেলে বাবুদের আর আনন্দ ধরে না। সে দিন যেন বছরের একদিন। ২য়,—স্বর্ণের সৌন্দর্য্য ও এই সৌন্দর্য্যের স্থায়ীত্ব। সুন্দর পদার্থ দেখিলে আমরা আদর করি; একটা সুন্দর ফুল দেখিলে কতই আনন্দ হয়। তার পরে সেই সৌন্দর্য্য যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আরও কত আনন্দ! লোকে কত অসংখ্য বার চাঁদ দেখে—প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য দেখে—তথাপি তাহাদের সৌন্দর্য্যের আদর কমে না। এই জন্যই সোণার এত আদর।

আর আর ধাতু দ্রব্যের যেমন মাটির নীচে আকর পাওয়া যায় সেরূপ সোণারও পাওয়া গিয়া থাকে কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র ও নদীর তীরে, বালি ও কর্দ্দমের মধ্যেও সোণা পাওয়া যায়। এক রকম প্রস্তরের আকরের মধ্যেও সচরাচর সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সোণা পাওয়া যায় সেখানকার মাটী

কতকটা শক্ত শক্ত পাহাড়ের ন্যায়। যাহারা সোণা তুলিয়া থাকে তাহারা স্থান দেখিয়াই বুঝিতে পারে সেখানে সোণা পাওয়া যাইবে কি না।

আজকাল অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়া প্রদেশেই যথেষ্ট পরিমাণে সোণা পাওয়া যায়। অল্পদিন হইল এখানে স্বর্ণের আকর আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আসিয়াস্থ রুসিয়া, হঙ্গেরী, ব্রাজিল এবং ট্রন্সেল্‌ভেনিয়া প্রধানতঃ এই চারি প্রদেশেই সোণা পাওয়া যাইত এবং সমস্ত পৃথিবীর কার্য্য সেই স্বর্ণ দ্বারাই হইত। তখন পৃথিবীতে ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ আবিষ্কারের পর হইতে অতিশয় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর এই মহামূল্য সামগ্রী অতি সামান্য লোকের দ্বারা কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালিফর্ণিয়াতে কাপ্তেন সাটার এবং মার্সেল নামে দুইটী বন্ধু একটী কল চালাইতেন। জলের স্রোতে সে কল চলিত। একটী খাল খনন করিয়া জল আনিয়া সেই জলের বেগে কল চালান হইত। একদিন মার্সেল সাহেব শুনিলেন যে খালের এক স্থানটা বড় অপ্রশস্ত রহিয়াছে। তিনি লোকজন সঙ্গে করিয়া খাল প্রশস্ত করিতে চলিলেন। সাহেব সেই কাটা মাটিতে যেন কি চক্‌ চকে জিনিস দেখিতে পাইলেন। সেখানে সোণার মত চক্‌ চকে একরূপ পাথর পাওয়া যাইত; সাহেব প্রথম মনে করিলেন তাহাই বা হইবে। কিন্তু যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহা নয় এবং মাটি হইতে বাস্তবিকই সোণা উঠিতেছে তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার বন্ধুর নিকটে ছুটিলেন। সাটার সাহেব প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে মার্সেল পাগল হইয়াছে কিন্তু যখন সকল কথা শুনিলেন তখন তাঁহারও প্রত্যয় হইল। দুই জনে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গেলেন এবং সমস্ত দিন সোণা কুড়াইতে লাগিলেন। কাহাকেও কিছু বলা হইল না বটে কিন্তু একথা ছাপা রহিল না। একজন নিগ্রো তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া সকলই বুঝিল এবং সেও সোণা কুড়াইতে লাগিল। ক্রমে একথা রাষ্ট্র হইল এবং কয়েকদিনেই চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে লোক সোণার আশায় কালিফর্ণিয়ার দিকে ছুটিল। জিনিসের একগুণ দাম দশ গুণ বাড়িল। কালিফর্ণিয়ার নির্জ্জন স্থান লোকারণ্য হইল। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে প্রথম এই প্রদেশে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে এখান হইতে ১০ কোটী ৮১ লক্ষ ৯৭ সহস্র ৫ শত ৫২ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে। ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

তারপর অষ্ট্রেলিয়ার কথা। ১৮৫১ খৃঃঅব্দে কালিফর্ণিয়ার এই মহা ব্যাপারের কথা শুনিয়া এখান হইতে এডওয়ার্ড হারগ্রিবস্‌ নামে একব্যক্তি সেখানে সোণার লোভে গমন করেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, যে সকল জমিতে সোণা পাওয়া যাইতেছে তাঁহার দেশেও সেরূপ অনেক জমি আছে। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সোণার তল্লাস করিতে লাগিলেন। দুই মাস অনুসন্ধানের পর তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি স্বর্ণ আবিষ্কার করিলেন। এই আবিষ্কারের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ৬২৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন এবং যে সমস্ত স্থানে স্বর্ণ উৎপন্ন হইবে সেই সকল স্থানের কমিশনার নিযুক্ত করেন। এক বৎসরের মধ্যে এখান হইতে ইংলণ্ডে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার সোণা রপ্তানি হইয়াছিল।

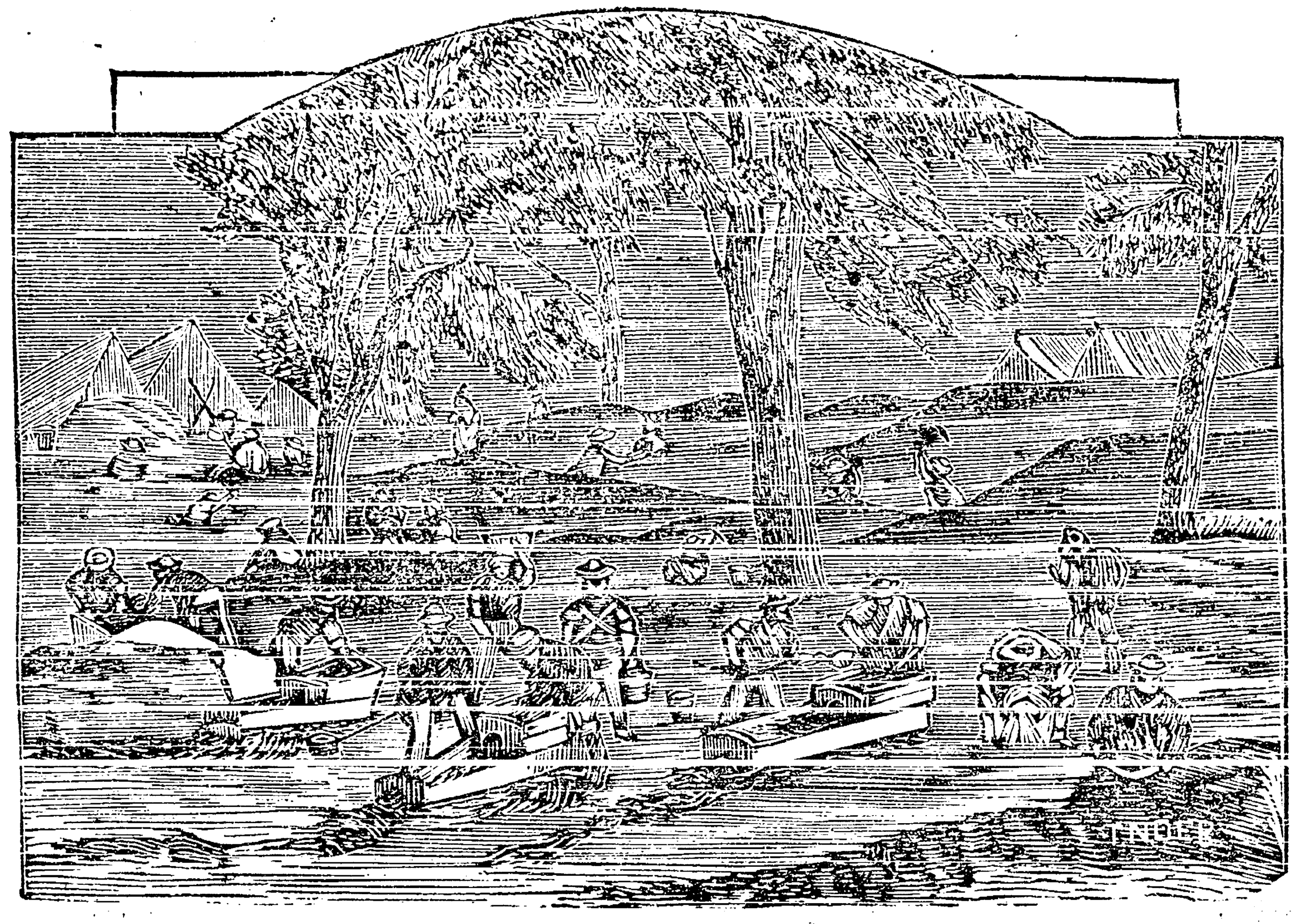

সোণা তুলিতে প্রায়ই চারিজন লোকের আবশ্যক হয়। ইহার কমে সুবিধা হয় না। তবে অনেক দলে বেশী লোকও থাকে। দুইজনে মাটি খুড়িতে থাকে। একজন সেই মাটি একটা চালনের মত যন্ত্রের উপর ফেলে এবং আর এক জন তাহার উপর জল ঢালিতে থাকে। যত মাটি ও বালি জলের সঙ্গে চলিয়া যায় তাহার উপরে সোণার টুকরা থাকে। এই প্রণালীতে অনেক সোণার টুকরাও মাটির সঙ্গে চলিয়া যায়। এজন্য কালিফর্ণিয়া দেশে আর এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। পারদপূর্ণ এক পাত্রের ভিতর দিয়া মাটি চালিয়া দেওয়া হয়; সোণার টুকরা গুলি পারদের আকর্ষণে লাগিয়া থাকে এবং মাটি সরিয়া যায়। অবশেষে আগুনের উত্তাপে পারা হইতে সোণা পৃথক করিয়া লওয়া হয়। কেবল যে সোণার টুকরা পাওয়া যায় তাহা নয়। মাঝে মাঝে বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডও পাওয়া গিয়া থাকে। মাটির অধিক নীচে আকরে যে সমুদয় সোণা পাওয়া যায় তাহা তুলিতে অধিক কষ্ট ও পরিশ্রম হয়। পাথুরে কয়লা প্রভৃতি যেরূপে তোলা হয় ইহাও সেইরূপে তুলিতে হয়। আকরের স্বর্ণ প্রায়ই একরূপ প্রস্তরের খনিতে পাওয়া যায়।

সোণা কি কি ব্যবহারে লাগে তাহা বোধ হয় সকলেই জান। আমাদের দেশে যেমন রূপার টাকা প্রচলিত, ইউরোপের অনেক দেশে তাহা নহে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত। তার পর অলঙ্কার ও অন্যান্য নানারূপ বিলাস-দ্রব্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজাদের সোণার সিংহাসন ছিল এ কথা অনেকেই শুনিয়াছ। এখন পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৩০ কোটী টাকার সোণার আমদানি রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ২০ কোটী টাকার সোণার অলঙ্কার ও অন্যান্য বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সোণা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া রূপার দর কমিতেছে। পূর্ব্বে বিলাতের পাউণ্ডের দাম আমাদের ১০৲ টাকা ছিল এখন ১৩৲ টাকারও উপর উঠিয়াছে। এইরূপ ভাবে

কিছু দিন চলিলে এ দেশের যে কি গতি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। বিলাতে আমাদের যে টাকা পাঠাইতে হয় তাহা পাউণ্ডের হিসাবে দিতে হয় সুতরাং আমাদেরই লোকসান। এই জন্য এখন বইর দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কাল এই প্রশ্ন লইয়া এদেশের এবং বিলাতের সংবাদ পত্রে ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। মীমাংসা এখনও কিছুই হয় নাই।

নব বর্ষ।

১

দেখিতে দেখিতে হায়!
বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ পড়িয়ে থাকে কতই কামনা
হৃদে উঠে দীর্ঘ শ্বাস "কিছুই হলোনা!"

২

স্মরি যবে গত কথা
বড়ই ব্যথিত প্রাণ;
আত্মগ্লানি অনুতাপে
হৃদয় মলিন ম্লান।
কে যেন সান্ত্বনা দিতে আসিয়ে তখন
ধীরে ধীরে বলে এই মধুর বচন।

৩

"অতীতের দুঃখ কথা
অনুতাপ ভুলে যাও;
সম্মুখের পথ পানে
ফিরে চাও ফিরে চাও;
আশা কর নববর্ষ আসিছে আবার।
নূতন উৎসাহে কার্য্য সাধ আপনার।

৪

"দেখ নাকি স্রোতস্বতী
উৎসাহে নূতন জলে
পূর্ণ হয়ে বরষায়
কেমন আনন্দে চলে!
সে উদ্যমে বাধা দেয়
হেন সাধ্য আছে কার?
আশা কর নববর্ষ
আসিতেছে পুনর্ব্বার।

৫

"দেখ নাকি বৃক্ষগুলি
বসন্তের আগমনে
নব পত্রে শোভা পায়
কেমন আনন্দ মনে!
উৎসাহে পবন ভরে
দোলে ফুল দোলে পাতা
তারা কি তখন কাঁদে
স্মরিয়ে পূর্ব্বের কথা?
তবে কেন বৃথা দুঃখ ক্রন্দন অসার?
আশা কর নববর্ষ আসিছে আবার।

৬

"প্রকৃতি-নিয়ম দেখি
শিখ এই সার কথা;—
অনর্থক দুঃখ করি
দিন না কাটায়ো বৃথা।
সম্মুখে রয়েছে যাহা
তারি কর ব্যবহার;
ঈশ্বরে স্মরণ করি
সাধ কার্য্য আপনার।"

সাঁওতাল জাতির বিবরণ।

সখার পাঠক পাঠিকা! সাঁওতালের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ; ধাঙ্গড়, পাহাড়ী এবং কোলদিগের মত ইহারাও ভারতের আদিম অধিবাসী। বাঙ্গালার পশ্চিম সীমাতে যে সকল জঙ্গল এবং পাহাড় আছে সাঁওতালেরা সেই সকল জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে। ঐ সকল জঙ্গল এবং পাহাড় পালামৌ, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা এবং মহকুমার অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা এবং বেহারের মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের নিকটে যে সকল সমতল স্থান আছে তাহাতে এত সাঁওতালের বাস যে, ঐ সকল স্থানের নাম "সাঁওতাল পরগণা" হইয়াছে।

সাঁওতাল দেখিতে যদিও অনেক পরিমাণে ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মত কিন্তু ঐ সকল জাতি অপেক্ষা যে ইহারা বেশী বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মিষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায়ই কাহারো গোঁপ দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমরা মনে করিও না যে, ইহারা গোঁপ দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইহাদের গোঁপ দাড়ি উঠেই না। সাঁওতালেরা খুব শিকারী, এবং কৃষিকার্য্যেও বেশ দক্ষ। আত্ম নির্ভরের ভাব ইহাদিগের প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আলস্য কাহাকে বলে একেবারেই জানে না। এই সকল কারণে সাঁওতালদিগের মধ্যে এমন পরিবার কিম্বা ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না যাহারা আহার অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অবশ্য তাহাদিগের দোতালা বাড়ী নাই, ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল জামা নাই, বিলাসের জিনিশ কিছুই নাই, কিন্তু তাহাদিগের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত যতই পড়িবে, তাহাদিগের বিষয় যত সমালোচনা করিবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, ঐ সকল জাতির অনেকের অপেক্ষা সাঁওতালদিগের অবস্থা বেশী উন্নত। কৃষি বিষয়ে নিপুণতা, ধৈর্য্য, এবং শ্রমদক্ষতা তাহাদিগের এই উন্নতির কারণ। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের জাতীয় প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সাঁওতালেরা অধিক দিন একস্থানে বাস করিত না। চাষ বাসের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কখন এস্থান কখন অন্য স্থান করিয়া বেড়াইত। সাঁওতালেরা যেখানে যায় সে স্থান হাজার জঙ্গল হইলেও তাহা পরিষ্কার এবং কৃষির উপযুক্ত করিয়া লয়। আপন পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্ত যতই কেন পরিশ্রম করিতে হউক না, সাঁওতালেরা তাহা প্রফুল্ল চিত্তে স্বীকার করে। প্রাণান্তেও অপরের দাসত্ব স্বীকার করে না। সাঁওতালদিগের এই সকল স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সঙ্গে যদি শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে মণি কাঞ্চনের যোগ হইত।

আজ কাল কিন্তু ইউরোপীয় মিশনরিদিগের প্রসাদে অনেক স্থানে সাঁওতালেরা সুন্দর শিক্ষা পাইতেছে। পাঠক পাঠিকা! তোমরা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সকল সৎশিক্ষা পাইতেছ, সাঁওতালেরা তাহা পায় নাই। যদিও তাহাদিগের চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রাচ

তাহাদিগের মধ্যে এমন সকল সদ্‌গুণ আছে যাহা তোমাদিগের অনুকরণীয়। যদি যথার্থ মনুষত্ব লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমরাও সাওতালদিগের মত শ্রমদক্ষ এবং ধৈর্য্যশীল হও, এবং আত্ম নির্ভর শিক্ষা কর।

অন্য অন্য আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় সাঁওতালদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য, সচরাচর প্রায় একখানি কৌপিন মাত্র, কিন্তু স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অনেকটা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মহিলাদিগের মত। কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই অলঙ্কার ভাল বাসে, এবং নানাপ্রকার পুষ্প এবং পাখীর পালক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন শিল্প নিপুণতা অনুসারে নানা সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা পিত্তল, কাঁসা নির্ম্মিত অলঙ্কারও ব্যবহার করে।

জনার, ভুট্টা, হাঁস, কুক্কুট, মাংস ইত্যাদি ইহাদিগের প্রধান খাদ্য, আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; তবে কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের সহিত পূর্ব্বকালের শত্রুভাবশতঃ তাহাদিগের ছোঁয়া কোন দ্রব্য আহার করে না। আমরা কিন্তু যে সকল সাঁওতালের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি তাহারা এ কথা অস্বীকার করে।

সাঁওতালদিগের কুটীরগুলি সুনির্ম্মিত এবং পরিষ্কার, অনেকে আবার দেয়ালে নানাবর্ণের নানাপ্রকার ছবি এবং লতা পাতা আঁকিয়া রাখে। প্রতি সাঁওতাল পল্লির ঘরগুলি একটী প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে সন্নিবেশিত। প্রত্যেক বাড়ীতেই গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের থাকিবার স্থান আছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন সাঁওতালেরা প্রায় সকলেই মহিষ পুষিয়া থাকে, এবং দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়, সামান্য বাঁসের এমন সুন্দর সুন্দর বাঁশী প্রস্তুত করে যাহার সুস্বরে এমন হৃদয় নাই যে মুগ্ধ হয় না। ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মত প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লিতেও এক একটী নৃত্য গীতের আড্ডা আছে; যেখানে গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকল একত্রিত হইয়া নৃত্য গীত করে। সাঁওতালদিগের বিবাহ প্রণালী ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের ন্যায়। বহু বিবাহ যদিও প্রচলিত আছে কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে প্রায়ই কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না।

সাঁওতালদিগের প্রধান দেবতার নাম "সিঙ্গ বঙ্গা।" কোলদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ দেবতা সূর্য্যেতেই স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি উপদেবতা আছে। স্ত্রীলোকেরা হাতীকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, এবং হাতী দেখিলে তাহার সম্মুখে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। হিন্দুদিগের ন্যায় সাঁওতালেরাও শব দাহ করে; এবং দগ্ধ অস্থি নদীতে কিম্বা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। সাঁওতালদিগের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অতি সামান্য, অন্য সময়ে ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইবে।

পরিশ্রমের ফল।

(বালকের রচনা।)

এক ধনি কৃষকের এক বৎসরের ছোট বড় দুইটি পুত্র ছিল। যে দিন তাহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মিল, সেই দিন কৃষক আপনার বাগানে সমান চাষ ও পাইট করিয়া ২টি আম্রের গাছ রোপণ করিল। এই দুইটী গাছ এমন সমান রূপে বাড়িয়া উঠিল যে, কোন ব্যক্তি তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিত না। পরে ঐ দুই সন্তান কায কর্ম্মের উপযুক্ত হইলে, কৃষক বসন্ত কালের কোন দিনে আপন সন্তানদ্বয়কে ডাকিয়া বাগানে গিয়া কহিল, "আমি এই দুই উত্তম বৃক্ষ তোমাদিগকে দিবার জন্য এক কালে রোপণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা লও; ইহা তোমাদিগের শ্রমানুসারে ফল দিবে, আলস্য করিলে ফল দিবে না।"

পরে কনিষ্ঠ অতিশয় শ্রম ও মনযোগ করিয়া বৃক্ষের অনিষ্টকারক কীট সকল দূর করিয়া বৃক্ষটীকে পরিষ্কার রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। গাছের চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহাতে রৌদ্র ও শিশির দ্বারা তাহার মূল প্রতিপালিত হয় এমত চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন বৃক্ষের যত্ন না করিয়া পথিক ও শ্রান্ত লোকদিগকে ইষ্টক ফেলিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া কালক্ষেপ করিত। সর্ব্বদা লোক কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অপমানিত হইয়া ক্রন্দন করিত, এবং বৃক্ষের কার্য্যে এত আলস্য করিত যে তাহাকে কখনও এ কার্য্যে মন দিতে দেখা যায় নাই।

পরে বর্ষাকালে এক দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখিল কনিষ্ঠের বৃক্ষ উত্তম ফলভরে পূর্ণ হইয়াছে; দেখিবা মাত্র অতি শীঘ্র আপন বৃক্ষের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া মনে করিল যে, তাহার বৃক্ষেও ঐ মত ফল ধরেছে; কিন্তু তাহাতে ফল না দেখিয়া চমৎকৃত হইল, দেখিল তাহার গাছ ঘাস ও লতাতে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে রাগ ও ঈর্ষাতে পূর্ণ হইয়া আপন পিতার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, "হে পিতঃ, আপনি আমাকে কিরূপ গাছ দিয়াছেন? আমার বৃক্ষ ঝাঁটার ন্যায় শুষ্ক, ও আমি তাহাতে একটাও ফল পাইলাম না, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি উত্তম বৃক্ষ দিয়াছেন; অতএব আপনি কনিষ্ঠকে আজ্ঞা করুন যে, সে তাহার ফলের অংশ আমাকে দেয়।" বৃদ্ধ কৃষক কহিল, "শ্রমী যদি অলস ব্যক্তিকে পালন করিতে শ্রম করে, তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হয়। তুমি আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট হও। ইহা তোমার আলস্যের ফল। তোমার ভ্রাতার বৃক্ষের ফল দেখিয়া আমাকে পক্ষপাতী ভাবিও না; কেন না তোমার ও তাহার বৃক্ষ সমান ছিল, কিন্তু তুমি নিজ গাছের পারিপাট্য না করাতেই এরূপ দুরাবস্থা হইয়াছে। এখন তোমার গাছ তোমাকে না দিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বাগানে যাইয়া অতি সুন্দর আর একটা চারা লও, ও তাহার প্রতিপালন করিয়া আপন দোষ নিবারণ কর; এবং তাহাতেও যদি তুমি আলস্য কর, তবে তাহাও তোমার ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে।" জ্যেষ্ঠ আপন পিতার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া উদ্যানে গিয়া অতি সতেজ একটা চারা পছন্দ করিয়া লইল। কনিষ্ঠের সৎপরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা জ্যেষ্ঠও আপন বৃক্ষেতে মনোযোগ করিতে লাগিল; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সৎপরামর্শ গ্রহণ

করিয়া নিজ মন্দ আচরণ ত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিরালস্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

বর্ষাকালে বাগানে গিয়া এই পরিশ্রমের ফল স্বরূপ আপন গাছে অনেক ফল দেখিয়া আমোদিত হইল। তাহার পিতা পুত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া পর বৎসরে বাগানের তাবৎ ফল সমান বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন।

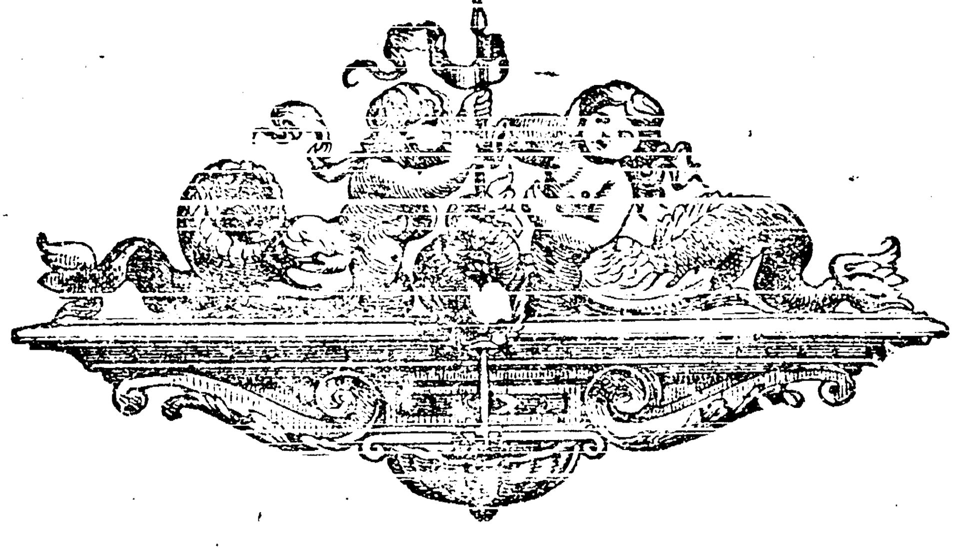

সাজি।

একটি ইংরাজ মহিলার ৯০ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার উইলে এই লেখা ছিল;—"ডাক্তার গ্রেভির চিকিৎসা ও যত্নে এবং তাঁহার বহুমূল্য উপদেশে আমি এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার বড় মেহগ্নীর বাক্সে যাহা আছে সেই সমস্তই তাঁহাকে দিলাম।" ইংরাজ মহিলার আত্মীয়েরা ইহাতে বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইল। ডাক্তার গ্রেভী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—ভারি খুসী। নিজ অদৃষ্টকে যেন মনে কতই প্রশংসা করিতেছেন। চাবি লইয়া বাক্স খোলা হইল। বাক্স খুলিয়া দেখা গেল, কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডাক্তার গ্রেভী সেই মহিলাকে যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঔষধে বাক্সটী পূর্ণ; তাহা খোলাও হয় নাই। গ্রেভী বিষণ্ণ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

* * *

আর একজন মহিলা ডাক্তারের সহিত দেখা হইলে, একটা না একটা অসুখের কথা বলিতেন। ঘাটে পথে যেখানে দেখা হইত, সেই খানেই ডাক্তারকে ধরিয়া একটা অসুখের কথা বলিতেন। ডাক্তারকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। একদিন একটা চৌমাথা রাস্তায় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র, মহিলাটী কিছু না বলিতেই ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! আপনাকে আজ বড়ই দুর্ব্বল দেখিতেছি। চক্ষু বুজিয়া একবার জিহ্বাটী বাহির করিয়া দেখান ত?" মহিলাটী সেই প্রকার করিবামাত্র, ডাক্তার তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি কোথাও যাইতেছিলেন। মহিলাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিত করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সেই চৌমাথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার নাই, কিন্তু রাস্তার লোক, হো হো করিয়া হাসিতেছে।

* * *

দুজন ইংরেজ সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে। রাত্রিতে মশার উপদ্রবে আর ঘুম হইতেছে না; মশারি ছিল না, সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া মশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। তখন গ্রীষ্মকাল, কতক্ষণ কম্বলের মধ্যে থাকিবে? একজন একটু মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, একটা পোকা ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার গায়ে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া তার সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে ভাই আমাদের আজ নিস্তার নাই, আমরা

পরিশ্রমের ফল ।

(বালকের রচনা ।)

এক ধনি কৃষকের এক বৎসরের ছোট বড় দুইটি পুত্র ছিল। যে দিন তাহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মিল, সেই দিন কৃষক আপনার বাগানে সমান চাষ ও পাইট করিয়া ২টি আম্রের গাছ রোপণ করিল। এই দুইটী গাছ এমন সমান রূপে বাড়িয়া উঠিল যে, কোন ব্যক্তি তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিত না। পরে ঐ দুই সন্তান কায কর্ম্মের উপযুক্ত হইলে, কৃষক বসন্ত কালের কোন দিনে আপন সন্তানদ্বয়কে ডাকিয়া বাগানে গিয়া কহিল, "আমি এই দুই উত্তম বৃক্ষ তোমাদিগকে দিবার জন্য এক কালে রোপণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা লও; ইহা তোমাদিগের শ্রমানুসারে ফল দিবে, আলস্য করিলে ফল দিবে না।"

পরে কনিষ্ঠ অতিশয় শ্রম ও মনযোগ করিয়া বৃক্ষের অনিষ্টকারক কীট সকল দূর করিয়া বৃক্ষটীকে পরিষ্কার রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। গাছের চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহাতে রৌদ্র ও শিশির দ্বারা তাহার মূল প্রতিপালিত হয় এমত চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন বৃক্ষের যত্ন না করিয়া পথিক ও শ্রান্ত লোকদিগকে ইষ্টক ফেলিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া কালক্ষেপ করিত। সর্ব্বদা লোক কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অপমানিত হইয়া ক্রন্দন করিত, এবং বৃক্ষের কার্য্যে এত আলস্য করিত যে তাহাকে কখনও এ কার্য্যে মন দিতে দেখা যায় নাই।

পরে বর্ষাকালে এক দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখিল কনিষ্ঠের বৃক্ষ উত্তম ফলভরে পূর্ণ হইয়াছে; দেখিবা মাত্র অতি শীঘ্র আপন বৃক্ষের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া মনে করিল যে, তাহার বৃক্ষেও ঐ মত ফল ধরেছে; কিন্তু তাহাতে ফল না দেখিয়া চমৎকৃত হইল, দেখিল তাহার গাছ ঘাস ও লতাতে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে রাগ ও ঈর্ষাতে পূর্ণ হইয়া আপন পিতার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, "হে পিতঃ, আপনি আমাকে কিরূপ গাছ দিয়াছেন? আমার বৃক্ষ ঝাঁটার ন্যায় শুষ্ক, ও আমি তাহাতে একটাও ফল পাইলাম না, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি উত্তম বৃক্ষ দিয়াছেন; অতএব আপনি কনিষ্ঠকে আজ্ঞা করুন যে, সে তাহার ফলের অংশ আমাকে দেয়।" বৃদ্ধ কৃষক কহিল, "শ্রমী যদি অলস ব্যক্তিকে পালন করিতে শ্রম করে, তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হয়। তুমি আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট হও। ইহা তোমার আলস্যের ফল। তোমার ভ্রাতার বৃক্ষের ফল দেখিয়া আমাকে পক্ষপাতী ভাবিও না; কেন না তোমার ও তাহার বৃক্ষ সমান ছিল, কিন্তু তুমি নিজ গাছের পারিপাট্য না করাতেই এরূপ দুরাবস্থা হইয়াছে। এখন তোমার গাছ তোমাকে না দিয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বাগানে যাইয়া অতি সুন্দর আর একটা চারা লও, ও তাহার প্রতিপালন করিয়া আপন দোষ নিবারণ কর; এবং তাহাতেও যদি তুমি আলস্য কর, তবে তাহাও তোমার ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে।" জ্যেষ্ঠ আপন পিতার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া উদ্যানে গিয়া অতি সতেজ একটা চারা পছন্দ করিয়া লইল। কনিষ্ঠের সৎপরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা জ্যেষ্ঠও আপন বৃক্ষেতে মনোযোগ করিতে লাগিল; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সৎপরামর্শ গ্রহণ

করিয়া নিজ মন্দ আচরণ ত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিরালস্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

বর্ষাকালে বাগানে গিয়া এই পরিশ্রমের ফল স্বরূপ আপন গাছে অনেক ফল দেখিয়া আমোদিত হইল। তাহার পিতা পুত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া পর বৎসরে বাগানের তাবৎ ফল সমান বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন।

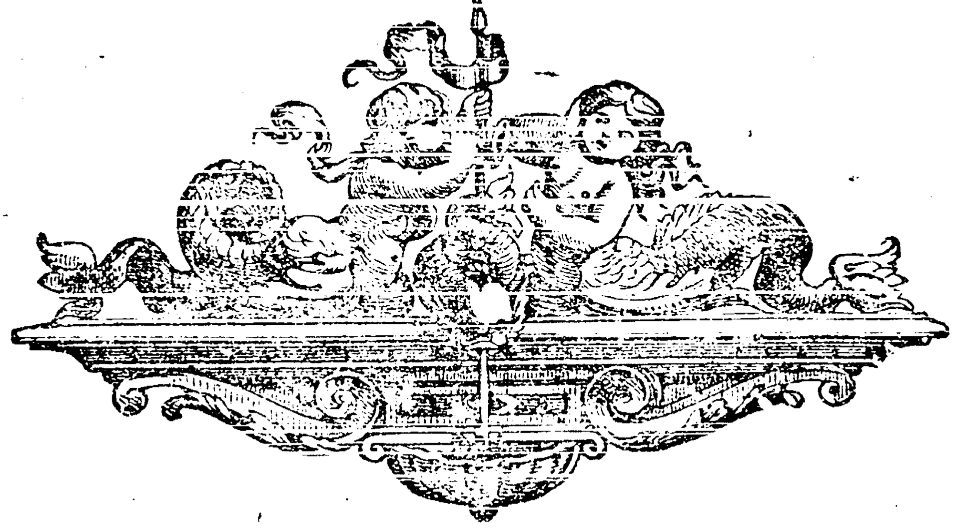

সাজি ।

একটি ইংরাজ মহিলার ৯০ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার উইলে এই লেখা ছিল;—"ডাক্তার গ্রেভির চিকিৎসা ও যত্নে এবং তাঁহার বহুমূল্য উপদেশে আমি এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার বড় মেহগ্নীর বাক্সে যাহা আছে সেই সমস্তই তাঁহাকে দিলাম।" ইংরাজ মহিলার আত্মীয়েরা ইহাতে বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইল। ডাক্তার গ্রেভী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—ভারি খুসী। নিজ অদৃষ্টকে যেন মনে কতই প্রশংসা করিতেছেন। চাবি লইয়া বাক্স খোলা হইল। বাক্স খুলিয়া দেখা গেল, কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডাক্তার গ্রেভী সেই মহিলাকে যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঔষধে বাক্সটী পূর্ণ; তাহা খোলাও হয় নাই। গ্রেভী বিষন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

* * *

আর একজন মহিলা ডাক্তারের সহিত দেখা হইলে, একটা না একটা অসুখের কথা বলিতেন। ঘাটে পথে যেখানে দেখা হইত, সেই খানেই ডাক্তারকে ধরিয়া একটা অসুখের কথা বলিতেন। ডাক্তারকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। একদিন একটা চৌমাথা রাস্তায় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র, মহিলাটী কিছু না বলিতেই ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! আপনাকে আজ বড়ই দুর্ব্বল দেখিতেছি। চক্ষু বুজিয়া একবার জিহ্বাটী বাহির করিয়া দেখান ত?" মহিলাটী সেই প্রকার করিবামাত্র, ডাক্তার তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি কোথাও যাইতেছিলেন। মহিলাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিত করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সেই চৌমাথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার নাই, কিন্তু রাস্তার লোক, হো হো করিয়া হাসিতেছে।

* * *

দুজন ইংরেজ সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছে। রাত্রিতে মশার উপদ্রবে আর ঘুম হইতেছে না; মশারি ছিল না, সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া মশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। তখন গ্রীষ্মকাল, কতক্ষণ কম্বলের মধ্যে থাকিবে? একজন একটু মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, একটা পোকা ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহার গায়ে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া তার সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে ভাই আমাদের আজ নিস্তার নাই, আমরা

বিস্তৃত, ইহার উত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, শিবসাগর, নবগ্রাম (নওগাঁ) এবং লক্ষ্মীপুর (লখিমপুর), পশ্চিমে কোপিল নদী; পূর্ব্বে সিঙ্গফো, কামতী এবং মণিপুর পাহাড়, নাগা দেশ দক্ষিণে যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন উহা দক্ষিণে নামতনাই নদীর উত্তর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই জাতিকে কেন "নাগা" বলে এই বিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে, সচরাচর লোকের এই বিশ্বাস যে "ন্যাংটা" অর্থাৎ উলঙ্গ কথা হইতে "নাগা" হইয়াছে, কিন্তু নাগারাত একবারে উলঙ্গ নয়, কাযেই এ কথা খাটে না। কেহ কেহ বলেন "নাগা" অর্থাৎ সর্প হইতে "নাগা" নামের উৎপত্তি; আবার অনেকের মত যে, কাছাড়ী "নাগা" শব্দ হইতে এই জাতির নাম নাগা হইয়াছে, কারণ কাছাড়ী ভাষায় "নাগা" শব্দের অর্থ যুবাপুরুষ, যুবাপুরুষের প্রধান কাজ যুদ্ধ করা। যাক এ বিষয় লইয়া আমাদের এখন মাথা ঘুরাইবার আবশ্যক নাই। অপরে যে যাহাই বলুক না কেন নাগারা কিন্তু আপন জাতীয় নামের বড় একটা ধার ধারে না; সমগ্র জাতির যে একটা সাধারণ নাম থাকে এ ধারণাই তাহাদিগের নাই; তাহারা যে পল্লিতে বাস করে সে সেই পল্লির লোক বলিয়া পরিচিত; অর্থাৎ "কোহিমা" নামক পল্লিতে যাহাদিগের বাস তাহারা কোহিমার লোক বলিয়া আপনাদিগকে জানে, এইরূপ মেজুমা, খনোমা, যতসোমা প্রভৃতি পল্লির নাগারা আপনাদিগকে ঐ সকল পল্লির লোক বলিয়া পরিচয় দেয়।

বিবাদ ও যুদ্ধ নাগাদিগের মধ্যে প্রায় আছেই, কখন কোহিমা পল্লির নাগাদের সঙ্গে যতসোমা পল্লির যুদ্ধ, কখন বা খনোমার সঙ্গে মেজুমার যুদ্ধ এইরূপ প্রায় চলিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যে জাতীয় ভাব নাই তাহার কারণ বোধ হয় এই যুদ্ধ বিবাদ; শত্রুতা যেখানে সেখানে একতা কোথা হইতে আসিবে, নাগাদিগকেই বা কি দোষ দিব; তাহারা ত অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতি, কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই, প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে তাহারা নিয়ত পড়িয়া আছে, শিক্ষা এবং সভ্যতার আলোক কখন দেখে নাই, ধর্ম্ম এবং নীতি-চর্চ্চা কখন করে নাই; আর আমরা কি? সভ্য সভ্য বলিয়া যে এত গৌরব করি, বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা পাইয়া সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত পাঠ করি, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের নীতি আমাদের কত কি বলিয়া যে এত অহঙ্কার করি, কৈ, আমাদিগের মধ্যেই বা জাতীয় ভাব কোথায়? এইত বাঙ্গালি উৎকল বাসীকে ঘৃণা করিতেছেন, বিহারী বাঙ্গালিকে ঘৃণা করিতেছেন, আবার এদিকে বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতে, বেহারীতে বেহারীতে ও মিল নাই; বক্তৃতায় ভাই ভাই শুনিতেছি, অথচ ব্যবহারে লাঠালাঠি করিতেছি। ধিক্ আমাদের সভ্যতা! ধিক্ আমাদের শিক্ষা!! সখার পাঠক পাঠিকা! ভরসা করি তোমাদিগের হইতে এ লজ্জা নিবারণ হইবে, ভগবানের কৃপায় তোমরা যে সুশিক্ষা পাইতেছ তাহার গুণে তোমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, এবং যে ভাবের অভাবে আমাদিগের মধ্যে একতা নাই সেই ভ্রাতৃ ভাব শিক্ষা করিবে।

সমগ্র নাগা জাতি দশ কি বার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের যেমন অনেক বিষয়ে মিল আছে তেমনি আবার অনেক বিষয়ে বিভিন্নতাও আছে, এমন কি ভাষা পর্য্যন্তও পৃথক। যে সকল নাগারা পাহাড়ের উঁচু

উঁচু ভাগে বাস করে তাহারা প্রায়ই ফর্সা এবং সুশ্রী, কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচে বাস করে

তাহারা তত সুপুরুষ নয়, বর্ণও ময়লা, দেখিতেও কদাকার। নাগাদিগের মধ্যে যেমন আকারগত বিভিন্নতা দেখা যায় চরিত্রেও তাই; কোন সম্প্রদায় বেশ ধীর প্রকৃতি এবং সামাজিক, আবার কোন কোন সম্প্রদায় ঠিক ইহার বিপরীত। সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার এবং চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে, অতএব এই প্রবন্ধে কেবল আঙ্গামি নাগাদিগের বৃত্তান্তই বলা হইবে।

নাগারা যেমন নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য পাহাড়বাসী জঙ্গলী জাতি অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, নাগাদিগের মধ্যে আবার আঙ্গামি নাগারা অপর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আঙ্গামিদিগের মধ্যে রীতিমত শাসন প্রণালী নাই। শাসন প্রণালী কাহাকে বলে তোমরা বোধ হয় সকলেই জান। আজ কাল খবরের কাগজে, পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নীর মুখে দিনের মধ্যে হয়ত দু দশবার "ব্রিটীস গবর্ণমেন্ট" "বৃটীস গবর্ণমেন্ট" শুনিতে পাও, এই কথাটার মানে ইংরাজদিগের শাসন প্রণালী। "শাসন প্রণালী" কথাটা বেশ সহজ, কিন্তু ইহার ভাবটা একটু কঠিন, অনেকে বোধ করি এখনও মনে ধারণা করিতে পার নি। এই দেখ, তোমরা প্রত্যহ বিদ্যালয় যাও, সেখানকার নিয়মগুলি একবার ভেবে দেখ দেখি; বেলা দশটা কিম্বা সাড়ে দশটার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইতে হয়, যে, যে শ্রেণীতে পাঠ কর তাহাকে সেই শ্রেণীতে গিয়া বসিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট পাঠগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বলিতে হয়, ক্লাসে বসিয়া গোলমাল করিবার যোটি নাই, ছুটীর সময় উপস্থিত না হইলে বাড়ী আসিবার যো নাই, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়া চাই, এইরূপ আরও কত প্রকার নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়, এবং এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে দণ্ড পাইতে হয়। ক্লাসে বসিয়া গোলমাল করিলে, কিম্বা পড়া বলিতে না পারিলে যে কি হয় তাহা আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। একেই বলে বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালী। আপন আপন বাড়ী এবং পরিবারের কায কর্ম্ম বেশ মনোযোগ করিয়া দেখ সেখানেও কতকগুলি নিয়ম দেখিতে পাইবে, দেখিবে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই এমন এক ব্যক্তি আছেন যাঁহার কথা সকলেই মান্য করে এবং যাঁহার আজ্ঞা অনুসারে বাড়ীর সমস্ত কায কর্ম্ম হয়, এদিকে অন্য অন্য কায কর্ম্মের ভার, পরিবারের অন্য অন্য ব্যক্তির উপর, কাহার রান্নার ভার, কাহার উপর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্নান আহারের ভার। সমস্ত কাজ কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, দ্রব্যাদি রাখিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যে পরিবারের প্রত্যেকে এই সকল নিয়ম যত রক্ষা করিয়া চলেন সেই পরিবারে তত শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিদ্যমান; ইহারি নাম পারিবারীক শাসন-প্রণালী। বিদ্যালয় এবং বাড়ীতে যেমন কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকিলে সুন্দররূপে কায চলে না সেইরূপ দেশের মধ্যে যদি কোন প্রকার শাসন

প্রণালী না থাকে এবং সেই শাসন-প্রণালীর নিয়ম সকল যদি জন সাধারণ প্রতিপালন না করে তাহা হইলে মহা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। তোমার কোন সমপাঠী যদি তোমার উপর কিছু অত্যাচার করে, তোমার হয়ত এক খানি বই ছিঁড়িয়া দেয় কিম্বা তোমাকে একটী কিল মারে তাহা হইলে তুমি যেমন শিক্ষক মহাশয়ের নিকট নালিশ কর; বাড়ীতে তুমি যদি কোনরূপ মন্দ ব্যবহার কর তাহা হইলে পিতা মাতা যেমন তিরস্কার করেন, কিম্বা অপরাধ গুরুতর হইলে দণ্ড দেন, সেইরূপ দেশের মধ্যেও এক জন অপরের প্রতি অত্যাচার করিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দেশের শান্তি ভঙ্গ করিলে বিচারালয়ে অপরাধীকে দণ্ড পাইতে হয়। জজ, মাজীষ্ট্রেট, পুলিষ ইত্যাদির নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, দেশের মধ্যে যাহাতে কোন অশান্তি কিম্বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে তাহার সুবন্দোবস্ত করা এবং ঘটিলে বিচার করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ইহাঁদিগের কার্য্য। যে নিয়ম সমূহ দ্বারা এই সকল কায সুন্দররূপ চলিতেছে তাহাকেই এই দেশের শাসন প্রণালী বলে।

যে সকল সুবন্দোবস্তের গুণে দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা হইতেছে, অপরাধী দণ্ড পাইতেছে এবং নিরুৎপাতে এবং নির্ব্বিঘ্নে সকলে আপন আপন কায করিতেছে, এ সুবন্দোবস্ত যদি না থাকে তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ দেখি দেশের অবস্থা কি হয়? নাগা জাতির মধ্যে এই সুবন্দোবস্ত নাই এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি প্রায় লাগিয়াই আছে। "যোর যার মুলুক তাহার" এই তাহাদের আইন, সকলে আপন আপন স্বাধীন ইচ্ছার বশীভূত হইয়া চলে, কেহ কোন নিয়মের বাধ্য নয়। একেত নাগাদিগের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র তাহাতে আবার দেশের মধ্যে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত নাই, এরূপ অবস্থায় যে এক দিনও চলে এই আশ্চর্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাই চলিতেছে। নাগাদিগের মধ্যে জজ, মাজিষ্ট্রেট নাই, পুলিষ নাই, কিম্বা বিচারালয় নাই, আর এ সকলের আবশ্যক ও তাহাদের হয় না, কারণ তাহাদিগের মধ্যে অতি সামান্য সামান্য কারণে যেরূপ ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হয় তেমনি আবার সামান্যতেই মিটিয়া যায়, যদিও কখন কখন (এই সকল) সামান্য কারণ হইতেই কাটা কাটি যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। আপসে ঝগড়া বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামেই কতকগুলি প্রধান প্রধান লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ব্যক্তির প্রধানত্বের কারণ ইহাদিগের রণ-দক্ষতা, দৌত্য কার্য্যে নিপুণতা, বক্তৃতা শক্তি এবং সম্পত্তি। অবশ্য নাগাদিগের মধ্যে "সম্পত্তি" বলিলে যাহা বুঝায় সেই সম্পত্তি, অর্থাৎ গরু, বাছুর, মেষ, মহিষ, ইত্যাদি এবং চাষের উপযুক্ত কিছু জমি। সামান্য সামান্য বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহাঁরা মিটাইয়া দেন সত্য, আর নামেও এই সকল ব্যক্তিই গ্রামের মধ্যে প্রধান কিন্তু ইহাঁদিগের ক্ষমতাই কেবল নাম মাত্র; কারণ জন সাধারণ তাঁহাদিগের ইচ্ছা বা আজ্ঞা অনুসারে চলিতে বাধ্য নয়, কোন বিষয়ে জন সাধারণের মতের সহিত যদি প্রধানদিগের অনৈক্য হয় তাহা হইলে সেই অবধি তাঁহাদিগের প্রধানত্ব ঘুচিয়া যায়।

সকল বিষয়ে সকল সময়েই যে গ্রামের সমস্ত লোক এক মত হয় তাহা নয় আর মত ভেদ উপস্থিত হইলে অধিক সংখ্যক লোকের মত যাহা হয় স্বতন্ত্র মতাবলম্বীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও অপর দলের সহিত যোগ দেয় না, আপনাদিগের মত অনুসারে কার্য্য করে। এই কারণ বশতঃ

নাগাদিগের জাতীয় বিবাদে এরূপ ঘটনা প্রায়ই বিরল যে এক গ্রামের সমস্ত লোক অপর কোন গ্রামের সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বরং সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে, এক গ্রাম কিম্বা পল্লির কতক সম্প্রদায় অন্য গ্রামের কতক লোকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং প্রত্যেক গ্রামের অন্য দলভুক্ত লোকেরা নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দলের সহিত বেশ মিশিতেছে। এক গ্রামেও অনেক সময়ে দলাদলি এবং যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়; একবার রক্তপাত হইলে আর রক্ষা নাই, হয় হত্যাকারী না হয় তাহার কোন আত্মীয়কে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে, আজ হউক, কাল হউক, আর কুড়ি বৎসর পরেই হউক হত্যাকারীর মৃত্যু নিশ্চয়। আঙ্গামি নাগারা দেখিতে বলিষ্ঠ এবং সুগঠন, সাহসী এবং রণদক্ষ; প্রতিহিংসা বৃত্তি

যতই কেন প্রবল হউক না সত্য প্রিয়তা নাগাদিগের, বিশেষতঃ আঙ্গামি নাগাদিগের একটী মহৎ গুণ। অন্যান্য নাগা অপেক্ষা আঙ্গামিরা দীর্ঘকায় এবং বর্ণও অপেক্ষাকৃত পরিস্কার; হাত ও পায়ের মোটা মোটা সুগোল মাংস পেশী গুলি দেখিলেই ইহাদের বল বিক্রম এবং কর্ম্ম পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিহিংসা নাগাদিগের অতি পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, আমাদিগের দেশে লোকে যেমন মৃত্যু কালে সন্তানগণকে আপন আপন সম্পত্তি, টাকাকড়ি দান করিয়া যায়, নাগারা সেইরূপ মৃত্যু কালে সন্তান এবং আত্মীয়গণকে শত্রুর মাথা কাটিয়া সেই রক্তে স্নান করিতে বলিয়া যায়, এই কারণে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন গ্রামে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে পুরুষ পুরুষানুক্রমে "রক্তযুদ্ধ" চলিয়া আসিতেছে এবং কখন কখন এই রক্তযুদ্ধে সমস্ত গ্রাম উৎসন্নপ্রায় হইয়া থাকে।

আঙ্গামি পুরুষদিগের ন্যায় রমনীগণও দীর্ঘকায় এবং সুশ্রী, নাগা রমনীরা আলস্য কাহাকে বলে জানে না, সংসারের একটা না একটা কায লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে; জঙ্গল হইতে রন্ধন কাষ্ঠ বহিয়া আনা, ঝর্ণা কিম্বা নদী হইতে জল আনা, রান্না করা, ইত্যাদি রমনীদিগের প্রধান

কায, ইহা ভিন্ন চাসের সাহায্য করিতে এবং কখন কখন কাপড় ও বুনিতে হয়। বারান্তরে নাগাদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় বলা যাইবে।

(প্রাপ্ত)

নীতি ও বিদ্যা।

(কথোপকথন।)

সরলা। সেকি লীলা, কেন তুমি মলিন এমন ?
হাসি নাই হাসিমুখে হৃদয় ফাটিছে দুঃখে
আজ বল শুভদিনে, কিসের কারণ ?
বিমলা। চল দিদি ত্বরা করি বিদ্যালয়ে যাই ;
জাননা কি প্রিয়বোন পুরস্কার বিতরণ
হবে বলে সুধী জন এসেছে সবাই ?
লীলা। জানি বোন্, কাঁদিতেছি তাই ;—
সরলা। কি বলিলে প্রিয়লীলা কাঁদিতেছ তাই ;—
আজি এই শুভদিনে কোথা বোন ফুল্লমনে
উপযুক্ত পুরস্কার লভিব সবাই,
তা না হয়ে বৃথা কেন কাঁদিতেছ ভাই ?
লীলা। নহি উপযুক্ত আমি পেতে পুরস্কার।
বিমলা। সেকি দিদি তুমি বিনা কেবা পাবে আর ?
সরলা। পরীক্ষাতে তোমা হেন পারেনাই কোনজন
তবু যদি নাহি তুমি পাও পুরস্কার !
অযোগ্য হয়েও ভাই বিদ্যালয়ে যেতে চাই
কি করি আমরা তবে আশাকরি তার !
লীলা। প্রথম হয়েছি আমি জানি পরীক্ষায়,
কিন্তু বোন্ বল দেখি কে কোথা হয়েছে সুখী
নীতি হীন বিদ্যা ল'য়ে হায় এ ধরায় ?
বিদ্যা বুদ্ধি যাই বল থাকে যদি নীতি বল
তবে সেই নীতিবান পায় সুসম্মান ;
সুনীতি অন্তরে যার বিরাজিত অনিবার
বিদ্যা বিনা তবুও সে দেবতা সমান !

বিমলা। নীতি হীন কিসে তুমি বোন্‌টী আমার ?
লীলা। জানিতে বাসনা যদি হয়েছে তোমার,
তবে আজ প্রিয়বোন্ শুন সবে দিয়া মন
কত যে নিষ্ঠুর আমি পারিবে জানিতে।
সরলা। আমিও শুনিব দিদি বলগো ত্বরিতে।
লীলা। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রখর রবির করে
বিদগ্ধ শরীর, দিদি বৃদ্ধা একজন,
চারিটী অন্নের আশে ঘুরি ফিরি আশে পাশে
আমাদের দ্বারে আসি দিল দরশন ;
নয়নে ঝরিছে জল লেশ মাত্র নাহি বল
শরীরের ভার রাখি লাঠীর উপর
নিকটে দেখিয়া মোরে অতিশয় ক্ষীণ স্বরে
ডাকিতে লাগিল বৃদ্ধা ক্ষুধায় কাতর।
বিমলা। তার পর কি হইল বলগো ত্বরায় ?
লীলা। কি আর হইবে ভাই নিষ্ঠুরের প্রায়
দুর দূর করি তারে, খেদায়ে দিলাম দূরে
কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা করিল প্রস্থান !
দেখিলে কেমন মোর কঠিন পরান !
তাই শুনি মা আমার ডাকিয়া নিকটে তাঁর
কহিলেন ক্ষুণ্ণ মনে ; "লীলারে আমার
হেরি তোর আচরণ ব্যথিত হয়েছে মন
পাষাণে গঠিত কিরে অন্তর তোমার ?
বিদ্যালয়ে গিয়ে বল কি আর হইবে ফল
নীতি হীন তরে কভু নহে পুরস্কার" !
বিমলা। নীতি হীন এই যদি, কার্য্য তব হয় দিদি
মোর তবে পুরস্কারে কোন অধিকার ?
লীলা। কেন ভাই তুমিও কি আমার মতন ?
অনাথ দরিদ্র জনে দুঃখ দেছ অকারণে
তাদের ক্রন্দন শুনে হেসেছ কখন ?
বিমলা। একবার নহে বোন্ শত শত বার,
কত দুঃখী অসহায় ক্ষুধায় কাতর হায়
এসেছিল আশা করে নিকটে আমার ;
ঘৃণা করে দূর করে দিয়াছিগো সবাকারে
তাদের ক্রন্দনে ভাই কাঁদিনি কখন,
তাহা ছাড়া ভাই বোনে দুঃখ দিছি অকারণে
ভৃত্যগণে শুনায়েছি কঠিন বচন,
সতত অসত্যে মতি মিথ্যা ক'য়ে দিবা রাতি
কষ্ট দিছি গুরুজনে মন্দ ব্যবহারে ;
গহনা পাইনি বলে বইগুলো দিছি ফেলে
কিসে মোর অধিকার তবে পুরস্কারে ?
সরলা। কেন মিছামিছি ভাই নির্ব্বোধের প্রায়
সে সকল কথা তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে
বাজে কাজে বৃথাকাল কাটা'ছ হায় ?
নির্দ্দয় কঠিন হয়ে কষ্ট দেছ অসহায়ে
মিথ্যা কথা করিয়াছ সদা সর্ব্বক্ষণ ;
পিতা মাতা গুরুজনে দুঃখ দেছ জেনে শুনে
পুরস্কারে বাধা ইথে কি আছে এমন ?
পড়িয়াছ সাধ্যমতে পুরস্কার লয়ে হাতে
হাসিতে হাসিতে এস যাই গৃহ পানে,
চরিত্রের তরে ভাই পুরস্কার হয় নাই
পড়া বলে সেই ধনে লভে সর্ব্বজনে।
অমলা। কি বলিলে প্রিয়বোন্ লাজে মরে যাই
একটু কি কাণ্ডজ্ঞান নাহি তব ভাই !!
বিদ্যা যে পরমধন জানে তাহা সর্ব্বজন
সকল ধনের ইহা সার।
কি কাজ গহনা প'রে ? বিদ্যাধনে লাভ করে
সাধি তাঁর ইচ্ছা বার বার।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বকালে এধনে রেখেছে তুলে
হৃদয় ভূষণ করি আহা,
অন্য ধন চুরি হয় বিদ্যার যে নাহি ক্ষয়
বঞ্চকে বঞ্চিতে নারে তাহা।

বিদ্যার বলেতে নরে সকলি সাধিতে পারে
জলে শূন্যে করয়ে ভ্রমণ,
সকল বিপদ হরে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে
করে ইহা আলো বিকিরণ।
বিদ্যা লাভে জ্ঞান লাভ জ্ঞানালোকে ধর্ম্ম-
লাভ
সার এই সাধুর বচন ;
পূর্ণ মনুষ্যত্ব যাহা ধর্ম্মেতেই মিলে তাহা
বিদ্যার মহিমা অগণন।
কিন্তু শুন প্রিয়বোন্ যদি এই বিদ্যাধন
সুনীতিকে ফেলে আসে দূরে,
বিদ্যার যে গুণ হায় বিফল হইয়া যায়
পশুর অধম হয় নরে।
সরলা। তবে কি বিমলা, লীলা পাবেনা এবার
পড়া শুনা করে শেষে তার পুরস্কার ?
অমলা। কে বলে পাবেনা ভাই ? দুঃখিতা যখন
হইয়াছে মন্দ কাজে শিক্ষিতা মতন ;
নিশ্চয় পাইবে এরা পরীক্ষার ফল !
বিমলা। আচ্ছা দিদি শিক্ষাতে কি হয় অমঙ্গল ?
প্রমীলার মাতা বলে মেয়েরা ইস্কুলে গেলে
ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটে এ সংসারে।
অমলা। পাগল বিমলা কভু তাকি হতে পারে !
ভাবিয়া দেখনা মনে এদেশের শুভদিনে
আছিলেন সুশিক্ষিতা কত,
খনা গার্গি লীলাবতী সীতা আদি কত সতী
ভারত রমণী শ্রেষ্ঠ যত !
কলঙ্ক তাঁদের নামে রটে নাই কোন দিনে
চির দিন ভারতীয়গণ,
প্রভাতে উঠিয়া কত-দেশে দেশে শত শত
স্বরে আগে তাঁদের চরণ।
তাই বলি প্রিয়বোন্ বিদ্যাই পরমধন
ইথে কিছু নাহিক সংশয়,
কিছু দিন শিক্ষা করে নাটক নভেল পড়ে
কেহ যদি কভু নষ্ট হয় ;
কি দোষ বিদ্যার তবে দেখনা বারেক ভেবে
কেন তবে বৃথা এ কল্পনা ?
কেহ বলে অহঙ্কার সুশিক্ষিতা বালিকার
হবেই নিশ্চয় আছে জানা,
কিন্তু ইহা মহা ভ্রম ; শিক্ষিতা বিনম্রী হন
গৃহ কার্য্যে সদা তাঁর মতি ;
পিতা মাতা গুরুজনে সদা কায়মন প্রাণে
সেবা ক'রে সুখি হন সতী।
লীলা। বিদ্যা শিক্ষা ফল দিদি বুঝিনু এখন
মন প্রাণ এক করি সাধ্যমত যত পারি
দিন দিন বিদ্যা লাভে করিব যতন।
সরলা। বুঝিলাম নীতি-হীন বিদ্যা কিছু নয়,
নীতিই জীবন পথে পরম সহায়।
বিমলা। কি আর বলিব দিদি ধন্য তব জ্ঞান,
আজ তুমি দয়া করে, কত শিক্ষা দিলে
মোরে
ঈশ্বর সাধুন তব অশেষ কল্যাণ।
অমলা। আমি কি শিখাতে পারি, যাঁহার কৃপায়
লভিয়াছি জ্ঞান ভাই এই ভূমণ্ডলে ;—
এস আজ সবে মিলে নমি তাঁর পায়,
সুপথে রাখুন তিনি মোদিগে সকলে।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের উত্তর পাড়াস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উদ্দেশ্যে এই পদ্যটী চারি জন বালিকা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। দুই এক স্থল সংশোধন করিয়া প্রকাশিত হইল। স-সং।

পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ।

তোমরা বোধ হয় চীন দেশের নাম শুনিয়াছ। সেখানকার লোকদিগের সহিত আমাদের বড় মিল নাই। তোমরা পুস্তকে পড়িয়াছ যে, সে দেশের পুরুষেরা মাথায় "বেণী" রাখে। আবার সে দেশের মেয়েরা পা ছোট করিবার জন্য লোহার জুতা পড়ে। এই সব পড়িয়া শুনিয়া তোমাদের হয়ত ধারণা হইয়াছে যে, তাহারা বড় অসভ্য। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সভ্য। তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অল্প দিনের একটী ঘটনার কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারাও সভ্য এবং তাহাদের মধ্যেও অতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিয়েন নামে একটী বালিকার মাতার যকৃতের পীড়া হয়। তিনি তাহাতে এত কষ্ট পাইতেন যে, বেদনায় রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেন না। চিয়েন তখন প্রত্যহ রাত্রিতে উঠিয়া মাতার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত এবং যতক্ষণ মার ঘুম না হইত ততক্ষণ জাগিয়া থাকিত। অন্যান্য সেবা শুশ্রূষারও ত্রুটি হইত না। এইরূপে বালিকা দিন রাত্রি মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল কিন্তু ব্যারাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসরও গত হইল তবুও ব্যারামের হ্রাস হইল না। বালিকা অনিদ্রায় ও প্রায় অনাহারে অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে চিকিৎসক বলিলেন "যে জীবিত মনুষ্যের মাংস আহার না করিলে এ পীড়ার উপশম হইবে না।" তখন মাতৃভক্ত চিয়েন আপনার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিলেন এবং মাতাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে তাহার পিতার চক্ষুতে কি এক ব্যারাম হয়। তখন চিয়েন পিতার চক্ষুর পুঁজ ও রক্ত নিজে মুখে করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বল দেখি, তুমি আমি হইলে কি করিতাম ? হয়ত ঘৃণায় কাছেও যাইতাম না। কিন্তু যে মার জন্য নিজের শরীরের মাংস কাটিয়া দিতে পারে, তাহার নিকট এ অতি সামান্য কথা।

কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কয়েক দিন পরে চিয়েনের বিবাহ হইল। তিনি অতি কষ্টে পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেলেন। অল্প কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সংবাদ আসিল তাহার পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি অবিলম্বে পিত্রালয়ে চলিলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। এই রোগেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। বলিতে পার যে তখন সেই পিতৃ ভক্ত চিয়েন কি করিলেন ? তিনি পিতার শোকে এত অধীর হইলেন যে, তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহার করিয়া অবশেষে পিতার সহিত পরলোক গমন করিলেন। ধন্য চিয়েন ! ধন্য তোমার মাতৃভক্তি ! ধন্য তোমার পিতার প্রতি অনুরাগ ! মাতা যেন তোমার ন্যায় সন্তানই গর্ভে ধারণ করে ; পিতা যেন তোমার মত কন্যারই জন্মদাতা হন। পিতা মাতাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, তুমি

বিদ্যার বলেতে নরে সকলি সাধিতে পারে
জলে শূন্যে করয়ে ভ্রমণ,
সকল বিপদ হরে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে
করে ইহা আলো বিকিরণ।
বিদ্যা লাভে জ্ঞান লাভ জ্ঞানালোকে ধর্ম্ম-লাভ
সার এই সাধুর বচন;
পূর্ণ মনুষ্যত্ব যাহা ধর্ম্মেতেই মিলে তাহা
বিদ্যার মহিমা অগণন।
কিন্তু শুন প্রিয়বোন্ যদি এই বিদ্যাধন
সুনীতিকে ফেলে আসে দূরে,
বিদ্যার যে গুণ হায় বিফল হইয়া যায়
পশুর অধম হয় নরে।
সরলা। তবে কি বিমলা, লীলা পাবেনা এবার
পড়া শুনা করে শেষে তার পুরস্কার?
অমলা। কে বলে পাবেনা ভাই? দুঃখিতা যখন
হইয়াছে মন্দ কাজে শিক্ষিতা মতন;
নিশ্চয় পাইবে এরা পরীক্ষার ফল!
বিমলা। আচ্ছা দিদি শিক্ষাতে কি হয় অমঙ্গল?
প্রমীলার মাতা বলে মেয়েরা ইস্কুলে গেলে
ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটে এ সংসারে।
অমলা। পাগল বিমলা কভু তাকি হতে পারে!
ভাবিয়া দেখনা মনে এদেশের শুভদিনে
আছিলেন সুশিক্ষিতা কত,
খনা গার্গি লীলাবতী সীতা আদি কত সতী
ভারত রমণী শ্রেষ্ঠ যত!
কলঙ্ক তাঁদের নামে রটে নাই কোন দিনে
চির দিন ভারতীয়গণ,
প্রভাতে উঠিয়া কত-দেশে দেশে শত শত
স্বরে আগে তাঁদের চরণ।
তাই বলি প্রিয়বোন্ বিদ্যাই পরমধন
ইথে কিছু নাহিক সংশয়,
কিছু দিন শিক্ষা করে নাটক নভেল পড়ে
কেহ যদি কভু নষ্ট হয়;
কি দোষ বিদ্যার তবে দেখনা বারেক ভেবে
কেন তবে বৃথা এ কল্পনা?
কেহ বলে অহঙ্কার সুশিক্ষিতা বালিকার
হবেই নিশ্চয় আছে জানা,
কিন্তু ইহা মহা ভ্রম; শিক্ষিতা বিনয়ী হন
গৃহ কার্য্যে সদা তাঁর মতি;
পিতা মাতা গুরুজনে সদা কায়মন প্রাণে
সেবা ক'রে সুখি হন সতী।
লীলা। বিদ্যা শিক্ষা ফল দিদি বুঝিনু এখন
মন প্রাণ এক করি সাধ্যমত যত পারি
দিন দিন বিদ্যা লাভে করিব যতন।
সরলা। বুঝিলাম নীতি-হীন বিদ্যা কিছু নয়,
নীতিই জীবন পথে পরম সহায়।
বিমলা। কি আর বলিব দিদি ধন্য তব জ্ঞান,
আজ তুমি দয়া করে, কত শিক্ষা দিলে মোরে
ঈশ্বর সাধুন তব অশেষ কল্যাণ।
অমলা। আমি কি শিখাতে পারি, যাঁহার কৃপায়
লভিয়াছি জ্ঞান ভাই এই ভূমণ্ডলে;—
এস আজ সবে মিলে নমি তাঁর পায়,
সুপথে রাখুন তিনি মোদিগে সকলে।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের উত্তর পাড়াস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উদ্দেশ্যে এই পদ্যটী চারি জন বালিকা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। দুই এক স্থল সংশোধন করিয়া প্রকাশিত হইল। স-সং।

পিতা মাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ।

তোমরা বোধ হয় চীন দেশের নাম শুনিয়াছ। সেখানকার লোকদিগের সহিত আমাদের বড় মিল নাই। তোমরা পুস্তকে পড়িয়াছ যে, সে দেশের পুরুষেরা মাথায় "বেণী" রাখে। আবার সে দেশের মেয়েরা পা ছোট করিবার জন্য লোহার জুতা পড়ে। এই সব পড়িয়া শুনিয়া তোমাদের হয়ত ধারণা হইয়াছে যে, তাহারা বড় অসভ্য। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সভ্য। তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অল্প দিনের একটী ঘটনার কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারাও সভ্য এবং তাহাদের মধ্যেও অতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিয়েন নামে একটী বালিকার মাতার যকৃতের পীড়া হয়। তিনি তাহাতে এত কষ্ট পাইতেন যে, বেদনায় রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেন না। চিয়েন তখন প্রত্যহ রাত্রিতে উঠিয়া মাতার গায়ে হাত বুলাইয়া দিত এবং যতক্ষণ মার ঘুম না হইত ততক্ষণ জাগিয়া থাকিত। অন্যান্য সেবা শুশ্রূষারও ত্রুটি হইত না। এইরূপে বালিকা দিন রাত্রি মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল কিন্তু ব্যারাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসরও গত হইল তবুও ব্যারামের হ্রাস হইল না। বালিকা অনিদ্রায় ও প্রায় অনাহারে অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে চিকিৎসক বলিলেন "যে জীবিত মনুষ্যের মাংস আহার না করিলে এ পীড়ার উপশম হইবে না।" তখন মাতৃভক্ত চিয়েন আপনার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিলেন এবং মাতাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে তাহার পিতার চক্ষুতে কি এক ব্যারাম হয়। তখন চিয়েন পিতার চক্ষুর পুঁজ ও রক্ত নিজে মুখে করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বল দেখি, তুমি আমি হইলে কি করিতাম? হয়ত ঘৃণায় কাছেও যাইতাম না। কিন্তু যে মার জন্য নিজের শরীরের মাংস কাটিয়া দিতে পারে, তাহার নিকট এ অতি সামান্য কথা।

কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কয়েক দিন পরে চিয়েনের বিবাহ হইল। তিনি অতি কষ্টে পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গেলেন। অল্প কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সংবাদ আসিল তাহার পিতা অতিশয় পীড়িত। তিনি অবিলম্বে পিত্রালয়ে চলিলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। এই রোগেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। বলিতে পার যে তখন সেই পিতৃ ভক্ত চিয়েন কি করিলেন? তিনি পিতার শোকে এত অধীর হইলেন যে, তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহার করিয়া অবশেষে পিতার সহিত পরলোক গমন করিলেন। ধন্য চিয়েন! ধন্য তোমার মাতৃভক্তি! ধন্য তোমার পিতার প্রতি অনুরাগ! মাতা যেন তোমার ন্যায় সন্তানই গর্ভে ধারণ করে; পিতা যেন তোমার মত কন্যারই জন্মদাতা হন। পিতা মাতাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, তুমি

আপনার কাজ ও চিন্তা লইয়া আনন্দে কাল কাটাইত। খাওয়া পরার ভাবনা বড় একটা ভাবিতে হইত না; কিন্তু ভগবান তাহাকে সে সুখে আর অনেক দিন সুখী থাকিতে দিলেন না। যার মুখের দিকে তাকাইয়া সে আনন্দে ছিল আজ ভগবান তাহার সেই স্নেহময় পিতাকে কাড়িয়া লইলেন। আহা! অভাগা হরির কথা ভাবিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। সে এই ভয়ানক আঘাত সহিতে পারিল না; দুঃখ ও শোকের ভরে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার সৎকার করিয়া যখন সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন আর তাহার পূর্ব্বের ভাব নাই। পিতার শোক, তাহার উপর সংসারের চিন্তা—এই সকল ভাবনা যেন একদিনেই তাহার আরও দশ বৎসর বয়স বাড়াইয়া দিল।

শচীকান্ত বাবুর এ সকল জ্বালা কিছুই নাই, পিতার মৃত্যুতে যে কিছু শোক হইয়াছিল তাহা আর অধিক দিন রহিল না। সে মহা ধূমধামে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া সে শোক দূরে ফেলিল। শচীকান্ত জানিত বাবা উইল করিয়া তাহাকে পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, আর কয়েক বৎসরেই সে সমুদয় বিষয় হাতে পাইবে। এই খবরে শচীকান্ত মনে মনে ভারি খুসী। ভাবেন "আর ভাবনা কি? এতগুলি টাকা আমার, দুই হাতে খরচ করিলেও ফুরাইবে না। পায়ের উপর পা তুলে সুখে ব'সে খাব আর মজা করব। লেখা পড়া? আমার লেখা পড়া শিখ্‌বার দরকার? যাদের কোন পুরুষে টাকার মুখ দেখে নাই তারাই লেখা পড়া করুক্‌গে, কেরানীগিরি করে খাবে। আমি কেন লেখা পড়া করব?" শচী বাবু মনে মনে এই সুসংকল্প করিয়া কালী কলম ও বইএর সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ঘুচাইবেন ঠিক করিয়া আছেন, কিন্তু মায়ের ভয়ে আর কতকটা চক্ষু লজ্জার খাতিরে সেটা কাজে করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া এখনও স্কুলে যাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ পড়া শুনা করার চেয়ে না করা অনেক গুণে ভাল। তিনি মাথায় সুগন্ধি তেল মাখিয়া লম্বা সিঁথি কাটিয়া, ফিন্‌ফিনে কোঁচান ধুতি পরিয়া, ধপ্‌ধপে ইস্তিরি করা ভাল জামায় সোণার ঝক্‌ঝকে চারি পাঁচটা বোতাম ও ফুল গুঁজিয়া জুড়ি হাঁকাইয়া স্কুলে যান। সেখানে গিয়া দেশের যত বখাটে ছেলের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাত এই, ইহার জন্য জাঁক বা কত! পড়িবার জন্য একটা স্বতন্ত্র ঘর হইয়াছে। মেজেতে সুন্দর কার্পেট পাড়া, দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি, ভাল ভাল চেয়ার টেবিল, কোচ, আলমারী, ঝাড় ইত্যাদি ঘরের সাজের অপ্রতুল নাই। এই ঘরে ময়ূর সাজিয়া বসিয়া থাকেন, পড়িবার মধ্যে যত রাজ্যের অপাঠ্য নবেল। এই লইয়াই দিবা রাত্রি বাস। এইরূপে অগাধ বিষয়ের এক মাত্র উত্তরাধিকারী শচীকান্তের শিক্ষা আরম্ভ হইল।

সিমলা ষ্ট্রীটে একটা বড় দোকানে হরিনাথ কাজ করে। তাহার বাবার যে দোকান খানি ছিল হরিনাথ তাহা একা চালাইতে পারিল না; তাই সেখানকার দোকান পাট উঠাইয়া দিয়া এখন লালমোহন কাঁসারির দোকানে কাজ করে। বাবা মরিবার সময় যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, হরিনাথ সেগুলি প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছে এবং তদনুসারে কাজ করিতে খুব চেষ্টা করে। প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রাণপণে যত্ন, কি রূপে ভাল কাজ করিবে, কি প্রকারে ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবন কাটাইবে, কিসে মার মনে একটুকু সুখ দিবে, এই সকল ইচ্ছা সাধু প্রকৃতি হরিনাথের মনে সর্ব্বদাই আগুনের মত জ্বলিতেছে। খাটিতে খাটিতে শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িলে মৃত্যু শয্যায় শয়ান পিতার কথা মনে পড়ে, পিতৃহীন বালক চক্ষুর জল মুছিয়া আবার নূতন উৎসাহ ও আশা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যে বেতন পায় হরিনাথ তাহার এক পয়সাও নিজে ব্যয় করে না। বেতন পাইলেই আনন্দে পূর্ণ হইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া যায়। ধনশালী বণিক প্রচুর ধন গৃহে আনিয়া যে আনন্দ না পান মাতৃবৎসল হরিনাথ মায়ের হাতে পরিশ্রমের টাকাগুলি গণিয়া দিয়া ততোধিক আনন্দ পায়।

পিতার মৃত্যুর পর হরিনাথের দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সকল দিন কাহারও এক থাকে না, হরিনাথেরও সে দিন নাই। প্রভুর মনোমত কার্য্য করিয়া সে এখন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছে; তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বের মত আর তাহার অন্ন বস্ত্রের ভাবনা নাই কিন্তু ভাল অবস্থা হইলে অনেকে যেমন অলস ও আমোদপ্রিয় হইয়া পড়ে, হরিনাথের তাহা হয় নাই। বরং কৃতকার্য্য হইয়া নূতন উৎসাহ ও আশার সহিত কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া আহার করিতে করিতে মার কাছে সারাদিনের কাজের হিসাব দেওয়া হরিনাথের জীবনের এক প্রধান সুখ। কি কাজ করে, কেমন করিয়া করে, দোকানের সকলের সঙ্গে কেমন সদ্ভাব, সকলে তাহাকে কেমন ভাল বাসে, তার প্রভু তাহার কাজ দেখিয়া কেমন খুসী হন, কত ভাল কথায় উৎসাহ দেন, এই সকল কথাও প্রভুর প্রশংসা যখন শত মুখে করিতে থাকে, তখন দুঃখিনী জননী এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া সব কথা শোনেন এবং আনন্দে হাসিতে থাকেন, আর যিনি তাঁহাকে শত দুঃখের মধ্যে এই রত্ন দিয়াছেন তাঁহাকে মনে মনে প্রাণ ভরিয়া ডাকেন। মার মুখে হাসি দেখিয়া মাতৃবৎসল সন্তানের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না, তার সকল ক্লান্তি যেন ঐ হাঁসি টুকু দূরে ফেলিয়া দেয়।

ক্রমশঃ।

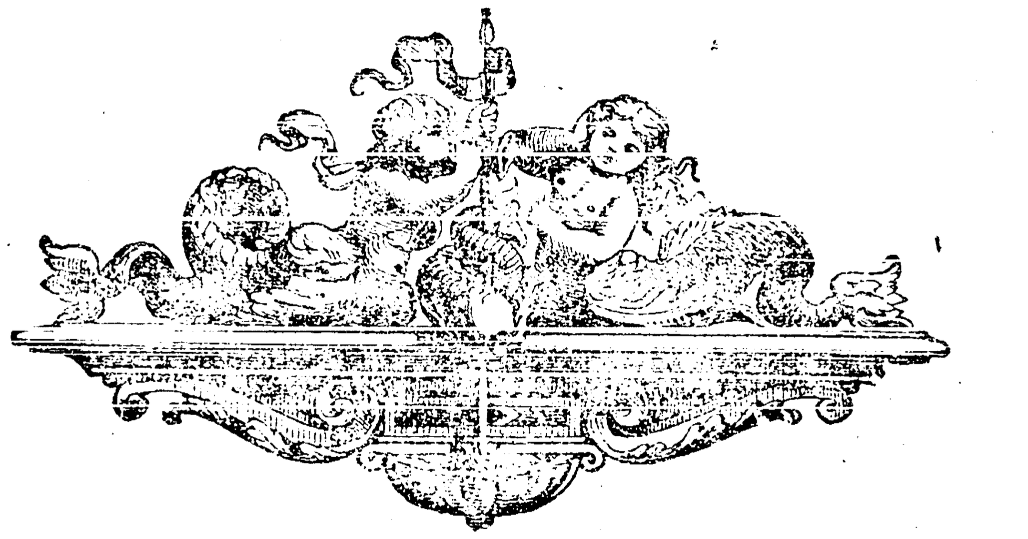

জল কণার গল্প।

খোকার জল খাইবার ছোট গেলাসটীতে বিরানব্বই লক্ষ কোটী জলের অণু আছে। তাহারা কি সকলেই এক স্থান হইতে আসিয়াছে? ঝি তাহাদিগকে কলসী হইতে আনিয়াছে বটে, রামা চাকর কলসীতে করিয়া তাহাদিগকে পুকুর হইতে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু পুকুরে তাহারা কোথা হইতে আসিল? খোকা এই কথা ভাবিতেছে। জল কণারা যদি কথা কহিত, আর খোকা যদি তাহাদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত তবে অবশ্যই তাহারা তাহার উত্তর ভালরূপ দিতে পারিত। ইহার উত্তরে তাহারা কত আশ্চর্য্য গল্পই বলিতে পারিত। মনে কর খোকা এক একটীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর তাহারা উত্তর দিতেছে :—

১। আমরা তিন হাজার জড়াজড়ি করিয়া টুপ্ করিয়া আকাশ হইতে লাফাইয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

২। আমরা ষা'ট্‌লক্ষ রাত্রিকালে গাছের পাতায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে গড়াগড়ি করিয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

৩। আমরা ডাঙ্গা হইতে পুকুরে নামিয়াছিলাম।

৪। আমরা দলে দলে পর্ব্বত হইতে সমুদ্রে যাইতেছিলাম। পথে বালুকণার ফাঁকের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিলাম। শেষে কষ্টে স্বষ্টে সেই বালির ভিতর দিয়া এখানে আসিয়াছি।

খোকার ক্ষুদ্র মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তাহার জিজ্ঞাসা ফুরাইল না। সে আরো কত শত কথাই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। কত কথাই সে শিখিল। ইহারা বলিল "এককালে আমরা সকলেই সমুদ্রে ছিলাম। এখন খোকা বাবু আমাদিগকে গেলাসে পূরিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে; তখন আমরা তোমাদের বড় বড় জাহাজগুলিকে ইচ্ছা করিলে গিলিয়া ফেলিতে পারিতাম। সমুদ্র হইল কি না আমাদের সমাজ। সমুদ্র আর কি? আমরাইত সমুদ্র। সমুদ্রে যখন ছিলাম, বেশ ছিলাম।

"একবার বড় গরম হইল। গরম হইলে অনেকগুলি গা ঘেসাঘেসি করিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হয়। আমরা ফাঁক ফাঁক হইয়া বাতাসে মিশিয়া আকাশে উঠিলাম। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কত স্থানেই গেলেম, কত তামাসাই দেখিলাম। তখন কিন্তু আমাদিগকে কেহই দেখিতে পাইত না—আমরা বাতাসের ভিতরে ছিলাম।

"এক দিন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। আমরা তখন বাতাসের বাহিরে আসিয়া দলবদ্ধ হইলাম; মনে করিলাম নীচে নামিয়া দেখি কেমন লাগে। তখন তোমরা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে, আর মেঘ বলিয়া ডাকিলে। যখন আমরা শীতে পড়িতে লাগিলাম, তখন তোমরা বলিলে 'বৃষ্টি হইতেছে'। আমাদের কেহ কেহ তোমাদের পুকুরে পড়িলাম। কেহ কেহ অন্য স্থানে পড়িয়াও শেষে কেমন করিয়া পুকুরেই আসিল। আর সকলের কি হইল বলিতে পারি না—"

এমন সময়ে খোকার পাতে সন্দেশ পড়িল। খোকা অমনি সব ভুলিয়া গিয়া সন্দেশ লইয়া ব্যস্ত হইল। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। খোকার লোভ একটু কম হইলে আমরা জল কণাদের নিকট আরো কত গল্প শুনিতে পারিতাম।

রাগ।

"দাদা পেল বড় সন্দেশ, দিদি পেল আর,
আমায় দিলেন সব ছোট টা একি অন্যায় মা'র;
তাইতে আমি রইছি ব'সে কিছুই খাব না,
এম্‌নি করে থাক্‌লে পরে জব্দ হবেন মা।"
এইটী ভেবে কিরণ বাবু মুখটী করি ভার
আছেন ঘরে, সাধ্‌তে তাঁরে কেউ এসে না আর।
পেট্‌টি বলে "আর তো আমি পারিনে রে ভাই;
চুপে চাপে দাওনা কিছু একটু খানি খাই।"

কিরণ বলে "রাগ করেছি শান্ত হয়ে থাক"
উদর বলে "রাগতো শেষে আমায় আগে রাখ।"
বিরস মনে কিরণ বাবু কাঁদেন ধীরে ধীরে
পায়ে পড়ে উদর ভায়া দিচ্ছেন মাথার কিরে।
পেটের সনে ঝগড়া ঝাটি কার কতক্ষণ সয়?
উদর চাঁদের মুখের আজ্ঞা না শুনিলে নয়।
ভেবে চিন্তে কিরণ তবে ধীরে ধীরে উঠি,
এদিক ওদিক, সেদিক চেয়ে, যান গুটি গুটি।
খাবার ঘরে কিরণ বাবু যাই দিয়েছেন পা
বাঁ দিকেতে দাদা দিদি, ডাইনে এলেন মা।
রাগের বড়াই দেখে সবাই হেসে কুটি কুটি
লজ্জা পেয়ে কিরণ বাবু ঢাক্‌লে আঁখি দুটি।
কোলে করে মা তাহারে খাওয়া'ন তাড়াতাড়ি
পেটের সনে মিট্‌লো গোল, রাগের মাথায় বাড়ি।

ভাই বোন্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় বার বছরের কথা। সেই ১২৮২ সালের কার্ত্তিক মাসের কথা মনে পড়ে কি? সেই কার্ত্তিক মাসে কত গরিব ধনী হইয়াছে কত ধনী গরিব হইয়াছে আবার কতজন চিরকালের জন্য ধন ও দরিদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

লোকে বলে ১৩ই কার্ত্তিক ঝড় বৃষ্টি হওয়া বার্ষিক কার্য্য। এ প্রবাদ সকল দেশে প্রচলিত আছে কি না জানি না। কিন্তু আমরা তখন প্রত্যেক বছরই কার্ত্তিক মাসের ১৩ই-র জন্য অপেক্ষা করিতাম। প্রায় প্রত্যেক বছরই আমাদের আশা পূর্ণ হইত কিন্তু ১২৮২ সালে যেরূপ হইয়াছে ঈশ্বর যেন এরূপ আর কখনও না করেন!!

৮২ সালে ও ১৩ই কার্ত্তিকের ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাবিলাম অল্পেই শেষ হইবে। দিন গেল ঝড় বৃষ্টি থামিল না। সে দিন রাত্রিতে সকলে ভাবিল ১৪ই প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার হইবে। কিন্তু সে আশা সফল হইল না। ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই ক্রমাগত বৃষ্টি ও ঝড় হইল। কখনও বা একটু কমে আবার কখনও বা দ্বিগুণ বেগে ঝড় আসে। অনেক গরিবের খাওয়া বন্ধ হইল অনেকের ঘর পড়িয়া গেল। শেষে সকলেই বলিল "সাইক্লোন্" হইয়াছে। কয়েক দিন পরে সংবাদ আসিল "দৌলতখাঁ"র জলপ্লাবন হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক সেই জল স্রোতে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া গিয়াছে।

সেই ১২৮২ সালের ১৫ই কার্ত্তিক সন্ধ্যার পর দৌলতখাঁর এক বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। নিকটে একটী নয় বৎসরের ছেলে এবং ১২ বৎসরের একটী মেয়ে। ইনি কি কাজ করিতেন তাহা বলিব না কিন্তু কোন বড় কাজ করিতেন। নাম———বসু। ঘরের দোরে বসে বাহিরের দিকে আকাশের দিকে চাহিতেছেন। ঘরের মেজেতে গৃহিণী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া নীরবে কি ভাবিতেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেটী বলিল "বাবা, মাঠেরদিকে ও সাদা সাদা কি দেখা যাচ্ছে?"

বাবা। "জল।"

ছেলে। "ও কি বৃষ্টির জল বাবা ?"

বাবা। "না বাবা, নদীর জল বেড়েছে। শুন্‌লে না, রাম বাবু তখন বলিলেন ক্রমেই জল বাড়িতেছে।"

মেয়ে। "হাঁ বাবা তবে কি বাড়ীতে জল উঠ্‌বে ?"

বাবা। "কি জানি মা, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাকিতে তোমাদের ভয় কি ?"

পিতার আশ্রয় পাইলে আর ভয় কি ? পিতার আশ্বাস পেয়ে ছেলে ও মেয়ে চুপ করে কি ভাবিতে লাগিল। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেও আঁধার বেশী হ'লো। সাদা জল অদৃশ্য হইল। জল বাড়িতেছে কি কমিতেছে কে জানে? ঈশ্বর ভরসা করিয়া বসু বাবু ঘরের ভিতরে গেলেন।

ক্রমে খাওয়ার সময় হইল। মা, খোকাকে বিছানায় রেখে সকল কাজ সারিলেন। আবার খোকাকে কোলে করে বসিলেন। তখন মেয়ে এসে মার কাছে বসিল। মা বলিলেন :—

"কুসুম, তুই কি ভাবিতেছিস্ ?"

কুসুম বলিল "না, মা, বেশী কিছু ভাব্‌ছি না; তবে মনে হচ্ছে যেন জল খুব বাড়িতেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় সকল ভাসিয়া যাইবে। আমরা জলের স্রোতে কোথায় যাইব কে জানে? মা; আর কি আমরা————

বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেশ ক্রমে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলিল "দিদি তুই কাঁদ্‌ছিস কেন ? বাবা কি বলিলেন তা শুনিশ্‌নি ? বাবার কাছে আমাদের ভয় কি ? বাবা আমাদের কোলে করে সাঁতরিয়ে নিয়ে যাবেন এখন; খোকা তো মার কোলেই রয়েছে। তবে আর ভয় কি ? কেমন মা ?"

মা বলিলেন "হ্যাঁ, তাইতো।" কিন্তু মা বুঝিয়াছিলেন যে তিনি কিম্বা বাবা রক্ষা করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর ভিন্ন এ বিপদে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। রাত্রি অধিক হইল। সুরেশ ও কুসুম একত্র ঘুমালো। পাছে ঘুমের মধ্যে জলে ভেসে যায় এই ভয়েই যেন দুই ভাই বোনে একত্রে পরস্পরের গায়ে হাত রেখে শয়ন করিল। সে দৃশ্য কি চমৎকার !! জলের স্রোতের ভয়ে ভাই বোনের স্নেহ দৃঢ়বদ্ধ হইল। মা বাপ সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রি আরও গভীর হইল। তাঁহারা ঈশ্বর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ।

ধাঁধা।

তিন অক্ষরে নাম মোর সবে করে ভয়
অথচ সকলে লয় আমার আশ্রয়।
মধ্যম ছাড়িয়া আমি সব সঙ্গে থাকি।
মাথা কেটে শত্রু হ'তে আমি দেশ রাখি।
কোথায় বসতি মোর কোথায় গমন
নাহি জানে কেহ; বল আমি কোন জন ?।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা।

মার্চ্চ, ১৮৮৮।

দুইখানি ছবি।

(২৯ পৃষ্ঠার পর।)

শচীকান্তেরও পিতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বয়সে তাহার দোষগুলি না কমিয়া বরং বাড়িয়াছে। ষোল বৎসরের বালক ইহারই মধ্যে ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনের অহঙ্কারে ইহারই মধ্যে আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ হইয়াছে। পদ্ম ফুলের মত সাজিয়া মূর্ত্তিমান অহঙ্কার স্বরূপ হইয়া যখন পিতার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীগণের উপর অসম্মান ও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে থাকে তখন তাঁহারা ইহার ভাবী অবস্থা ভাবিয়া মনে মনে শোক করেন। পূর্ব্বে স্কুলে পড়িতে যাওয়া একটা নাম ছিল, এখন তাহাও নাই। স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া সে এখন পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছে। এক দিন স্কুলের একটা পরীক্ষার সময় শচীকান্ত স্বচ্ছন্দে বই খুলিয়া উত্তর লিখিতেছিল, এমন সময় শিক্ষক দেখিতে পাইয়া তাহাকে পরীক্ষাস্থল হইতে বাহির করিয়া দেন এবং আর কখনও এইরূপ করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্লাসের সকল ছেলের সাম্‌নে তাঁহার নিকট ক্ষমা না চাহিলে তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন এই আদেশ প্রচার করেন। পাঁচ লক্ষ টাকার অধিপতি শচীকান্ত বাবু কি একটা মাইনে করা মাষ্টারের কাছে ক্ষমা চাহিতে যাইবেন ? এত অপমান ? না, কখনই না, প্রাণ গেলেও না। তিনি ইচ্ছা করিলে অমনি কত গণ্ডা মাষ্টারকে কিনিতে পারেন আর তিনি কিনা তার কাছে মাথা হেঁট করিবেন ! ক্ষমা চাওয়া হইল না। সেই দিন হইতে শচীকান্তের সহিত স্কুলের সম্পর্ক চির-দিনের মত ফুরাইল।

যাহাহউক আসল কাজে মন থাকুক বা নাই থাকুক তবুও রোজ রোজ স্কুলে যাওয়া শচীকান্তের একটা কাজের মধ্যে ছিল। সেখানে আর কিছু হউক বা না হউক, দশটা ছেলের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়াও সময়টা যাইত, এখন সেটাও গেল। কিন্তু এখন সময় কাটে কি করিয়া? কাজেই তার জন্য বাহিরের একটা উপায় দেখিতে হইল। কলিকাতা সহর, আমোদের ভাবনা নাই। আজ থিয়েটার, কাল সার্কাস, অন্যদিন অপেরা এইরূপ করিয়া দিন যায়। সন্ধ্যার পরে আর বাবুকে ধ'রে রাখা ভার। যে সকল থিয়েটারগুলির নাম করিলেও পাপ, বাবুর সেইগুলি এখন তীর্থ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন যাইতে না পারিলে সে দিনটা বৃথায় যায় ! পাপের সহচর বন্ধুও অনেকগুলি যুটিল। এইরূপ একটী একটী করিয়া শচীকান্তের অধোগমনের সিঁড়ি তৈয়ার হইতে লাগিল।

কামাখ্যাচরণ বসু রামকান্ত দত্তের অনেকদিনের বন্ধু। অতিশয় ভাল লোক। মৃত্যুকালে রামকান্ত বাবু তাঁহারই হাতে স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার দিয়া যান। তিনিও আপনার মত মৃত বন্ধুর বিষয় সম্পত্তি অতি যত্নে রক্ষা করিতেন। শচীকান্তের নাবালক অবস্থায় তাঁহারই হাতে এখন সমুদয় বিষয়। শচীকান্তের যত টাকা মাসিক বরাদ্দ, তাহা তিনি নিজের হাতে তাহাকে দেন এ সকলের এদিক ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু আজ কাল শচী বাবুর আর পূর্ব্বের মত অল্প টাকায় চলে না, দেখিতে দেখিতে টাকাগুলি যেন পাখা তুলিয়া উড়িয়া যায়। সুতরাং কামাখ্যা বাবুর কাছে নিত্য নূতন খরচের টাকার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কামাখ্যা বাবু শচীকান্তের আজ কাল কার ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট, বিশেষতঃ তাহার ঐরূপ স্কুল ছাড়িয়া আসার কথা শুনিয়া অবধি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন; তাহার উপর আবার তাহার এইরূপ অপব্যয়িতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন স্থির করিলেন; কিন্তু তাহা সহসা পারিলেন না। কামাখ্যা বাবু বুদ্ধিমান লোক। শচীকান্ত তাঁহাকেই যা কিছু ভয় ও সম্ভ্রম করে, পাছে অবশেষে তাহাও যায় এই ভয়ে এবং স্নেহের আকর্ষণে যদি সুপথে থাকে, এই আশায় পূর্ব্বের মত তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে ও ইচ্ছামত টাকা দিতে লাগিলেন।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। হরিনাথ এখন ২১ বৎসরের যুবা। একদিন রাত্রিতে যে কুটীরে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই কুটীরে হরিনাথ বসিয়া মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে এখন আর পূর্ব্বের মত বালক নাই, শরীর সুস্থ ও সবল। মুখখানি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। দেখিলেই বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, ও মিতাচারী বলিয়া বোধ হয়। হরিনাথ বলিতেছে "দেখ মা, বাবা যেদিন মরিলেন সেদিন্‌কার কথা আজও আমার বেশ মনে পড়ে। মা, বাবা মর্‌বার দিন আমাকে যা যা বলে যান, সে কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজে। সেই কথামত কাজ করিতে আমি খুব চেষ্টা করিতেছি। আর একটা ভাল খবর শোন মা, কামিনী কোথা? আজ লালমোহন বাবু আমাকে দোকানের এক জন কারিকর করে দিয়েছেন, আর আমার মাইনে আজ থেকে পোনেরো টাকা করে দিলেন। এই কাজ দিবার সময় আমার পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি যে আমার কত সুখ্যাতি কর্‌লেন তা আর কি বল্‌ব, শুনে লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে গেল।"

মা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন "বাবা আজ আমার মত সুখী মাতা আর কেউ নাই। ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন।" এই রূপ সুখের কথা বার্ত্তায় সময় যাইতেছে এমন সময়ে রাস্তায় একটা বড় গোল উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক চীৎকার শোনা গেল। মাতাপুত্রে চমকিয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ত হইয়া কি হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন দুই তিন জন কনেষ্টবল এক জন যুবা পুরুষকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবার কাপড় চোপড় অতি বিশৃঙ্খল, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেনা, তাহাদের হাত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না, টলিয়া পড়িতেছে আর জড়ান ভাষায় বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। হরিনাথ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ চিনেছি। দত্ত বাবুদের শচীকান্ত বাবু।" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? অমন করিয়া পাহারাওয়ালায় ধরিয়া লইয়া যায় কেন?"

হরিনাথ ঘৃণায় নাক তুলিয়া কহিল "মাতাল আর কি!"

এই সময়ে কনেষ্টবলেরা দত্ত বাবুদের বাড়ীর কাছে আসিল। দরজায় দুই তিন জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা প্রভুকে এই অবস্থায় পুলিসের হাতে দেখিয়া অনেক অনুনয় করিয়া তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল এবং চারি পাঁচজনে ধরাধরি করিয়া উপর তালায় লইয়া গেল। এই বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া হরিনাথের মাতার চক্ষে জল আসিল। তিনি শচীকান্তের মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "হা অভাগিনি! তোমার দুঃখ ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে শচীকান্ত কামাখ্যা বাবুর বাড়ীর দরজায় দর্শন দিলেন। দরওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কামাখ্যা বাবু বাড়ী আছেন?" "আজ্ঞা হাঁ।" তখন আবার হুকুম হইল যাও, শীঘ্র তাঁকে আস্‌তে বল। শচীকান্ত দত্ত তাঁহার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান বল গিয়ে। যাও, শীঘ্র যাও।" শচীকান্তকে বসাইয়া ভৃত্য প্রভুকে খবর দিল। অল্পক্ষণ পরেই কামাখ্যা বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি শচীকান্তকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কামাখ্যা বাবুর অনুরোধে শচীকান্ত বসিয়া কহিল "মহাশয় আপনি জানেন কি যে আমার একুশ বৎসর বয়স হইয়াছে?" "হাঁ জানি।"

"তবে আমি এখন আইন মতে আমার পিতার বিষয়ের অধিকারী হইয়াছি?" কামাখ্যা বাবু মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন "হাঁ।" "কবে পাইব?" "যেদিন তোমার খুসী।" "তবে যত শীঘ্র পারেন আমার বিষয় আশয় আমার হাতে দিতে বিলম্ব কর্‌বেন না। কাগজপত্র সব ঠিক রাখ্‌বেন, দেরী হয় না যেন। আর আমার আজই পাঁচ হাজার টাকার খুব দরকার, সে টাকাটা আমাকে এখনিই দিন।" শচীকান্তের এইরূপ বলিবার ধরণ ও টাকার জন্য তাগাদা কামাখ্যা বাবুর ভাল লাগিল না। তিনি অনেক সহিয়াছেন কিন্তু আর সহ্য করিবেন না ঠিক করিলেন। গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শচীকান্ত অস্থির হইয়া আবার কহিল "কি! শুন্‌তে পাচ্ছেন মহাশয়?" কামাখ্যা বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন "হাঁ কাগজ পত্র সবই ঠিক আছে। আর শোন, তোমার হিসাবে এপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আমি নিজে সে সকল হিসাব রাখিয়াছি। এখন তুমি সেগুলি কি দেখিবে?" "ওঃ! হিসাব পত্র দেখা? সে সব কাজ পরে হবে। আমার এখন হিসাব দেখবার সময় আদপেই নাই। আজ আমার আবার একটা ভারি কাজ আছে। সকাল সকাল বেরুতে হবে। এখন বলুন কখন টাকা দেবেন?" কামাখ্যা বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন "শোন শচীকান্ত, টাকা তোমার। তুমি যেরূপেই খরচ কর না কেন আমার তাতে কিছুই বল্‌বার নাই। তবে আমি নাকি তোমার বাবার অনেক দিনের বন্ধু, আর ছেলেবেলা থেকে তোমাকে ভাল বাসি ও তোমার মঙ্গল চিন্তা করি, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি এতগুলি টাকা দিয়ে কি কর্‌বে?"

"তা মহাশয়, আপনি যেই হন্‌না কেন, আপনাকে এসব খবর বল্‌তে আমি বাধ্য নই। টাকা আমার, আমি এ দিয়ে যা খুসী তাই কর্‌ব, যেমন ইচ্ছা তেমনি করে ব্যয় কর্‌ব, সে সব বিষয় নিয়ে যে আর কেউ নাড়া চাড়া করে, সেটা আমি আস-

লেই পছন্দ করিনে। আর আমিত এখন আর ছেলে মানুষ নই।” শচীকান্তের এই গর্ব্বিত উত্তর কামাখ্যা বাবুর প্রাণে বাজিল। তিনি বালক কাল হইতে যাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, যার কল্যাণ চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করেন সেই আজ কিনা অক্লেশে তাঁহাকে এমনি করিয়া ঘাড় তুলিয়া মুখ বাঁকাইয়া দশ কথা শুনাইয়া দিল! তাঁহার বয়স ও তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা এ সকলের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইল না। এই ভাবিয়া বৃদ্ধ কামাখ্যা বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি ধীর ও গম্ভীর ভাবে কহিলেন “আচ্ছা, আজ একটার পরে এস।” শচীকান্ত চলিয়া গেল। কামাখ্যা বাবুও একটু পরে বাহির হইলেন। তিনি বরাবর শচীকান্তদের বাড়ী গিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। এবং শচীকান্তের সহিত তাঁহার যে যে কথা হইয়াছিল সমুদয় তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলিয়া কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন “বিষয় দিয়া লাভ কি? দুই দিনেই সব উড়াইবে।”

“আমারও সেই ভয়।” “অচ্ছা, তার হাতে যাতে না যায় তার কোন উপায় নাই?” “কই, না। উইল অনুসারে শচীকান্ত আপনার ত্রিশ হাজার ও আমলার ত্রিশ হাজার এই ষাট হাজার টাকা ছাড়া সব বিষয়ের অধিকারী হইল। আমি তার কাছ থেকে বিষয় রাখি কি করে? আর আজ সে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়াছে এই টাকা আজই দিতে হবে। এতগুল টাকা দিয়ে তার যে কি দরকার তাত বুঝে উঠ্‌তে পারি না।” “পাঁচ হাজার টাকা! এই টাকা দিয়ে কর্‌বে কি?” “কি জানি?” “অপনি কখনও টাকা দেবেন না। দিয়ে কি হবে? জলে ফেলা বইত নয়। ও টাকা আজই উড়াবে।” “না, না, সেটা হঠাৎ করা ঠিক হবে না। তাহ’লে শচীকান্ত আমার উপর ভারি চটে যাবে। আর আমার উপর চটে গেলে আর আমার কোন কথাই শুন্‌বে না। এ অবস্থায় এ কাজটা কি ভাল হবে?” “না, তাহলে ত কোন মতেই হবে না। আপনার উপরেই আমার সব আশা ভরসা। আপনার যা ভাল বিবেচনা হয় কর্‌বেন। শচীর সব ভার ত আপনার উপরেই। আপনার কথা না শুন্‌লে ত একবারেই অধঃপাতে যাবে। হায়! হায়! কর্ত্তা যদি এত টাকা না রেখে মর্‌তেন তাহ’লে শচীর এ দশা হ’ত না।” এই বলিয়া অভাগিনী জননী দুঃখে অধীর হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শীর্ণ শরীর ও এই শোক দেখিয়া কামাখ্যা বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি মনে মনে কুলাঙ্গার পুত্রকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

একটার সময় আবার শচীকান্ত দেখা দিল। কামাখ্যা বাবু দেখিয়া অবাক হইলেন যে, শচীকান্ত মদ খাইয়া আসিয়াছে! আধভাঙ্গা স্বরে ও জড়ান কথায় শচীকান্ত কহিল “কই আমার টাকা?” কামাখ্যা বাবু কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন “আজ দিতে পারিব না, কাল তোমার নিলে হয় না কি?” “কি! আমি আজ সকালে বলে যাইনি যে আমার আজই চাই?” “হাঁ বলেছিলে।” “তবে আর কি? আমার যে কথা সেই কাজ। ভাল চাওত এখনি দাও।” এই জ্ঞানহীন পশুর সহিত তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া কামাখ্যা বাবু তাহাকে একখানা পাঁচ হাজার টাকার চেক দিলেন আর বলিলেন “দেখ তোমাকে এই টাকা দিতে তোমার কতকগুলি ভাল সুদের কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হইল।” “তা যাই হোক সে কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আর টাকা কড়ির কথা

বলে আমাকে যখন তখন বিরক্ত কর্‌বেন না।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সে দিন শচীকান্তের আর দেখা নাই। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, একে একে এগার, বার, একটা বাজিয়া গেল তবুও তাঁহার উদ্দেশ নাই। এই ঘটনা শচীকান্তের আজ নূতন নহে, প্রতিদিনই এরূপ হয়, সকলে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, সে কখন বাড়ী আসে কেহ জানে না। আজ তাহা হয় নাই। আজ তাহার মাতা একাকিনী আপন ঘরে বসিয়া আছেন। শচীকান্ত পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে, সে টাকা দিয়া কি করিল, তাহা না জানিয়া তিনি শুইতে যাইতে পারিতেছেন না। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। এ সময়ে কেহ ঘরের বাহির হয় না, এই অন্ধকারে এত রাত্রিতে শচীকান্ত গেল কোথায়? শচীকান্তের অভাব কিসের? রাজ অট্টালিকার মত বাড়ী, কোন জিনিসের অপ্রতুল নাই। আজ্ঞামত সকলই প্রস্তুত। এ সুখের স্থান ছাড়িয়া গেল কোথায়? গৃহে স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী ও সাধ্বী পত্নী। শচীকান্তের গৃহে ত ভালবাসার অভাব নাই। এ সকল অমূল্যধন তুচ্ছ করিয়া এ সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া শচীকান্ত কিসের জন্য এই রাত্রিতে কোথায় ফিরিতেছে? এই সকল ভাবনায় মায়ের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, দুই চক্ষের জলধারার বিরাম নাই। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া ক্ষীণ হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

হা শচীকান্ত, হতভাগ্য যুবক! পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আইস। জননীর প্রাণে যে কি বিষম শেল বিঁধিতেছে, একবার তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। শিশুকালের মত আবার তাঁহার স্নেহের কোলে আশ্রয় লও। এখনও ফিরিয়া আইস, মায়ের স্নেহময় কোলে এখনও তোমার স্থান আছে। হা দুর্ভাগ্য সন্তান, এ সুখের স্থান, এ আরামের জায়গা, ফেলিয়া কোন্ নরকে যাইতেছ?

রাত্রি প্রায় দুইটা, এমন সময় হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হইল, পরে জুতার শব্দ। শব্দ শুনিয়া শচীকান্তের মাতার হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলেন সে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে তাহার ঘরের দিকে গেলেন। দেখিলেন সে টলিতে টলিতে আসিতেছে, অমনি দুই হাতে তাহাকে ধরিলেন, আর কহিলেন “শচীকান্ত, আজ তোমার এত দেরী হইল কেন?” মাতার স্বর কোমল ও স্নেহপূর্ণ। শচীকান্ত মাতাকে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। পরে আবার তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন “আমার ঘরে চল কথা আছে।” শচীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল। তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসাইয়া তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন “দেখ শচীকান্ত, তুমি এখন বড় হইয়াছ। তোমার এখন আপনি বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিবার বয়স হইয়াছে। তোমার কোন কাজে হাত দেওয়া আমার আর সময় নাই; তবুও আমি তোমার মা, আমি যেমন পৃথিবীতে তোমার কল্যান ভাবিব এমন আর কেহ পারিবে না, তাই জিজ্ঞাসা করি আজকার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কর্‌লে কি?” শচীকান্ত ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল “দেখ মা, তুমি যে আমাকে এমন করে কথা জিজ্ঞাসা কর এটা আমি ভালবাসি না। আমি টাকা খরচ কর্‌তে জানি, সে টাকা আমি ভাল করেই খরচ করেছি।” “তাহ’লে আর আমাকে বল্‌তে আপত্তি কি?” “আপত্তি ঢের আছে। আমার খুসী, আমি তোমায় বল্‌ব না। মেয়ে মানুষ তুমি, তুমি টাকা কড়ি বিষয় আশ-

য়ের কথা বোঝ কি? তোমারা খাবে, পর্‌বে, থাক্‌বে, তোমাদের এসব কথা নিয়ে মাথাব্যাথা কেন? সব সইতে পারি, কিন্তু মেয়ে মানুষ যে তিন ঘণ্টা দাঁড়াইয়ে লম্বা লেক্‌চার ঝাড়্‌বে সেটা আদ্‌রে সহ্য হয় না।” এইরূপ কটূক্তি করিয়া পাপী কুলাঙ্গার সন্তান মাতাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দুঃখে অপমানে লজ্জায় দুঃখিনী বিধবা ভূমিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মার অতুল স্নেহের প্রতিদান এই।

ক্রমশঃ

নাগা জাতি।

(২২ পৃষ্ঠার পর।)

তোমরা গত মাসের সখাতে পড়িয়াছ যে, নাগাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ প্রায় হইয়া থাকে, দুই এক মাস হয়ত বেশ শান্তিতে যাইতেছে কিন্তু তৃতীয় মাসে যে কি হইবে কেহ তাহা বলিতে পারে না। এরূপ যেখানকার অবস্থা সেখানকার লোককে কাযেই খুব সতর্ক থাকিতে হয়, বাস্তবিক নাগাদের গ্রাম এবং পল্লি গুলি যেরূপ ভাবে স্থাপিত এবং গঠিত তাহা দেখিলেই এই জাতির সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক একটী গ্রাম এক একটী দুর্গ বলিলেই হয়। অবশ্য এসকল দুর্গ ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ* কিম্বা ফোর্ট উইলিয়ম প্রভৃতি ইংরেজাদিগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত নয়। আর তা হইবেই বা কেমন করিয়া, কোথায় প্রভূত পরাক্রমশালী সুসভ্য ইংরেজ আর কোথায় বর্ব্বর নাগা জাতি। ভাল, তা না হউক কিন্তু উদ্দেশ্য এক। যাহাতে সহজে গ্রামের মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে ইহারা গ্রামের চারিদিকে বড় বড় শাল কাঠ পুঁতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া দেয় এবং গড়খাই (পরিখা) কাটে; কোন কোন গ্রামের চারিদিকে আবার দস্তর মত পাথরের দেয়াল আছে, যুদ্ধের সময় গ্রামের মধ্য হইতে বিপক্ষদলের প্রতি অস্ত্র চালনের সুবিধার নিমিত্ত ঐ সকল বেড়া এবং দেয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে ছিদ্র করা আছে। এই ত গেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যখন যুদ্ধ বাধে তখন ইহারা গ্রাম রক্ষার নিমিত্ত আরও বিশেষ বন্দোবস্ত করে, এই সময়ে পাহাড়ের ঢালে এবং পথে ঘাটে নানা প্রকার বিপদজনক ফাঁদ পাতিয়া রাখে, এই সকল ফাঁদে পড়িলে মৃত্যু না হউক মানুষকে বিলক্ষণ যখম হইতে হয়। যে সকল পথ দিয়া শত্রু উঠিবার সম্ভব সেই সকল পথে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাঁসের সুতীক্ষ্ণ সলাকা সকল পুঁতিয়া যাহাতে হঠাৎ কেহ না জানিতে পারে এই নিমিত্ত পাতা, ঘাস, এবং মাটি দিয়া গর্ত্তের মুখ ঢাকিয়া রাখে। সহজেইত নাগাদিগের গ্রামে প্রবেশ করা কঠিন, কারণ গ্রাম গুলি পাহাড়ের উপরে, আবার পথ ঘাট এমনি অপ্রশস্ত এবং আঁকা-

*মান্দ্রাজ সহরে ইংরেজদিগের যে কেল্লা (দুর্গ) আছে তাহার নাম “ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ”। কলিকাতার কেল্লার নাম “ফোর্ট উইলিয়ম”

বাঁকা যে দুইজনের পাশাপাশি চলিবার যো নাই, গ্রামে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দুয়ার, ইহার উপর যুদ্ধ বাধিলে ঐ রূপ নানা প্রকার ফাঁদ পাতা হয় এবং প্রবেশ দ্বারে দিন রাত্রি প্রহরী থাকে।

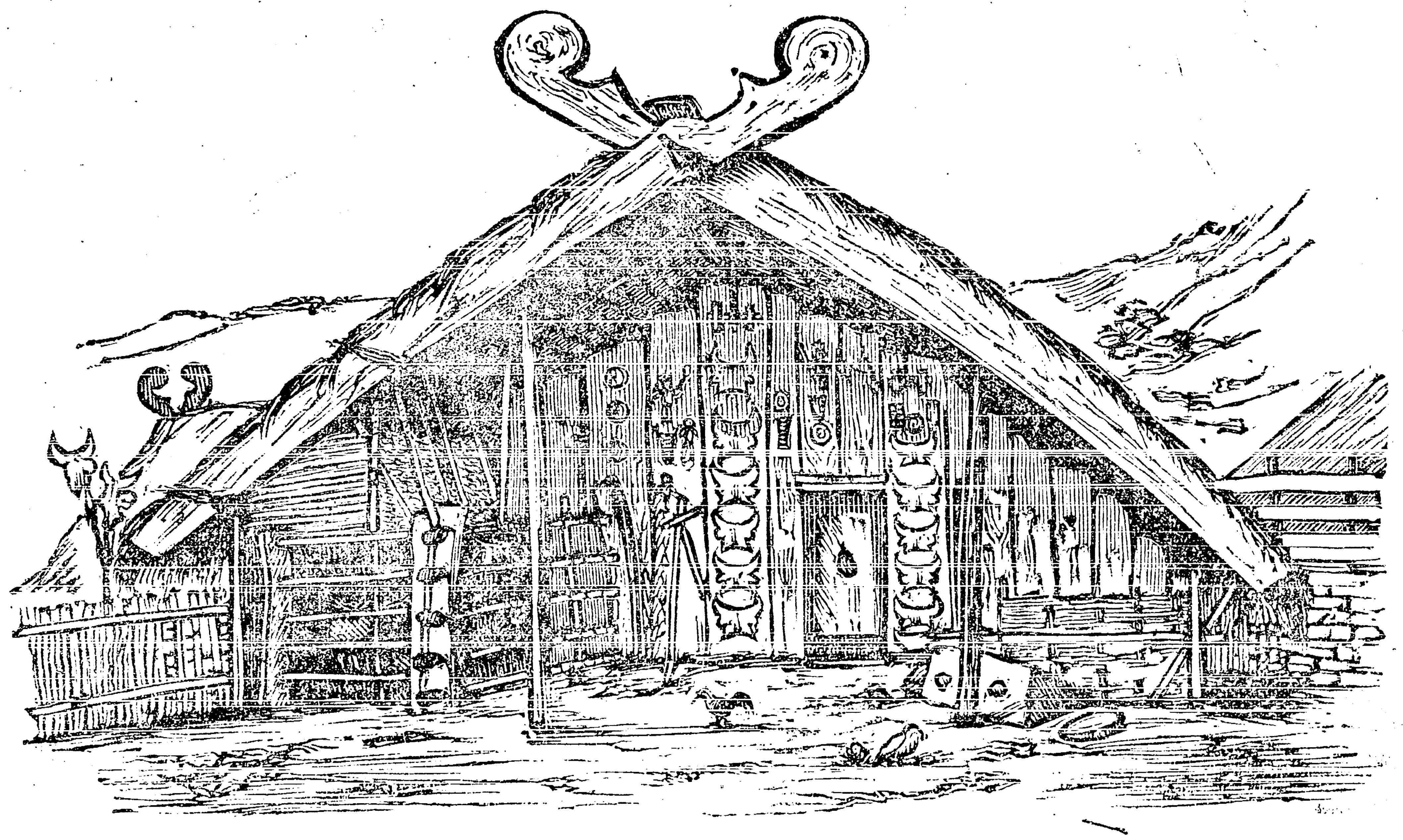

এক এক গ্রামে প্রায় চারি পাঁচ শত নাগার বাস, নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামেও অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট ঘর লোক আছে। ঘর গুলি পাহাড়ের ঢালে এমন এক ধরণে নির্ম্মিত যে এরূপ আকারের ঘর অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। ঘরের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার সম্মুখ পাহাড়ের দিকে এবং এদিক খুব উঁচু, পশ্চাৎ এবং দুই পার্শ্ব নীচু, এমন কি প্রায় মাটিতে ঠেকিয়াছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলে প্রায় মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি হয়, কিন্তু ঘর গুলি এই আকারের বলিয়া ঝড় ও বৃষ্টির বেগ বড় একটা লাগে না। ঘর গুলির সম্মুখদিক দেখিতে খুব জমকাল, এবং সুসজ্জিত, মনে রেখ নাগা রুচি অনুসারে সুসজ্জিত, নানা রঙ্গের সুন্দর সুন্দর পাখীর পালক, হরিণের সিং, বাঘ ছাল, এবং কখন কখন নরকপাল এই সজ্জার উপকরণ। গৃহস্বামীর অবস্থা এবং রুচি অনুসারে প্রত্যেক ঘর দুই কিম্বা তিন অংশে বিভক্ত, ঘরের আসবাবের মধ্যে ধান, চাউল প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বাঁসের বড় বড় ঠেস, এই সকল ঠেস প্রস্তুত করিতে ইহারা অনেক পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় করে; রান্না, আহার, শয়ন ঘরের আর এক অংশে হয়, অস্ত্র সস্ত্র সকলও এই থানে থাকে; প্রত্যেক ঘরেই এক একটী ক্ষুদ্র ভাঁটিখানা আছে, নাগারা অতিশয় সুরাপায়ী, আহার করিবার অন্য কিছু থাক আর না থাক সুরা চাই। ঘরের অতি নিকটেই গৃহপালিত পশু পক্ষী রাখিবার স্থান; যাহারা অপেক্ষাকৃত গরিব তাহারা ঘরের মধ্যেই রাখে। কোন কোন গ্রামে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের ঘরের চারিদিকেই পাথরের পাঁচীল।

গ্রামের অতি নিকটে, কখন কখন বাস গৃহের

চারি পাঁচ হাত মাত্র অন্তরে মৃতদেহ গোর দেয়, গোরের উপরে নানা আকৃতির মাটির স্তম্ভ প্রস্তুত করে। মৃত ব্যক্তির যুদ্ধের সরঞ্জাম যা কিছু থাকে, তাহা তাহার সঙ্গেই গোর দেয়;, কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি গোরের উপর এক খানি কাঠ কিম্বা একখানি পাথরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তির যদি জন্ম এক গ্রামে এবং আর এক গ্রামে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহাকে দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোর দেওয়া হয়, ইহার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যেন দুই গ্রামেই ইচ্ছামত বেড়াইতে পারে। জীবিত ব্যক্তির সম্মানের নিমিত্তও নাগারা কখন কখন প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃহৎ এক খণ্ড পাথর মাটিতে পুঁতিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া নৃত্য গীত করে, সুরাপানে মত্ত হইয়া অঙ্গে নানা প্রকার রং মাখিয়া ঐ পাথরকে বেষ্টন করিয়া করিয়া যখন নৃত্য করে তখন দেখিতে অতি চমৎকার। গ্রামের কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব এবং নিপুণতার পরিচয় দেয়, কিম্বা অন্য কোন প্রকার জনসাধারণের হিতকর কার্য্য করে তাহা হইলে তাহার সম্মানার্থ এইরূপ স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। নাগারা ভক্তি এবং ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপও কখন কখন এইরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গৃহস্বামীয় মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি পুত্র সন্তান-দিগের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়, কণিষ্ঠ পুত্র এই সমান অংশ ভিন্ন ঘর এক খানিও পাইয়া থাকে, গৃহস্বামীর পত্নী এবং কন্যারা সম্পত্তির অধিকারিণী হন না, মাতার এবং ভগ্নীগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত পুত্রেরা দায়ী থাকে।* এবং এই দায়িত্ব তাহারা উচিত মত প্রতিপালন করে। বল্লম এবং দা নাগাদিগের প্রধান অস্ত্র, সম্প্রতি আঙ্গামী নাগারা পিস্তল এবং বন্দুক ব্যবহার করিতে বেশ শিখিয়াছে, এখন বন্দুকে তাহাদের এত সখ যে একটী বন্দুক পাইবার নিমিত্ত এমন কোন জিনিষ নাই যা ইহারা না দিতে পারে; অন্য কোন উপায়ে যদি না পায় তাহা হইলে সুবিধা পাইলেই বন্দুক, গুলি, বারুদ চুরি করে, চুরি করা ইহাদের নিকট একটা বাহাদুরীর কায। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাগারা পাহাড় হইতে নামিয়া নিকটবর্ত্তী চা-বাগানে এবং গ্রামে ও বাজারে বড় উৎপাৎ করিত, এখন কিন্তু অনেকটা শান্ত হই-য়াছে, এবং আঙ্গামী প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় নাগা সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের কৌশলে এবং সুশাসনে উপকৃত এবং উন্নত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনকয়েক আঙ্গামী এবং লোটা নাগা কলিকাতায় আসিয়াছিল, ইহারা রেল-গাড়ি, জাহাজ, কেল্লা, প্রদর্শনী মেলা, বড়বাজার, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়া-ছিল তা আর কি বলিব, অন্ততঃ এই কয়েক জন নাগার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা নাগা-জাতি অপেক্ষা অনেক পরাক্রমশালী এবং ভাল, ইহাদের সহিত শত্রুতা না করিয়া বন্ধুতা করাই উচিত। যাহা বলিতেছিলাম, বল্লমগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, কত প্রকার পাখীর পালক, পশুর লোম দ্বারা সুসজ্জিত। বানফারা প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় নাগারা বল্লম অপেক্ষা দা বেশী ব্যবহার করে, এই দা অতি ভয়ানক জিনিষ, প্রায় দুই কি আড়াই ফুট লম্বা আর চারি কি পাঁচ ইঞ্চ চৌড়া এবং অতিশয় ধারাল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধের সময় নাগারা ঢাল ব্যবহার করে কিন্তু তোমরা সচরাচর যে ঢাল দেখিয়া থাক এ সে ঢাল নয়, এ ঢাল বাঁসের এবং দেখিতে ছোট খাট একখানি ঝাঁপের মত (গত মাসের সখার

২১ পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রটী দেখ) বল্লমের ন্যায় ঢাল ও নানা প্রকার পাখীর পালক, পশুর লোমে সজ্জিত।

জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত নাগারা নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করে, স্ত্রীলোকেরা চাসের যথেষ্ট সাহায্য করে, এমন কি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি প্রস্তুত ভিন্ন চাসের আর সমস্ত ভার স্ত্রীলোকদিগের উপর—যুদ্ধ করা এবং সুরা পান পুরুষদিগের প্রধান কায। চাসের অস্ত্রের মধ্যে দা এবং খুরপি প্রধান, তবে সে খুরপি এদেশের খুরপি অপেক্ষা বড় এবং

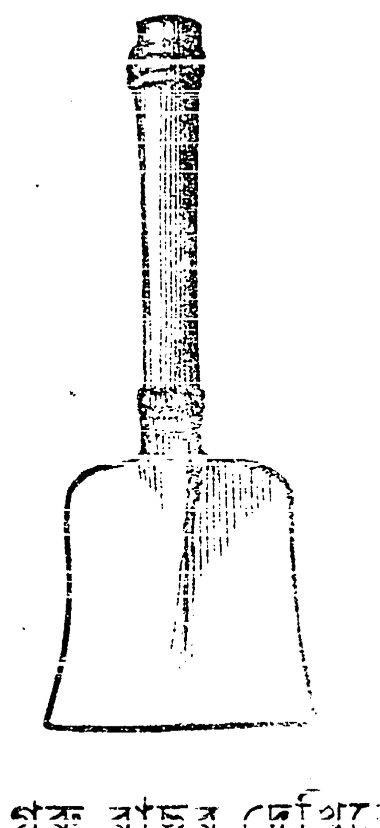

ধারাল। আহার এবং ব্যবসায়ের নিমিত্ত ইহারা গরু, ছাগল, শূকর, কুকুর, মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী পালন করে। গো জাতির উন্নতি বিষয়ে নাগারা এত তৎপর যে, দেখিলে আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হয়, এবং এই কারণে নাগা পাহাড়ে যেরূপ সুন্দর সুন্দর বলিষ্ঠকায় গরু বাছুর দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ আসামের অন্য কোন স্থানে কিম্বা বাঙ্গালা প্রদেশে দেখা যায় না। আহার এবং ব্যবসায়ের উপযোগী পশু পক্ষীর তালিকার মধ্যে কুকুরের নাম দেখিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবে ইহারা বুঝি ইংরেজ-দিগের মত বড় কুকুর ভক্ত, না, তা নয়, নাগা-দের নিকট কুকুর অতিশয় উপাদেয় খাদ্য এবং পীড়া বিশেষে সুপথ্য। কি চমৎকার রুচি! আধ পোড়া কুকুর অতি উপাদেয় খাদ্য, এদিকে দুধের গন্ধ ইহাদের নাকে সহ্য হয় না। রুচি চমৎ-কারই বটে। হয় সিদ্ধ কিম্বা আধ পোড়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার রান্নার প্রণালী ইহারা জানে না। নাগারা সর্ব্বভূক, এমন প্রাণী নাই যা ইহারা না খায়। টিকটিকি, বিছে, বেঙ্গ প্রভৃতিরাও নাগাদিগের প্রশস্ত উদরে স্থান পায়।

নাগাদিগের বিশেষতঃ আঙ্গামীদিগের পরিচ্ছদ যেমন বিচিত্র এবং জমকাল তেমন আর কোন জাতির আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু এ পরিচ্ছদ এবং ইহার উজ্জ্বল দৃশ্য যে কি তাহা না দেখিলে বুঝিয়া উঠা কঠিন। নানা রঙ্গের নানা সাজে সাজিয়া রণবেশ ধরিয়া, রণমদে মাতিয়া সদর্পে নাগা বীর যখন রণে ধাবিত হয় এবং দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে মনের উল্লাসে ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া শত শত নাগাবীরের চীৎকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া যখন আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তোলে তখন যে কি ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা সেই দৃশ্য না দেখিলে সেই চীৎকার না শুনিলে বুঝিবার যো নাই। রণ সজ্জায় সাজাইলে ইহাদিগকে যে কি ভীষণ দেখায় চিত্র দেখিয়া কতকটা বুঝিতে পারিবে বটে, কিন্তু প্রকৃত রণ বেশধারী নাগাবীরকে না দেখিলে বর্ণনা বল, আর চিত্র বল কিছুতেই তাহাদের সেই ভয়ানক ভাব, পরিচ্ছদের বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণ এবং তাহার বিন্যাসের কেতা দেখাইবার যো নাই। যুদ্ধ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ উৎসব উপ-লক্ষেও ইহারা এই জমকাল পোষাক পরিয়া থাকে। এত গেল যুদ্ধ এবং উৎসবের সাজ, সচরাচর ইহারা কেবল একখানি গাঢ় নীল কিম্বা কাল রঙ্গের ছোট ধুতি কোমরে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা শরীরের কতক অংশ ঢাকিয়া গলা বেড় দিয়া পরে বলিয়া তাহাদের সাড়ী গুলি অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা। (গত মাসের সখার ২২ পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখ) এই সকল ধুতি এবং সাড়ী নাগারা নিজে নিজেই বোনে এই সকল

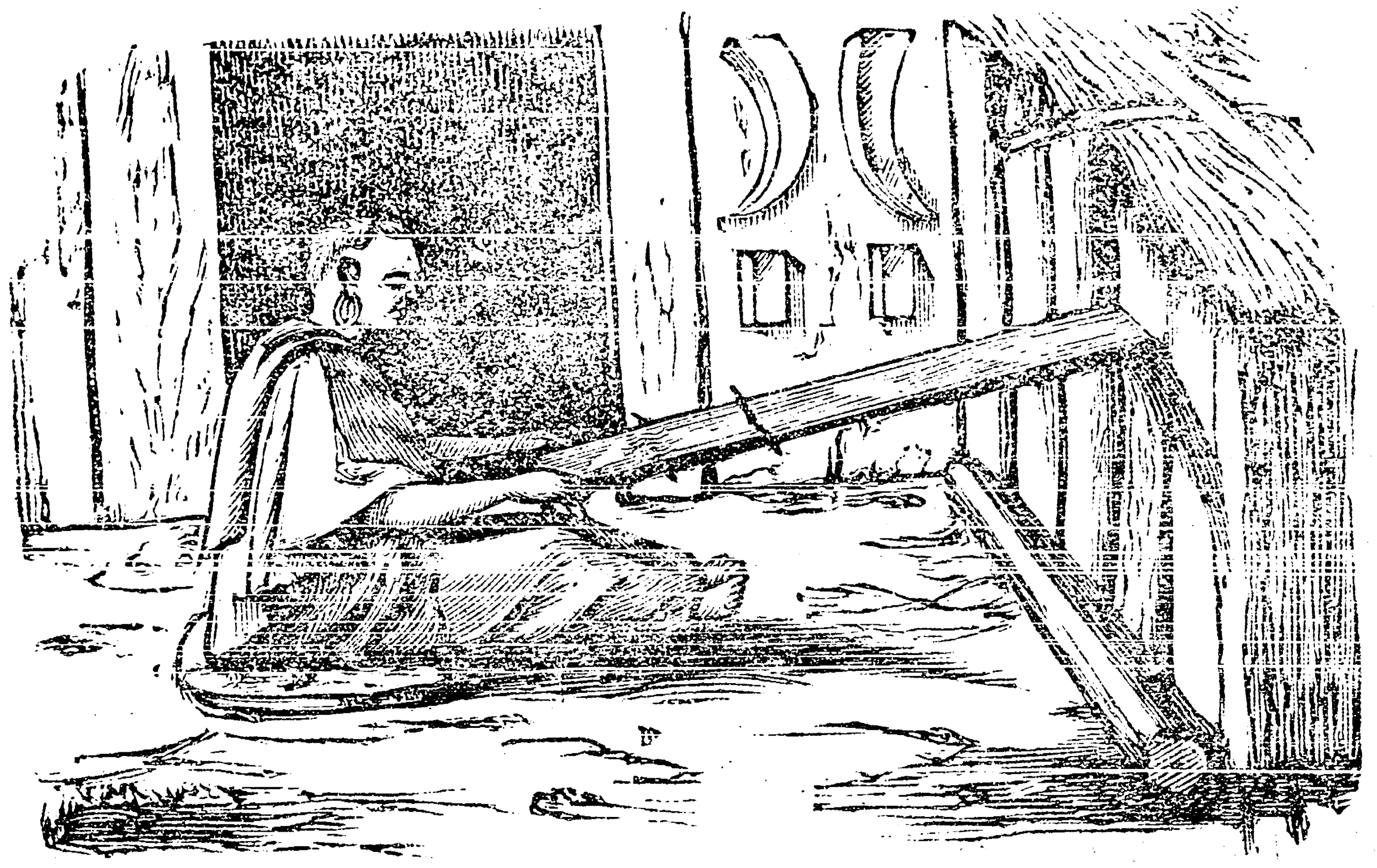

ধুতি এবং সাড়ীতে ইহাদিগের রুচি এবং ক্ষমতা অনুসারে নানা প্রকার নক্সা কাটে, বস্তুতঃ কি কাপড়, কি ঘর, কি অলঙ্কার, নাগাদের তৈয়ারি দ্রব্য সকল দেখিলে ইহাদের শিল্প চাতুরির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ভাল বাসে, তবে নাগা স্ত্রীলোক অপেক্ষা নাগা পুরুষেরা দেহ সজ্জা লইয়া কিছু বেশী ব্যস্ত। ইহারা হাতী এবং শূকরের দাঁত, শঙ্খ, পাখীর পালক, বাঘের নখ প্রভৃতির নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করে। শরীরের এমন স্থান নাই যেখানে কিছু না কিছু একখান না পরে; পৃষ্ঠে—গলার

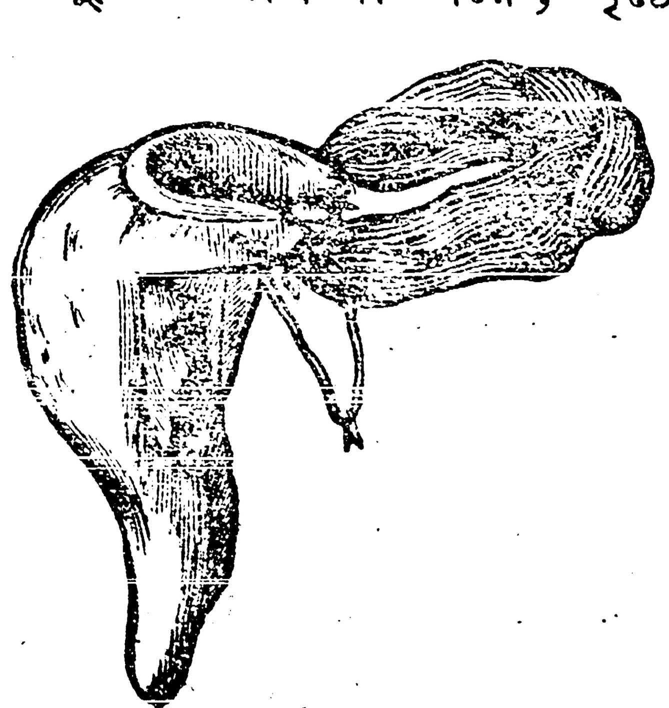

নীচে—পৃষ্ঠ মালা, কর্ণে শূকরের দন্ত নির্ম্মিত দুল, এই দুলে আবার কতকগুলি ভালুকের লোম চাম-

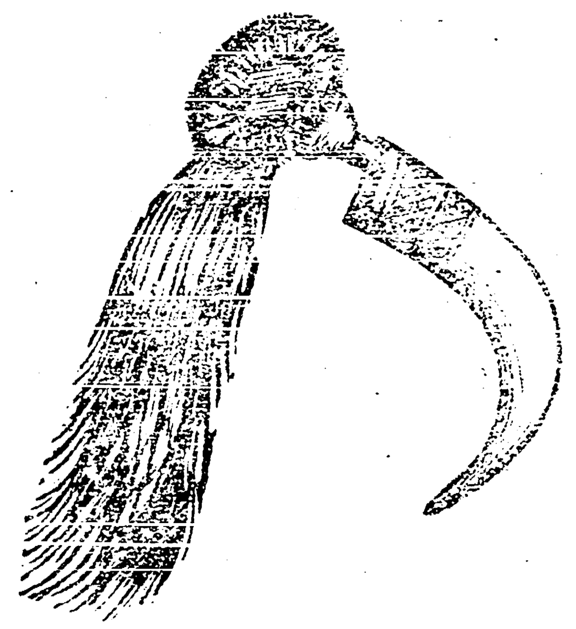

রের মত বাঁধা, বাহুতে হাতীর দাঁত, হাতে পায়ে শরু শরু বেতের অলঙ্কার।

ধর্ম্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে নাগাদিগের জ্ঞান অন্ধকারময়। কোন কোন লোকের এরূপ বিশ্বাস যে যদি তাহারা এ জন্মে সৎকার্য্য করে এবং কোন প্রকার অখাদ্য না খায় তাহা হইলে পরকালে তাহাদের আত্মারা আকাশে নক্ষত্র হইবে, কিন্তু এজন্মে ইহার বিপরীত আচরণ করিলে সাত জন্মের পর মৌমাছি হইবে। অনেকে আবার পরকাল যে কি তাই জানে না, এ সম্বন্ধে কখন চিন্তাও করে না, মৃত্যুর পর শরীর

মাটির তলে পচিয়া যায় কেবল এই মাত্র জানে। শারীরিক অমঙ্গলের ভয় ইহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল, এবং এই ভয় হইতে নানা প্রকার উপদেবতার পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে। নাগারা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, মেঘগর্জ্জন এবং ভূমি কম্প প্রভৃতিকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করে। নদ, নদী, পর্ব্বতের গুহা, গভীর বন ইত্যাদিতে ভূত প্রেত বাস করে বলিয়া বিশ্বাস করে। নিত্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কায আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শুভাশুভ ফল জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, যুদ্ধে যাইতেছে এমন সময় সম্মুখ দিয়া যদি একটি হরিণ চলিয়া যায় তাহা হইলে ফিরিয়া আইসে, ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন; সম্মুখে বাঘ ডাকা, মঙ্গলের, আর পশ্চাতে অমঙ্গলের চিহ্ন। এই রূপ কত প্রকার কুসংস্কার আছে তা আর কি বলিব।

নাগাদের অনেক দোষ আছে; ইহারা চুরি করে, লুঠ পাট করে, অতি সামান্য কারণে কাটা কাটি করে, ইহারা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ কিন্তু এ সকল দোষ সত্বেও ইহারা সত্য পালনে রত। ইহাদের মধ্যে সপথ করিবার অনেক প্রকার আশ্চর্য্য প্রণালী আছে, তাহার মধ্যে একটি এই; দুই কি তিন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহারা হয় একটি কুকুর কিম্বা একটি মুরগী ধরিয়া ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি এই সত্য পালন না করিবে তাহার দশাও এই হইবে। আর এক প্রণালী এই, এক ব্যক্তিকে কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইলে সে হয় বন্দুক কিম্বা বল্লম, না হয় বাঘের দাঁত স্পর্শ করিয়া শপথ করে যে, যদি সে সত্য পালন না করে তাহা হইলে এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যেন তাহার পতন হয়, এইরূপ আরও কত প্রকার আছে।

বসন্ত।

আবার বরষপরে এসেছে বসন্ত অই
শীতের প্রভাবে যারা
ভেবে ভেবে হ'য়ে সারা
বিষাদে মলিন ছিল; শীর্ণ ছিল কলেবর;
জেগেছে আবার তারা দুখের হয়েছে ভোর।

২

পাতাশূন্য ফুলশূন্য শাখা মাত্র করি সার
কতই আকুল প্রাণে
বসন্তের পথ পানে
চেয়েছিল বৃক্ষগুলি; পাখীরা গেছিল চ'লে
ব্যথিত অন্তরে লতা লুটেছিল ধরাতলে।

৩

এসেছে বসন্ত পুনঃ জেগেছে সকলে তারা;
পাখীরা এসেছে সবে
গাইতে মধুর রবে;
মলয় বহিছে লয়ে আনন্দের সমাচার
স্বরগ পৃথিবী এবে হইয়াছে একাকার।

৪

চাঁদের ধরে না হাসি থাকিয়া আকাশ গায়
ছোট ছোট তারাগুলি
তারাও নয়ন খুলি
মিটি মিটি মৃদু হাসে আনন্দে পরাণ ভরি
সুনীল অম্বরে যেন উজল মুকুতা সারি।

৫

মনে হয় এই হাসি পাখীর আনন্দ গান
কোন দিন না ফুরাবে,
এমনি কাটিয়া যাবে,
সারাটী বরষ রবে আনন্দের কোলাহল
আসিবে না গ্রীষ্মতাপ বরষার ঘোর জল।

৬

কিন্তু হায়! সমভাবে নাহি যায় চিরকাল;
গ্রীষ্ম বর্ষা পূর্ব্বভাবে
আসিবে আবার যাবে;
পুনরায় সেই শীত; ফুরাবে পাখীর গান;
শুকায়ে পড়িবে পাতা লতা পুন হবে ম্লান।

বীরত্ব।

এ পর্য্যন্ত সখার অনেকগুলি বড় বড় লোকের এবং মহিলাদিগের জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মুখের উপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের দৃষ্টান্তে অনেক ফল হয়, এই জন্য জীবন চরিতের এত আদর। সখার পাঠক পাঠিকারা, বড় বড় লোকের এবং মহিলাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন, যাহাতে এই সকল মহৎজীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের হৃদয়ে মহৎ ইচ্ছা সকল অঙ্কুরিত হয়, সংকার্য্য করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং নিজ নিজ জীবন সৎপথে রাখিবার সংকল্প উদিত হয়, সেই জন্যই এই সকল জীবন-চরিত সখায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। হয়ত এই সকল মহৎজীবনের ঘটনাগুলি পড়িয়া আমাদিগের অনেক পাঠক পাঠিকার মনে অনেক সৎ ইচ্ছা উদিত হয়, সৎ এবং মহৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু অনেকে হয়ত নিজের অবস্থার উপর দোষ চাপাইয়া বসিয়া থাকেন, বলেন এত বড় মহৎ কার্য্য কি আমাদের মত অবস্থার লোকের দ্বারা কখনও হইতে পারে? কেহ বা নিজ অদৃষ্টকে দোষী করেন, বলেন এত বড় বড় কাজ করা কি আমাদের অদৃষ্টে সম্ভব। যাঁহারা এই প্রকার বলেন, তাঁহারা যদি প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সৎকাজ হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা সে কথা বলিতেছি না। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের এই প্রকার সৎকাজ করিবার ইচ্ছা খুব অধিক, মহৎ কার্য্যের জন্য যাহারা বড় ব্যগ্র, বড় বড় কাজ করিয়া বীর বলিয়া পরিচিত হইবার যাঁহাদিগের বাসনা বড় প্রবল, তাঁহাদিগকে আজ আমরা বড় লোক হইবার একটা সহজ পথ দেখাইয়া দিব। এ পথে চলা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না, অথচ যিনি চলিতে পারিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই লোকে বীর বলিয়া প্রশংসা করিবে।

এই বীরত্বের জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না, দেশ বিদেশে যাইতে হইবে না। নিজ নিজ

গৃহ, নিজ নিজ পরিবার এবং নিজের প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যেই এই বীরত্ব দেখাইবার স্থান। আমরা ক্রমে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যে এই বীরত্ব প্রথমে ছোট খাট কার্য্যে দেখাইতে পারে, সেই পরে বড় বড় কার্য্যে বীরত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে বীর নয়, সে কখনও একটা মহৎ কার্য্য করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

একটি পুরাতন গল্প বলি। বালক থিয়োডোর পার্কার যখন কৃষিক্ষেত্র হইতে কাজ করিয়া বাড়িতে ফিরিতেছিলেন, তখন পথের ধারে জলাশয়ে একটি কচ্ছপ দেখিয়া তাহাকে মারিবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র লাঠি উঠাইলেন, কিন্তু মারিতে উদ্যত হইয়াই তাঁহার মনে হইল যে, এ অন্যায় কাজ করা হইতেছে—পার্কার অমনি বিরত হইলেন; এই খানে পার্কারের বীরত্ব। কচ্ছপটাকে মারিয়া পার্কার একটু নিষ্ঠুর আমোদ পাইতেন বটে, কিন্তু তেমনি একটি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করা হইত। পার্কার অন্যায় কার্য্য করিয়া এই নিষ্ঠুর আমোদ পাইতে ইচ্ছা করিলেন না। বালকেরা কুকুর বিড়াল পাখী প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে যন্ত্রণা দিয়া এক প্রকার আমোদ অনুভব করে। পার্কার যখনই বুঝিলেন, অন্যকে কষ্ট দিয়া আমোদ অনুভব করা অতি গর্হিত কার্য্য, তখনই তাহা হইতে বিরত হইলেন; এই বীরত্ব। বালক পার্কার অন্যকে যন্ত্রণা দিয়া নিজে সুখ অনুভব করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাই পরে তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে, পার্কার অসহায় দাসদিগের বন্ধু হইয়া, তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা কর্ত্তব্য বুঝিবে তাহা যে করিতে পারে সেই বীর। অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পম্পীয়াই নগর বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন এক জন সামান্য সৈনিক কি বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেই জান। এই সৈনিক পাহারা দিতেছিল, এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাৎ আরম্ভ হইল, সকলেই প্রাণ ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু এই সৈনিক তাহার স্থান হইতে একপদও সরিল না,—সে জানিত প্রাণ গেলেও তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে। ক্রমে সমস্ত নগর সেই অগ্নি ও ভস্মে ডুবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সৈনিকও অগ্নি ও ভস্মস্তূপের মধ্যে প্রাণ হারাইল! এই খানে বীরত্ব। সেই সৈনিক জানিত যে তখন সে যদি পলায়ন করে তাহা হইলে কেহই তাহাকে বাধা দিবে না, এবং কেহ কিছু বলিবেও না বা শাস্তি দিবে না। কিন্তু তথাপিও সে তাহার স্থান পরিত্যাগ করিল না। কেহ কিছু বলুক আর না বলুক, সে তাহার কর্ত্তব্য হইতে কেন ভ্রষ্ট হইবে? সেই সৈনিক নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া জীবন হারাইয়াছে, কিন্তু আঠার শত বৎসর পরেও আজ আমরা তাহার যশ কীর্ত্তন করিতেছি।

এ সকল দৃষ্টান্তও আমরা ছাড়িয়া দি। ছেলেবেলায় একখানি ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, দুইটি বালক একদিন বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিল; তাহারা দুই সহোদর। বেড়াইতে গিয়া তাহারা বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া যায় এবং ক্রমে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন আর উপায় না দেখিয়া বনেই রাত্রি কাটাইবে স্থির করে। ছোট ভাইটি, "দাদা বড় শীত করিতেছে" বলিয়া যখন কাঁদিতে লাগিল, তখন বড় ভাই তাহার

নিজের গায়ের কাপড় খুলিয়া ছোট ভাইটির গায়ে দিয়া দিল, ছোট ভাইটী তবুও আবার যখন "বড় শীত করিতেছে" বলিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন বড় ভাই আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ছোট ভাইটীর গায়ের উপর শুইয়া রহিল, তাহাতে কতক শীত নিবারণ হইল। সে শীতপ্রধান দেশ, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া থাকে; প্রাতঃকালে সকলে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে আসিয়া দেখিল উভয়েই মৃত! এই খানে আবার বীরত্ব দেখ। ছোট ভাইটীকে শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বড় ভাই নিজের বস্ত্র খুলিয়া দিল, সেই দারুণ শীত এবং নিজে অকাতরে সহ্য করিতে লাগিল। সে জানিত ইহাতে তাহার প্রাণ যাইবে; কিন্তু ছোট ভাইটীর যাহাতে কষ্ট না হয়, সে যাহাতে বাঁচে এই তাহার চিন্তা; সে নিজের জীবনের দিকে চাহিল না। এইই বীরত্ব। বিপদে পড়িলে কি তোমরা ছোট ভাই বোনের জন্য এতদূর করিতে পার? যদি তাহা না পার, তবে তোমরা কোন কালে বীর হইতে পারিবে না। নিজের ছোট ভাই বোনের জন্য যদি নিজের প্রাণ না দিতে পার, তবে বড় বড় কাজের আশা তোমরা কেমন করিয়া করিবে? আগে ভাই বোনের জন্য নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে শিখিবে, তবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারিবে!

গত বৎসরের সখায় তোমরা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনী পড়িয়াছ, তাহাতে তোমরা তাঁহার অসামান্য সাধুতা দেখিয়াছ। তোমরা জান তাঁহার পিতার অনেক ঋণ ছিল; মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সে ঋণ পরিশোধ না করিলে আইনতঃ তিনি একটুও দায়ী হইতেন না। কিন্তু তিনি আইনের পরামর্শ শুনিলেন না, লোকের বা আত্মীয় স্বজনদিগের পরামর্শও শুনিলেন না। যাঁহারা টাকা পাইবেন তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত জমিদারীর একটা তালিকা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দিলেন। তিনি জানিতেন ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে, এই সমস্ত জমিদারীই বিক্রয় হইয়া যাইবে, তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা টাকা পাইবেন তাঁহাদিগকে প্রতারণা করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যুও তিনি শ্রেয় মনে করিলেন। উত্তমর্ণেরা তাঁহার এই অসাধারণ সাধু ব্যবহারে অবাক্ হইয়া গেল, দেশের লোক চমৎকৃত হইল! এই খানে বীরত্ব। মহর্ষি ইচ্ছা করিলেই এই অগাধ ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিতেন। পথের ভিখারী হইতে হইলেও সাধুতা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তোমরা কি তোমাদের প্রতিদিনের কার্য্যে একথাটী মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাক? অন্যকে ঠকাইয়া একটী সামান্য জিনিষ লইতে পারিলেও আমরা তাহা ছাড়ি না। যদি বীর হইতে চাও তবে ইহা মনে রাখিও যে, পথের ভিখারী হইতে হইলেও সাধুতা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, অন্যকে প্রতারণা করা উচিত নয়। একটী অন্যায় কাজ করিয়া তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা বলিও না। হয়ত মনে হইবে একটী সামান্য "না" বলিলে আর কি হইবে। কিন্তু এই একটী "না" সর্ব্বনাশের মূল। ইহা নিতান্তই কাপুরুষতার লক্ষণ। অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহার জন্য যদি শাস্তি পাইতে হয়, অপদস্থ হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবুও গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না। যে শাস্তি পাইবার বা অপদস্থ হইবার ভয়েও মিথ্যা কথা না বলে, সেই বীর। কত ছোট খাট বিষয়ে তোমরা বীরত্ব দেখাইতে পার, আবার কত ছোট খাট বিষয়েই আমার কাপুরুষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আমরা দেখিয়াছি একটা বালকের হাতে যদি চারিটী কমলা লেবু দেওয়া যায়, আর বলা যায় যে তোমরা চার ভাই বোনে ভাগ করিয়া লও। তাহা হইলে যেটী সকলের অপেক্ষা বড়, বালকটী নিজের জন্য সেইটী রাখিয়া, আর তিনটী তিন জনকে দিবে। ইহাই কাপুরুষত্ব। এই সামান্য বিষয়েই কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়, আবার ইহাতেই বীরত্ব দেখাইতে পার। সকলের অপেক্ষা ছোট যেটী সেইটী তুমি নিজের জন্য রাখিয়া, বড় তিনটী ভাই বোনদের যদি দিতে পার, তবেই তুমি বীর। বীরত্বের শিক্ষা ছেলেবেলায় এই ছোট খাট বিষয় লইয়াই হয়। যে ছেলেবেলা হইতে এইটুকু না পারে, এই স্বার্থটুকু ছাড়িতে না পারে, সে বড় হইয়া কখনও মহৎ কাজ করিতে পারিবে না। মা খাবার দিয়াছেন, হয়ত আমার বোনকে কি ভাইকে, আমার অপেক্ষা একটু বেশী দিয়াছেন বা তাহাদিগকে আমার চেয়ে বড় সন্দেশটা দিয়াছেন; দেখিয়াই আমার মনে একটু হিংসা হইল—আমাকে কেন বড়টী দেওয়া হইল না। হয়ত আমি মুখে কিছুই বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে আমার বড়ই হিংসা রহিয়া গেল। ইহা ভয়ানক নীচতা এবং ভয়ানক ক্ষুদ্রতা। আমরা এই সকল অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিতেছি; পাঠক পাঠিকারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই প্রকার সামান্য বিষয়েও আমাদের মধ্যে কত ক্ষুদ্রতা আছে। বড় বড় বিষয়ের ত কথাই নাই। যে বালক এবং যে বালিকা এই নীচতা ও ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে,—সেই বীর। আমরা তাহাকেই বীর বলিব। লোক জানাইয়া দশটা ভাল কাজ করিলেই কেবল বড় লোক হওয়া যায় না। এই সকল সামান্য বিষয়েও যে বড় সেই বড়। বীরত্ব, দেখইবার আরও কত সুযোগ, কত স্থান আছে। যে রোগ যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বীরত্ব দেখাও, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহার ক্লেশ যন্ত্রণা দূর কর,—তাহা অপেক্ষা বীরত্ব আর নাই। যে দুঃখী কাঙ্গাল, যাহার দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিল না, তাহাকে সান্ত্বনা দেও—তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন কর, তাহাকে স্নেহ ভালবাসা দেও, তোমাকে জগতের লোকে বীর বলিবে। যে অনাথ, দিনান্তে যাহার অন্ন জুটে না—দিনান্তেও যে মুষ্টি ভিক্ষা পায় না, অঙ্গে যাহার ছিন্ন বস্ত্রও নাই, তাহাকে অন্নবস্ত্র দেও, মস্তক রাখিবার স্থান দেও, আমরা তোমাকে বীর বলিব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিও, আমরা তোমাকে বীর বলিব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে সকলে কঠিন কথাই বলিয়া থাকে; কিন্তু যে সেই কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা বলিতে পারে, সেই বীর! সকলে তাহা পারে না, এবং সকলে যাহা না পারে তাহাই বীরত্ব। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথা, কঠিন নির্দ্দয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কোমল ও সদয় ব্যবহার বীরত্ব কিনা, তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিও, দেখিবে তাহাতে কতটা হৃদয়ের বীরত্ব দরকার। যে পর বলিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে তুমি আপন বলিয়া তাহার উপকার করিতে যত্নবান হইবে, তোমাকে সংসারের লোকে বীর বলিবে। যে শত্রুতা করিবে তাহাকে ভাইয়ের মত দেখিবে, তোমাকে জগতের লোকে বীর বলিবে। এ বীরত্বের পথ সহজ অথচ কঠিন। হৃদয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে এবীরত্ব বড়ই সহজ—আর ইহাও নিশ্চয় জানিও লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ করিয়া একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করা অপেক্ষা এই বীরত্বের মূল্য অধিক।

ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। তবে পাঠক পাঠিকা তোমরা কি ইহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে না ?

(প্রাপ্ত।)

বালকের রচনা।

ক্রোধ।

(সত্য ঘটনা।)

যশোহর জেলায় হরিহরপুর গ্রামে, রামচন্দ্র গুপ্ত নামক ১১।১২ বৎসরের একটি বালক ছিল। তাহাকে যে সেই রাগাইতে পারিত, সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, সকলেই সশঙ্ক থাকিত। রামচন্দ্র হাঁড়ী, কলসী, ঘটী, বাটী ইত্যাদি যে কত ভাঙ্গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। রাগ হইলে তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না। তাহার কতদিন উপবাসে গিয়াছে !

একদিন তাহার মাতা কতকগুলি সোনার গহনা জহুরির বাটী হইতে আনিতে বলেন, সে তাহা আনিতেছে। পথে তাহার পায়ে এমন একটি আঘাত লাগিল যে, রক্তপাত হইল। রামচন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং "এই পোড়া গহনার জ্বালায় মরিলাম" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত গহনা নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। রামচন্দ্র রাগিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। কাহার সাধ্য যে, সাহস করিয়া তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। শেষে রামচন্দ্রের রাগ থামিলে সে নিজে গিয়া সেই পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া গহনা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সকল না পাইয়া, শেষে মাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল যে "কেন তুমি আমাকে গহনা আনিতে পাঠাইলে ?"

আর একদিন কোন কর্ম্মের নিমিত্ত এক ঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় চৌকাঠে তাহার মাথা লাগিল, কিছু না বলিয়া কর্ম্ম করিয়া বাহিরে আসিতেছে আবার পূর্ব্ববৎ চৌকাঠ মাথায় লাগিল, এবার আর সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার রাগ চৌকাঠের উপর না পড়িয়া মাথার উপর পড়িল; তখন সেই চৌকাঠে মাথা খুঁড়িতে লাগিল এবং "কত লাগিবে লাগ, কত লাগিবে লাগ" বলিয়া মস্তককে তিরস্কার করিতে লাগিল। কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি হইতে লাগিল তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। এই রকম রাগ করিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলা যায় না।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। মরণ।

নূতন।

সর্ব্ব জীবে বাস করি সবে মোরে চায়,
আকাশে পর্ব্বতে থাকি; না থাকি কোথায় ?
এক মোর নাম কিন্তু দুই ভাবে থাকি,
মাথা কাটি, জন্তুগণে ক্রোড়ে আমি রাখি।
মাঝ খান রেখে চড়ি ঘোড়ার উপরে,
সুবুদ্ধি বালক যেই সেই জানে মোরে।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা।
এপ্রিল, ১৮৮৮।

নববর্ষ।

১

আসিয়াছে নববর্ষ
পুরাতন গেছে চলে।
শোভিছে প্রকৃতি দেবী
নব নব ফুল ফলে।

২

পাখীরা গাইছে গান
কেমন মধুর স্বরে
লইয়ে সুগন্ধি কত
মলয় বহিছে ধীরে।

৩

দেখিয়ে জুড়ায় আঁখি
কিবা শোভা চমৎকার !
কে যেন সাজায়ে ডালা
দিতেছেন উপহার!

৪

কেন পূরিয়াছে ধরা
আনন্দের কোলাহলে ?
কেন এত হাসি-ভরা ?
পুরাতন গেছে বলে ?

৫

কেবলি কি পুরাতন
পরিপূর্ণ শোক দুখে ?
নূতন বরষ এলে
সকলি কি ভাসে সুখে ?

৬

অতীত বরষে তবে
কিছুই শিখিতে নাই ?
নূতন এসেছে বলে
এত কি আনন্দ তাই ?

৭

সুখের এ নববর্ষ
চির নব নাহি রয়
কালের প্রবাহে শীঘ্র
হয় পুরাতন-ময়।

৮

আগমনে এবে যথা
মহা আনন্দিত সবে।
তেমনি বরষ পরে
আনন্দে বিদায় দিবে।

৯

নূতনে কি পুরাতনে
কিছুই প্রভেদ নাই
সুখ, দুঃখ, শিক্ষা, জ্ঞান
রয়েছে দোঁহার ঠাঁই।

(১০)

লভিয়াছি কত স্নেহ
ভালবাসা পুরাতনে ;
স্মৃতির আলোকে তাহা
উজলিত রবে প্রাণে।

(১১)

দুঃখের অনলে পুড়ি
লভিয়াছি যে জ্ঞান
নূতন বরষে কত
সুফল করিবে দান।

(১২)

যেই দোষে যেই পাপে
কলঙ্কিত ছিল প্রাণ ;
নূতনে না করি যেন
সাবধান! সাবধান!

(১৩)

শিক্ষা দেয় পুরাতনে
কর তারে নমস্কার।
সম্মুখে নূতনে চাহি
হও সবে আগুসার।

(১৪)

আশা কর আনন্দেতে
নূতন এসেছে ব'লে।
মনে রেখো পুরাতনে
যদিও সে গেছে চলে।

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্।

অর্ণবপোত-সমাকীর্ণ টেমস্ নদীর তীরে বিস্তীর্ণ পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ। এই মহাসভা গৃহে ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতি নীতি সকল আলোচিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, শাসনতন্ত্র-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইতেছে, এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি স্থিরীকৃত হইতেছে। ইংলণ্ড এবং ইংরাজাধিকৃত দেশ সমূহের অদৃষ্টলিপি এই মহাসভায় প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ;—ইংরাজাধিকৃত দেশ সমূহের অদৃষ্টচক্র এই মহাসভা দ্বারা প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে। টেমসের অপর পারে, এই মহাসভার সম্মুখস্থ আর একটী গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত কর। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বিস্তীর্ণ অট্টালিকা অপেক্ষা আয়তনে এই গৃহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তাহার সন্দেহ নাই; এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভাগৃহে দেশ শাসন-প্রণালী এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মহা আন্দোলন হইয়া থাকে, এখানে তাহা হয় না বটে ; কিন্তু মনে হয় যেন এই সকল গুরুতর বিষয় অপেক্ষাও একটী অতি মহত্তর বিষয়ের সাধনা এই গৃহে হইতেছে! পার্লিয়ামেণ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, যুদ্ধে শত লোক প্রাণ হারাইতেছে—সহস্র লোক আহত হইতেছে; নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমে এই সকল আহত নিরাশ্রয় সৈনিকদিগের সেবার জন্য, স্নেহশীলা কোমলহৃদয় পরোপকারব্রতা মহিলাগণ শিক্ষিতা হইতেছেন। পার্লিয়ামেণ্ট যে শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমের

পরোপকারপরায়ণা মহিলাগণের কোমল স্নেহপূর্ণ করস্পর্শে সে শোণিত স্রোত রুদ্ধ হইতেছে। আহত, ক্ষত যন্ত্রণা ভুলিতেছে, রোগী, রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেছে ; সংসারে আপনার বলিবার যাহাদের কেহ নাই, তাহারাও মাতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালবাসা সেবা ও যত্ন প্রাপ্ত হইতেছে। সংসারে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কি আছে, আমরা জানি না। এ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অনেক অধিক ; এই দুঃখভার দূর করিবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই ধন্য। অন্যের দুঃখ ক্লেশে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয়, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য যাঁহাদিগের হস্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত, অসহায় নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা যাঁহাদিগের প্রকৃতি, রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দান, যাঁহাদিগের জীবনের ব্রত, এজগতে তাঁহারাই দেবতা। কলনাদিনী টেমসের এক তীরে বিস্তীর্ণ পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ, অপর তীরে সেণ্ট-টমাস হাঁসপাতাল। সেণ্ট-টমাস হাঁসপাতালের বিস্তীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে "নাইটীঙ্গেল্ আশ্রম" স্থাপিত। নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে চল—এক

দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। উপরে যাঁহার চিত্র দেওয়া গিয়াছে, এই দেবী-মূর্ত্তি তাঁহারই। যে মহৎ কার্য্যে ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, ইংরাজ জাতি এই “নাইটীঙ্গেল্ আশ্রম” স্থাপিত করিয়াছেন। যে পরদুঃখক্লিষ্টা মহিলাগণ আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতেছেন; এই নাইটীঙ্গেল্ আশ্রমে তাঁহাদের শিক্ষা হইতেছে। কিরূপে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, এই স্থানে প্রতিদিন তাঁহারা সে শিক্ষা পাইতেছেন;—আশা একদিন তাঁহারাও এক একটী “নাইটীঙ্গেল্” হইবেন।

ইটালী দেশে ফ্লোরেন্স্ নগরে ১৮২০ সালে নাইটীঙ্গেলের জন্ম হয়। ফ্লোরেন্স্ নগরে জন্মহয় বলিয়া ইহাঁর নাম ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল রাখা হয়। ইহাঁর পিতার নাম উইলিয়ম সোর নাইটীঙ্গেল্। ইনি একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ডার্ব্বিসায়ারের মধ্যে লি হার্ষ্ট নামক স্থানে ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের বাল্য জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। লি হার্ষ্ট প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। বালিকা নাইটীঙ্গেল্ এই রমণীয় উদ্যানের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; এবং যে মহৎকার্য্যে পরে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই খানেই তাহার প্রথম বিকাশ হইতে লাগিল। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই এই বালিকার এক দারুণ তৃষ্ণা ছিল। পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা ইহাঁর প্রকৃতিতে এত প্রবল ছিল যে, সেই বাল্য বয়সেই সকলে তাহা লক্ষ্য করিত। যাহার অভাব আছে, কি প্রকারে তাহার অভাব দূর হইবে, যে দুঃখী, কি প্রকারে তাহার দুঃখ মোচন হইবে, যে আশ্রয়শূন্য, কি প্রকারে সে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে, সেই বাল্যবয়সেই বালিকাকে এই সকল চিন্তায় আকুল দেখা যাইত। পশু পক্ষী প্রভৃতির উপরেও এই বালিকার অসাধারণ স্নেহ ছিল। এবং যে সকল পক্ষী মানুষের পদশব্দ শুনিবামাত্র উড়িয়া পলায়ন করে, বালিকা নাইটীঙ্গেলের কাছে আসিয়া তাহারা নির্ভয়ে আহার লইয়া যাইত।

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ বাল্যকালে অশ্বারোহণ করিতে ভাল বাসিতেন। একজন ধর্ম্মযাজকের সহিত নাইটীঙ্গেলের পিতার বন্ধুত্ব ছিল, ইনি সৎলোক ছিলেন এবং অনাথ দরিদ্রদিগের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা ও যত্ন করিতেন। বালিকা মধ্যে মধ্যে ইহাঁর সহিত অশ্বারোহণে বাহির হইত। ধর্ম্মযাজক চিকিৎসা শাস্ত্রও কিছু কিছু জানিতেন; অসহায় দরিদ্রদিগকে অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করা ব্যতীত রোগের সময় তাহাদিগকে চিকিৎসাও করিতেন। রোগীর শুশ্রূষা কি প্রকারে করিতে হয়, বালিকার সে শিক্ষা এইখানেই আরম্ভ হয়। নাইটীঙ্গেল্ এই পরদুঃখকাতর বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের সহিত, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া, প্রভূত আনন্দ ও সুখ অনুভব করিতেন। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের যে দারুণ তৃষ্ণা, ইহাতে তাহার কতক তৃপ্তি হইত। বালিকা এই ধর্ম্মযাজকের সহিত যখনই দরিদ্রদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য বাহির হইতেন, তখনই একটী ঝুড়ীতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, দরিদ্রদিগকে বিলাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। এই সকল খাদ্য দ্রব্য অধিকাংশই তিনি নিজের খাবার হইতে রাখিয়া দিতেন।

পশুদিগের প্রতিও তাঁহার কি প্রকার দয়া ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। রজার নামক একজন মেষপালকের ক্যাপ্ নামে একটী কুকুর

ছিল; কুকুরটী বড় ভাল, রজারের মেষপাল রক্ষা বিষয়ে অনেক সাহায্য করিত। একদিন একটী দুষ্ট বালক, ইট নিক্ষেপ করিয়া ক্যাপের একখানি পা ভাঙ্গিয়া দেয়। রজার দেখিল ক্যাপের দ্বারা কোন কার্য্যই আর হইবে না; তখন সে তাহাকে মারিয়া ফেলাই শ্রেয় মনে করিল। কিন্তু একথা বালিকা নাইটীঙ্গেল্ জানিতে পারিয়া সেই বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের সহিত রজারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মযাজক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, পা ভগ্ন হয় নাই, কেবল মাত্র আঘাৎ লাগিয়াছে, শীঘ্রই আরাম হইবে। বালিকা নাইটীঙ্গেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিলে ক্যাপ শীঘ্র এ কষ্ট যন্ত্রনা হইতে মুক্তি পায়? ধর্ম্মযাজক বলিলেন, গরম জলের সেক্ দিলে শীঘ্র আরাম হইবার সম্ভাবনা। বালিকা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ আর এক গৃহস্থের গৃহ হইতে একটী ফ্লানেলের পুরাতন জামা আনিয়া, জল গরম করিয়া তাহাদ্বারা ক্যাপের ক্ষতপদে সেক্ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাপ্ অল্প কাল মধ্যেই যন্ত্রণার উপশম বোধ করিল এবং নানাপ্রকারে বালিকা নাইটীঙ্গেল্‌কে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে নাইটীঙ্গেল্ প্রথমেই রজারের গৃহে গেলেন; যাইবার সময় দুইটী ফ্লানেলের জামা লইয়া গেলেন, পূর্ব্বদিন সেক্ দিবার জন্য যাহার জামা লইয়াছিলেন, তাহাকে ঐ দুইটী জামা দিলেন; এবং ক্যাপ অনেক আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া কত সুখী হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাইটীঙ্গেলের পিতা একজন প্রভূত সম্পতিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ যখন বালিকা, তখন বিলাতেও স্ত্রীজাতীর উচ্চশিক্ষা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু উইলিয়ম সোর নাইটীঙ্গেল্, দেশের লোক অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর ছিলেন। ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল পিতার যত্নে, গণিত, লাটীন, গ্রীক প্রভৃতি পুরাতন ভাষা, ইতিহাস, এবং আধুনিক ভাষা সকল বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি গর্ব্বিতা বা অহঙ্কৃতা হন নাই। রমণীহৃদয়ের কোমলগুণ গুলি তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া যায় নাই। বরং স্নেহ, দয়া, পরোপকারের প্রবৃত্তি তাঁহার বয়সের সহিত বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। নাইটীঙ্গেল্ অতি সুমধুর গান করিতে পারিতেন, এবং শিল্পকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

নাইটীঙ্গেল্ যত বড় হইতে লাগিলেন, সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার পিপাসা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাঁর মাতাও অতিশয় দয়ালু ছিলেন; অনাথ আতুরদিগের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য তিনিও যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দানে, দরিদ্রদিগের কুটীরে গিয়া তাহাদিগের অভাব মোচনে, অনাথ বালকবালিকা, রোগী এবং বৃদ্ধদিগের সেবা শুশ্রূষায়, তিনি তাঁহার মাতার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; কিন্তু ইহাতেও যেন তাঁহার দারুণ পিপাসার শান্তি হইত না। নাইটীঙ্গেলের সৎকার্য্যের প্রতি এই ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত, ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীর প্রতিও তাঁহার এক গভীর অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে, এই অনুরাগ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যত তিনি বয়সে বড় হইতে লাগিলেন, ততই যেন অনুভব করিতে লাগিলেন, যে অন্যের সাহায্য করা অন্যের দুঃখ-ক্লেশ মোচনের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই, তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সাধিত হইবে নাইটীঙ্গেল্ তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত সৎ

কার্য্য কি,তাহা তিনি বাল্য বয়সেই পিতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং চক্ষের সমক্ষে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া দিয়াছিলেন;—সেই আদর্শকে স্বীয় জীবনে কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার আশা ও উদ্দেশ্য।

এই সময়ে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে সময়ে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের হাঁসপাতাল সমূহে বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল না। নাইটীঙ্গেল্ দেখিলেন, রোগীদিগের সেবা কি প্রকারে করিতে হয়, ইহা ভাল না জানাতেই আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং নিজে এই কার্য্য রীতিমত শিক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। এবং ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের হাঁসপাতালগুলি এই জন্য একে একে পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে বয়সে মানুষ ভোগবিলাস ও সুখভোগে মত্ত হয়—যে বয়সে মানুষ আত্মসুখ লইয়া ব্যস্ত হয়. ফ্লোরেন্স্ নাইঙ্গেল্ সেই তরুণ বয়সেই এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবন উৎসর্গ করিকরিলেন। রোগীর সেবা, আহতের শুশ্রূষা, অনাথকে আশ্রয় দান, এবং দুঃখীর দুঃখমোচনে যে সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখ তিনি কখনও বুঝেন নাই—জানিতেন না। একে একে দেশীয় এবং বিদেশীয় হাঁসপাতালগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিয়া, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ অবশেষে ফ্রান্সের একটী আশ্রমে কিছুকাল শিক্ষা করিবার জন্য অবস্থান করেন; এই খানেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নাইটীঙ্গেল্ দেশে ফিরিলেন, তাঁহার কার্য্যও আরম্ভ হইল।

নাইটিঙ্গেল্ দেশে ফিরিয়া দেখিলেন, ভদ্রমহিলাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হার্লী ষ্ট্রীটে যে আবাস আছে, তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। প্রথমেই তিনি এই স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য স্বীয় শরীর মন অর্পণ করিলেন। দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এই স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইল। নাইটীঙ্গেল্ আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে দিবানিশি যে অসাধারণ পরিশ্রম করিলেন, অচিরে তাহার শুভফল উৎপন্ন হইল। এই স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থা যে কেবল দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল, তাহা নহে; কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব বিষয়েও আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য চিন্তা, ও এই দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নাইটীঙ্গেলের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন বিশ্রামের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল্ যখন হার্লী ষ্ট্রীটের স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন, তখন ইংলণ্ডে এবং সমস্ত ইউরোপে এক ভীষণ বিপ্লবের আয়োজন হইতেছিল। বিখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সমস্ত ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আটত্রিশ বৎসর পরে সেই নির্ব্বাপিত অশান্তির অগ্নি আবার ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। রুস্ ও তুরস্কের সহিত বিবাদ চলিতেছিল, অচিরে সেই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। ফরাসীসম্রাট লুই নেপোলিয়নের সহিত মিলিত হইয়া, ইংলণ্ড, তুরস্ককে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; ক্রিমিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রিমিয়া ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের বীরত্বের ক্ষেত্র,—স্কুটারীর হাঁসপাতাল তাঁহার গৌরবস্তম্ভ। আজ এত দিন পরে, এই দূরদেশে বসিয়াও, স্কুটারীর ভীষণদৃশ্যময় হাঁসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর শয্যা-

পার্শ্বে, দীপ হস্তে সেই দেবী মূর্ত্তি যেন দেখিতে পাইতেছি। এদিকে যুদ্ধ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করিতে লাগিল। জয় পরাজয়ে দুই পক্ষই ক্রমে হতবল হইতে লাগিলেন। ১৮৫৪ সালের ৫ই নবেম্বর ইংকারমানে শেষ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য নিতান্তই হতবল হইয়া পড়িল। দুর্দ্দশার এইখানেই অবসান হয় নাই। ইংরাজেরা এই ক্ষীণবল লইয়াই সিবাষ্টপুল অবরোধ করা স্থির করিলেন, কিন্তু তাহার জন্য যে আয়োজন আবশ্যক তাহার কিছুই হইল না। এই সময়ে ইংরাজ শিবিরে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। একদিকে খাদ্য দ্রব্য এবং পরিচ্ছদের অভাব, আর একদিকে ক্রিমিয়ার নীহার ও দারুণ শীত। রুষের অস্ত্রে ইংরাজের যে ক্ষতি হয় নাই, ক্রিমিয়ার দারুণ নীহার পাতে এবং ভীষণ শীতে, তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। দুর্দ্দশার ভার পূর্ণ করিবার জন্য ওলাউঠা প্রভৃতি দারুণ রোগ ইংরাজ শিবিরে প্রবেশ করিল। ইংরাজের দুর্দ্দশা ও কষ্টের আর সীমা রহিল না। স্কুটারীর হাঁসপাতালের অবস্থা দিন দিন ভীষণতর হইতে লাগিল। যুদ্ধে আহত অসংখ্য সৈনিকদিগের দ্বারা স্কুটারীর হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার নানাপ্রকার সাংঘাতিক রোগ প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

দুইখানি ছবি।

(৩৮ পৃষ্ঠার পর।)

আরও পাচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, একখানি সুন্দর ঘরে একটী যুবক প্রদীপের কাছে বসিয়া একখানা বই খুব মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। এই যুবক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হরিনাথ। তাহার মাতা ও ভগিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। যে কুটীরে হরিনাথের পিতার মৃত্যু হয় এ সে গৃহ নহে, হরিনাথ সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইস্থানে নূতন বাড়ী করিয়াছে। ঘরখানি অতি পরিষ্কার, কোথারও একটু ধুলা বা ময়লা নাই, বিছানা ইত্যাদি অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত, যেখানকার জিনিশ সেখানেই আছে; ঘরের বাসনগুলি সব পরিষ্কার, ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কতকক্ষণ পরে বই রাখিয়া হরিনাথ উঠিল। মাকে ডাকিয়া বলিল "মা আজ আমার একটুকু দরকার আছে, লালমোহন বাবু ডাকাইয়াছেন।" এই বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় হরিনাথ ফিরিয়া আসিল। আজ তাহার মন আনন্দে পূর্ণ, লালমোহন বাবু তাহার কার্য্যদক্ষতা, সততা ও পরিশ্রমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়াছেন। এই সুখের সংবাদ লইয়া যখন সে গৃহে আসিল, তখন তাহার মাতা ও ভগিনীর আনন্দ কে প্রকাশ করিবে? একমাত্র পুত্র ও ভ্রাতার এই নূতন উন্নতি দেখিয়া তাঁহারা সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

যখন গরিবের কুটীর এইরূপ আনন্দে মগ্ন, তখন দত্ত বাবুদের বাড়ীতে স্থূল স্থূল কাণ্ড উপস্থিত। শচীকান্তের মাতা একখানি পত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মন ঘোর উদ্বেগে পূর্ণ। চক্ষু মুখ আরক্ত ও স্ফীত; দেখিলেই বোধহয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খুব কাঁদিয়াছেন। পত্র খানি শচীকান্তের; সম্মুখে খোলা রহিয়াছে তাহাতে এইরূপ লেখা :—

শ্রীচরণেষু, নাগপুর,
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২—

মা, এই পত্র পাইয়াই আমাকে তারে তিন-হাজার টাকা অবশ্য পাঠাইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার ভয়ানক পীড়া হইয়াছিল, এখন ভাল হইয়াছি, কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল আছি। আমার হাতে এখন কিছুই টাকা নাই, অবশ্য অবশ্য টাকা পাঠাইবেন; ভুলিবেন না আমি বাড়ী যাইব। ইতি—

সেবক,
শ্রীশচীকান্ত দত্ত

একবার, দুইবার, তিনবার, শচীকান্তের মাতা পত্র খানি পড়িলেন। পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "এর মানে কি? একমাস হয় নাই, পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়াছি। দিবার সময় বলেছিলাম আর ছয় মাসের মধ্যে কিছু পাঠাবনা। আর আজ এই চিঠি! সে টাকা সব উড়াইয়াছে! আরও পাঠাইলে সেটাকাও উড়াইবে। আর না দিইবা কেমন করে? ভারি অসুখ করিয়াছিল লিখিয়াছে, কি করি? "এই সময়ে দরজা খুলিয়া গেল। অমলা শচীকান্তের স্ত্রীকে লইয়া সেই ঘরে আসিল, হাতে একখানা চিঠি। চিঠিখানা দেখাইয়া অমলা বলিল, "মা, দেখ শচী বউকে এই চিঠি লিখেছে।" "বউকে চিঠি লিখেছে? কি লিখেছে? কখন এল?" "এখনিই।" "চায় কি?" "টাকা" "কি, বয়ের কাছ থেকে? কত টাকা?" "আট হাজার।" "আট হাজার? কেন?"

শচীকান্ত তোমাকে সব কথা বল্‌তে বারণ করেছে। কিন্তু আর তোমার কাছে গোপন করবনা। আমরা অনেক দিন তার অনেক কথা গোপনে রেখেছি আর না। এপর্য্যন্ত তাকে আমার টাকা থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা দিয়েছি।" "কেন? দশ হাজার টাকা! এতদিন আমায় বল নাই কেন?" "ভাল করি নাই। তার অনুরোধে এতদিন বলি নাই।" "কামাখ্যা বাবু জানেন?" "না। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করেন এত টাকা দিয়ে কি কর? আমি তার কোন উত্তর দিই না" "বউকে কি লিখিছে পড়ত।"

"—আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি তুমি উদ্ধার না করিলে আর উপায় নাই। এখানে আমার অনেকগুলি টাকা ধার হইয়াছে, না দিতে পারিলে আমার আর রক্ষা নাই। তুমি এই পত্র পাইয়াই যেমন করিয়া হউক আট হাজার টাকার সংস্থান করিয়া পাঠাইবে। দিদি অনেকবার আমাকে টাকা দিয়াছেন, তুমি তাহার কাছে চাহিও। মাকে কখনও জানাইও না। দিদি যদি দিতে না পারেন তবে তোমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, বন্ধক দিয়া টাকা পাঠাইও। আমি এখানকার ধার শোধ করিয়া হায়দ্রাবাদ যাইব। সেখানে আমার এক প্রিয় বন্ধু—" "একি! আমাকে লিখিয়াছে যে তার বড় অসুখ করিয়াছিল এখন বাড়ীতে আসিবে, তাই তিন হাজার টাকা চায়। এর মানে কি?" "সব মিথ্যা কথা। মা, কি হবে এখন?" "কামাখ্যা বাবুকে আনিতে লোক

পাঠাও তিনি যা বলেন তাই হবে।" কামাখ্যা বাবু আসিয়া সব শুনিলেন। শচীকান্তের এতদুর অধোগতি হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহার মাতাকে আর টাকা পাঠাইবেন না এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। কামাখ্যা বাবুর কথা মত শচীকান্তের মাতা পত্র লিখিলেন। তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিলেন এবং অসৎকাজে ব্যয় করিতে আর টাকা পাঠাইবেন না লিখিলেন। ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে নাগপুর হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। প্রকাণ্ড ভবনে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, শচীকান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে। টাকা ব্যতীত সঙ্গীদের কাছে মুখ দেখাতে না পারিয়া গুলি করিয়া পাপ জীবন শেষ করিয়াছে।

পাঁচ লক্ষ টাকার অধিপতির পরিণাম এই! যে ধন মানুষকে এইরূপে অধোগমনের পথে লইয়া যায়, পাঠক, সেই টাকা পাইয়া তুমি আনন্দ করিবে কি শোক করিবে ভাবিয়া দেখ। অনেকে ধনহীন বলিয়া কত আক্ষেপ করেন কিন্তু ধন পাইয়া তাহার অহঙ্কারে আপাদ মস্তক পূর্ণ ও ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া মহাদম্ভে পৃথিবীতে বিচরণ করা এবং সৎপথ ত্যাগ ও অসৎপথ অবলম্বন করিয়া চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করা ইহাই যদি ধন লাভের পরিণাম হইল তবে সে ধনকে কি অস্পৃশ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাগ করিব না?

বিভিন্ন জাতির অভিবাদন প্রথা।

বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা কত প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা যে ভাব দেখাই, তাহাতে প্রকৃতই আমাদের মনের ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। এই মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি, আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এবং এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতিতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

গুরুজন এবং মান্য ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা প্রণাম ও নমস্কার করিয়া থাকি, সমবয়স্কদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ঈষৎ হাস্যের সহিত "ভাল ত?" "সংবাদ কি?" ইত্যাদি ছোট খাট দু একটী কথায় অভিবাদন করি; যাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা আছে—বন্ধুত্ব আছে, যাহাকে ভালবাসি; তাহার সহিত দেখা হইলে,হয়ত কোন কথাই বলি না;—একবার তাকাই বা একটু হাসি। এখানে আর অধিক কিছু আবশ্যক হয় না, একটু হাসিতে, একটু চাহনিতে, মনের ভাবটা সমস্তই প্রকাশ হয়। আমাদিগের প্রকৃতিতে বিনয়, নম্রতা এবং কোমলভাব অধিক, তাই আমাদের অভিবাদন প্রণালীও তদনুযায়ী।

এদেশের পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা সাক্ষাৎ হইলে, "রাম রাম" বলিয়া থাকে, এবং সেলাম করে; সেলামটা নমস্কারেরই প্রতিরূপ; কিন্তু একটু তফাৎ আছে। আমাদের প্রণাম ও নম-

স্কারে যতটা বিনয় ও নম্রতা আছে, ইহাতে যেন তাহা নাই; তাহার কারণ আমাদের অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের প্রকৃতিতে তেজ অধিক, আমাদের প্রকৃতি ভীরু, দুর্ব্বল ও কোমল। মুসলমানদিগের মধ্যে আদব কায়দাটা বড় বেশী, তাই প্রতিপদে তাহাদের সেলাম করা রীতি।

ইংরাজ জাতির প্রচলিত অভিবাদন প্রণালী হস্ত কম্পন। এই হস্ত কম্পনের ভাবেও কাহার কি প্রকার প্রকৃতি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এক এক জন এমনি জোরে হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া দেয়, যে সমস্ত শরীরে সে ঝাঁকনি অনুভব করিতে হয়; বুঝিবে ইহাদের প্রকৃতিতে উৎসাহ উদ্যম খুব অধিক। এক এক জন হাতখানি ধরিয়া একটু কম্পিত করিয়া পরিত্যাগ করে, ইহাদের সেই হস্তকম্পনে যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করা যায়; বুঝিবে ইহাদের মনে কোন ভাবই হয় না, যাহা করে কেবল ভদ্রতার দায়ে। যাহারা হাত খানা ধরিয়া একটু কম্পিত করিয়া, এবং হাতের পাতাটী একটু চাপিয়া পরিত্যাগ করে, বুঝিবে তাহাদের রীতি নীতি ও রুচি বিশেষ মার্জ্জিত। আর যাহারা হাত খানি লইয়া, হাতের পাতাটী জোরে চাপিয়া দেয়, বুঝিবে তাহাদের প্রকৃতিতে প্রীতি ও ভালবাসা খুব অধিক। সাধারণতঃ হস্তকম্পনে উৎসাহ, উদ্যম এবং প্রীতি ও সদ্ভাবের চিহ্ন প্রকাশ পায়। আমরাও আজ কাল হস্তকম্পন করিতে শিখিয়াছি কিন্তু সে আমাদের চিরকালের অনুকরণ-প্রিয়তার গুণে,—আমাদের প্রকৃতির সহিত ইহা মিলে না; হস্ত কম্পনে বিনয়, নম্রতার বড় অভাব।

হস্ত কম্পন ভিন্ন ইংরাজ জাতির আরও দুই একটি অভিবাদন প্রথা আছে। কাছাকাছি দেখা হইলেই হস্ত কম্পন সম্ভব হয়; কিন্তু যখন দূরে দূরে দেখা হয়, তখন মস্তকটী ইষৎ অবনত করা, বা হাতের ছড়ী ইষৎ উত্তোলিত করাই নিয়ম; কিন্তু যেখানে অধিক সম্মান দেখাইতে হইবে, সেখানে মাথার টুপি খোলা বিধি। এই টুপি খোলার ধরণেও ইহাদের প্রকৃতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ খুব আস্ফালনের সহিত টুপি খোলেন,—অর্থাৎ টুপিটী মাথা হইতে তুলিয়া খুব উৎসাহের সহিত হস্ত বিস্তার করেন; বুঝিবে ইহাঁদের উৎসাহ, উদ্যম খুব বেশী। কেহ কেহ টুপিটী ঈষৎ উত্তোলিত করেন, বুঝিবে ইহাঁদের প্রকৃতি স্থির, ধীর ও রুচি মার্জ্জিত। কেহ কেহ টুপিটী খুলিয়া উল্টাইয়া ধরে, বোধ হয় যেন ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ কেহ বা কেবল টুপিটী স্পর্শই করেন, ভয় পাছে টুপি খুলিতে কেশ বিন্যাশ নষ্ট হইয়া যায়।

ফরাসীদেশে যাও, সেখানে দেখিবে এই টুপি খোলাই সেখানকার সাধারণ অভিবাদনের রীতি। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদিগকে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি দেখাইতে হইবে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই টুপি খোলা নিয়ম; কিন্তু এ সাধারণ-তন্ত্র ফরাসীদেশে প্রেসিডেণ্ট হইতে সামান্য মুটে মজুরকে পর্য্যন্ত টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিতে হয়। স্পেন দেশের কৃষিদিগের মধ্যে এক বিচিত্র নিয়ম দেখা যায়। ইহারা সকল সময়েই এক খণ্ড রুটী সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। কাহারও সহিত দেখা হইলে, এই রুটী দিয়া অভিবাদন করা ইহাদের নিয়ম। যাহাকে এই রুটী দিয়া অভিবাদন করা হয়, সে অবশ্য রুটীখণ্ড লয় না, এবং যে রুটী দিয়া অভিবাদন করে, সেও জানে যে সে ব্যক্তি রুটী লইবে না। যদি কেহ এই রুটি লয় তবে আর ইহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। জর্ম্মণী এবং ইউরোপের আরও দুই এক স্থানে, পরিচয় থাক আর নাই

থাক, সাক্ষাৎ হইলে, কোন না কোন প্রকারে অভিবাদন করিতে হইবেএবং একটি কথা বলিতেই হইবে, নতুবা ইহারা সেটা নিতান্তই অভদ্রতা মনে করে। ফরাসী ও বেলজিয়ানদের মধ্যে আলিঙ্গনটা বড়ই প্রচলিত; পুত্রের সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইলে, বা বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেখা হইলে সর্ব্বত্রই ইহারা চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকে। মালয় এবং তন্নিনিকটবর্ত্তী দেশের লোকেরা দেখা হইলে, পরস্পরকে আঘ্রাণ করিয়া অভিবাদন করে। চীন দেশীয়দিগের অভিবাদন প্রণালী আট প্রকার। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে দেখা হইলে, হাত যোড় করিয়া, মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া, অভিবাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেখা হইলে "ভাত খাইয়াছ?" এবং তোমার পাকাশয়ের অবস্থা ভাল ত?" বলিয়া অভিবাদন করার রীতি আছে। জাপানীদিগের মধ্যে জানু অবনত করিয়া অভিবাদন, করাই সাধারণ রীতি কিন্তু সামান্য লোকের উচ্চ পদস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অন্য প্রকারে অভিবাদন করিবে। আফ্রিকার মূরদিগের মধ্যে অপরিচিত লোককে অভিবাদন করিবার প্রণালী যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর। একজন অপরিচিত লোক দেখিলে, ইহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া, বেগে তাহার দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিবে, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল আওয়াজ করিবে; এই অদ্ভুত অভিবাদন প্রথা যাহার কাছে নূতন, সে হয়ত ভয়ে সেস্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে; কিন্তু পরে জানিতে পারে, যে মূরদিগের ইহাই অভিবাদন প্রথা। আফ্রিকার স্বর্ণ-উপকূলের লোকেরা বামদিকের স্কন্ধের কাপড় ঈষৎ উত্তোলন করিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে অধিক সম্মান দেখান দরকার, সেখানে সমস্ত বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া দেখানই নিয়ম। ইজিপ্টের লোকেরা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, "ঘর্ম্ম কেমন হইতেছে" বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে।

টর্নেডো বা ঘূর্ণবায়ু।

মানুষের জ্ঞান দিন দিন বাড়িতেছে; বিজ্ঞান শাস্ত্রে মানুষ প্রতিদিন উন্নতিলাভ করিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া মানুষ আপনার কাজে লাগাইতেছে; প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা না একটা কারণ বাহির করিতেছে। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের ও গর্ব্বের আর সীমা নাই। মানুষের অহঙ্কার এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে মনে করিতেছে একদিন মৃতকেও বাঁচাইয়া তুলিবে। কিন্তু এক এক সময় প্রকৃতির এক একটী অদ্ভুৎ কাণ্ড দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে—মানুষের সকল গর্ব্ব—অহঙ্কার, চুর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃতির একটী সামান্য নিশ্বাসের প্রতিকূলে মানুষ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না;—প্রকৃতির সামান্য

একটী নিশ্বাসে যে প্রলয় উপস্থিত করে, মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অথচ এই সামান্য জ্ঞানের কত অহঙ্কার!

গত ৭ই এপ্রেল ঢাকা এবং তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে, যে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ? পলকে এমন প্রলয়ের কথা আমরা আর শুনি নাই,—হঠাৎ যেন বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। পুস্তকেই পড়িয়াছিলাম,

"When oft in whirl the mad tornado flies,
Mingling the ravaged landscape with the skies."

কিন্তু সত্য সত্যই যে উন্মত্ত ঘূর্ণ বায়ুতে পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকাশের সহিত মিশাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস হইত না। এবার ঢাকার যে ভীষণ-কাণ্ড হইয়াছে, তাহাতে যাহা অসম্ভব মনে করিতাম তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম; এখন আর অবিশ্বাস করিবার যো নাই।

এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি কি কারণে হইয়া থাকে, তাহা এখনও ঠিক বলিতে পারা যায় না; কারণ এদেশে ইহা নূতন। তবে ইউনাইটেড্ ষ্টেডের অনেকস্থানে মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণ বায়ু হইতে দেখা যায়, এবং সে দেশে যে কারণে হয়, বোধ হয় এদেশেও সেই কারণেই হইয়া থাকিবে। যাহা হউক ঘূর্ণ বায়ু সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ছোট খাট ঘূর্ণ বায়ু আমাদের পাঠক পাঠিকারা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। সময় সময় বায়ুকে ঘুরিতে ঘূরিতে ঊর্দ্ধদিকে বা সোজা ভাবে যাইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র বায়ু হইলে, আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু ইহার মধ্যে ধূলা এবং অন্যান্য হাল্কা জিনিষ থাকে বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই। আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে ইহা ভূতের কাণ্ড; যাহারা ইহার কারণ না জানে, তাহারা ইহাকে ভূতের কাণ্ড মনে করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে; হয়ত আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যেও অনেকে ইহাকে ভূতের কাণ্ড মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভূতের কাণ্ড নহে। প্রকৃতির সকল কার্য্যেরই যেমন একটা কারণ আছে—সকলই নিয়মে আবদ্ধ, ইহারও তেমনি একটা কারণ আছে। চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ও অস্ত; মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ—এ সকলেরই কারণ আছে, সকলই নিয়মের অধীন। ঐ যে ফুটন্ত ফুলটী সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, উহাও প্রকৃতির নিয়মের অধীন, এই যে ধীরে ধীরে বায়ু আসিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে, ইহাও প্রকৃতির আদেশে; আবার এই মৃদু সমীরণ নিমেষে ঝড় বা ঘূর্ণ বায়ুর আকার ধারণ করিয়া, যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত করিতেছে, তাহাও প্রকৃতির আদেশে।

যাহা হউক এই ছোট খাট ঘূর্ণ বায়ু—যাহা হয়ত গ্রীষ্মকালে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই,—এই ঘূর্ণ বায়ুরও যে কারণে উৎপন্ন হয়, সেদিন ঢাকার যে ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়াছিল, সে ভীষণ ঘূর্ণ বায়ুও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়াছিল।

এক খণ্ড সোলা যদি হাতে লইয়া, জলের মধ্যে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, যে তৎক্ষণাৎ সোলা খণ্ড জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে সোলা খণ্ড জল অপেক্ষা হাল্কা বা লঘু। একটা বাটীতে খানিকটা তেল লইয়া, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে, দেখা যায় যে তেলটা জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে; ইহারও কারণ—জল অপেক্ষা তেল লঘু। তবেই

বুঝা যাইতেছে যে, যে জিনিষ লঘু, তাহা তদপেক্ষা ভারি জিনিষের নীচে থাকিলেও, ক্রমাগত উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, এবং ভারি জিনিষ নীচে গিয়া সেই লঘু জিনিষের স্থান অধিকার করে। একথা যেমন জলের সম্বন্ধে খাটে, তেমনি ঠিক বায়ুর সম্বন্ধেও খাটে। জল আমরা চক্ষে দেখিতে পাই, তাই জলের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারি। বায়ু আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাই বায়ুর যে একটা ওজন আছে, বা একটী বায়ুস্তর হইতে যে আর একটী বায়ুস্তর ভারি বা হাল্কা হইতে পারে, তাহা তত সহজেই মনে হয় না। মৎস্য যেমন জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, আমরা তেমনি বায়ুরাশির মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। আমাদের শরীরের প্রত্যেক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে যে বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহার ওজন সাড়ে সাত সের। আমাদের মস্তকের উপর, এবং সমস্ত শরীরের উপর, কত মণ বায়ু চাপিয়া রহিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ! জিজ্ঞাসা করিতে পার, যদি এত মণ বায়ুই আমাদের মাথার উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তবে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না কেন? তাহার কারণ এই, —আমাদের শরীরে যে সকল বাষ্প এবং তরল-পদার্থ আছে, তাহা ক্রমাগতই বাহিরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের শরীরের ভিতরের এই শক্তি, এবং বায়ুর চাপের শক্তি সমান বলিয়া আমরা এত মণ বায়ুর চাপও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যদি এমন স্থানে যাও, যেস্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার শরীরের শীরা প্রভৃতি ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সেখানকার বায়ুর চাপ অপেক্ষা শরীরের ভিতরের বাষ্প ও তরল পদার্থগুলির বাহিরের দিকে উঠিবার শক্তি বেশী। কিন্তু পৃথিবী হইতে তিন চারি ক্রোশ উপরে না উঠিলে আর ইহা দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবীর কাছাকাছি যে বায়ুস্তর, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভারি; পৃথিবী হইতে যতই উপরে উঠা যায় বায়ু-রাশী ততই পাতলা হইয়া আসে। ইহার কারণ এই যে, বায়ুর পরমাণু গুলি ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাদিগকে আবার নিজ আকর্ষণী শক্তি দ্বারা কোলের দিকে টানিয়া রাখিতেছে; এই টানের প্রভাবে বায়ুর পরমাণু গুলিকে ঠেসাঠেসি করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী হইতে যতই উপরে উঠা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি ততই কম হইয়া আসে, এইজন্য বায়ুর পরমাণু গুলিও, ততই পৃথক হইয়া পড়ে এবং বায়ুরাশি ততই পাত্লা হইতে গিয়াছে। এ ছাড়া উপরের বায়ুরাশি চাপিতেছে বলিয়া নিচের বায়ুরাশি ঘন রহিয়াছে। পৃথিবী ছাড়িয়া আমরা যত উপরে উঠি, বায়ু ততই পাত্লা বোধ হয়; এবং অধিক উপরে উঠিলে, আমাদের নিশ্বাস লওয়া পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আরও একটী কথা; উত্তপ্ত হইলে বায়ু, জল প্রভৃতি তরল বস্তুর পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাতেও বায়ু পাত্লা হইয়া যায়; এবং তরল বস্তু যত শীতল হইতে থাকে, ততই আবার সেই সকল বিচ্ছিন্ন পরমাণু সকল ঘন-নিবিষ্ট হইয়া গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই গুরু ভারযুক্ত বায়ুরাশি ক্রমাগত নীচের দিকে আসিতেছে, এবং নীচের যে লঘু বায়ুস্তর, তাহা ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কথাটী মনে করিয়া রাখিতে হইবে। জলের গতিতে বাধা পড়িলে যে পাক পড়ে, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে? যখন প্রবল জল-

স্রোতে এই বাধা পড়ে, তখন ভয়ঙ্কর পাকের উৎপত্তি হয়, এবং এই আবর্ত্তে তখন বড় বড় নৌকাও নিমেষে ডুবিয়া যায়।

জল এবং বায়ুর একই অবস্থা; যেমন জলের তেম্‌নি বায়ুর গতিতেও বাধা পড়িলে, ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি হয়। এইরূপে যখন খুব প্রবল বায়ুতে বাধা পড়ে, তখন প্রবল ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি হয়। সূর্য্যের উত্তাপ বা অন্য কোন কারণে, যখন কোন স্থানে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেই স্থানের পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুস্তরের পরমাণু সকল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, পাত্‌লা হইতে থাকে এবং ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এবং উপরের ও চারিদিকের অধিকতর ঘন বায়ুরাশি, নীচের সেই শূন্য স্থান আসিয়া অধিকার করে। এই কারণেই ঝড় হইয়া থাকে। এই ঊর্দ্ধ ও অধোগামী বায়ুর গতির উপরেই ঝড়ের বেগ নির্ভর করে; বায়ুরাশির গতি যত দ্রুত হইবে, ঝড়েরও বেগ তত অধিক হইবে। উপরের ও চতুষ্পার্শ্বের বায়ুর সহিত, নীচের বায়ুর একটা খুব প্রভেদ না থাকিলে ঝড় অথবা ঘূর্ণ বায়ু হইতেই পারে না। নীচের বায়ু যখন খুব উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত পাত্‌লা হইয়া যায়, এবং উপরে ও চারি পার্শ্বের বায়ু শীতল ও ঘন থাকে, তখনই ঝড় বা ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি সম্ভব। ঢাকায় ঘূর্ণবায়ু হইবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা গিয়াছিল। পৃথিবী সংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত হইয়া খুব প্রবলবেগে উপরের দিকে উঠিতেছে, উপরের শীতল ঘন বায়ুরাশি, নীচের সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য, খুব প্রবল বেগে নীচের দিকে ছুটিয়াছে, আবার চারিদিকের বায়ুরাশিও তেমনি প্রবল বেগে নীচের শূন্য স্থানের দিকে আসিতেছে; যখন এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌গামী বায়ু প্রবাহের মধ্যে, একটা প্রবল ঘাৎ প্রতিঘাৎ ঘটে, তখনই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণবায়ুর আকার একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভের ন্যায়, এই স্তম্ভের মধ্যস্থল এক প্রকার শূন্য বলিলেও হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূন্য থাকে না, পৃথিবী সংলগ্ন উত্তপ্ত পাত্‌লা বায়ুরাশি এই পথে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। বায়ুমণ্ডলে যখন এই ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তখন ইহার মুখে যাহাই পড়ুক না কেন, নিমিষে তাহা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়, এবং এই আবর্ত্তের মধ্যস্থিত শূন্যপথে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই কথা কয়টী লিখিতে যে সময় লাগিল, কাজে ইহার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগে না। ঢাকায় ইহা তিন মিনিট কাল ছিল, তাহাতেই কত স্থান ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। এই উন্মত্ত ঘূর্ণবায়ুর গতির স্থিরতা নাই, ইহা কখনও বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া চলে, কখনও বা আকাশ পথে চলিতে থাকে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ঢাকার কোনও কোন স্থানের গৃহ এবং বৃক্ষ প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, আবার কোন দ্বিতল গৃহের উপরের তালাটী কেবল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, কোনও স্থানের বা বৃক্ষ ও গৃহের উপরিভাগ মাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বায়ুর অবস্থার তারতম্যই বোধ হয় ইহার কারণ।

এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ুর সহিত আর একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ইহার সঙ্গে অসংখ্য জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছিল। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের মধ্যে, সে দৃশ্য আরও কত ভয়ঙ্কর! এই অগ্নিপিণ্ড কি তাহা জানা যায় নাই। ইহা বিদ্যুতের কাণ্ড, অথবা বায়ুমণ্ডলে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড রহিয়াছে, প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া সেই উল্কাপিণ্ড গুলিই ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল, অথবা

ভিন্ন ভিন্ন বায়ু প্রবাহের সংঘর্ষণে এই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।

এই ঘূর্ণ বায়ুর সহিত মৎস্যাদি জলচর জীব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; এবং যে সকল স্থান দিয়া ইহা চলিয়া গিয়াছে, তাহার অনেক স্থান কর্দ্দমাক্ত দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই ঘূর্ণ বায়ু হয়ত ঢাকার নিম্নস্থ বুড়ীগঙ্গার উপর দিয়া গিয়া থাকিবে; এবং নদীর উপর দিয়া যাইবার সময়, জলস্তম্ভের সৃষ্টি করিয়া, জল ও মৎস্যাদি আকর্ষণ করিয়া লইয়া, তাহাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছে। আমরা ঘূর্ণ বায়ুর বিবরণ দিলাম; সংক্ষেপে আর দুই একটী কথা বলিয়াই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব।

গত ২৬এ চৈত্র, ৭ই এপ্রেল প্রাতঃকাল হইতেই ঢাকাবাসীগণ অসহ্য গ্রীষ্ম অনুভব করেন; সমস্ত দিন এই গ্রীষ্মে দগ্ধ হইয়া, বৈকালে ৬টার সময় উত্তর ও পশ্চিম আকাশে একখানি মেঘ দেখিয়া, সকলেই বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে মেঘখানি বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও গভীর মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। এদেশে এ কালে প্রায়ই এপ্রকার হইয়া থাকে, ইহা কিছুই নূতন নহে। মেঘখানা একটু লাল আভাযুক্ত ছিল। ক্রমে বাতাস একটু বেগে বহিতে লাগিল, এবং ক্রমে একটু বৃষ্টিও হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু ৭টার একটু পরেই, শত সহস্র বজ্র এককালে পতিত হইলে যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষাও যেন ভীষণ শব্দ শুনা গেল। বায়ু তখন উন্মত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে বহিতে লাগিল, এবং আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল। তিন মিনিটকাল এই প্রকার অবস্থা ছিল। সেই ভীষণ শব্দ ক্রমে বিলীন হইয়া গেল; অল্পক্ষণ পরেই আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গেল, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, প্রকৃতি শান্তির ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তখন ঢাকা নগরী হইতে এক ভয়ঙ্কর হাহাকার শব্দ উথিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই তিন মিনিটের মধ্যে, ঢাকানগরীর বহুস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—শত শত লোকের জীবন গিয়াছে, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল? এই দুর্ঘটনায় ঢাকা নগরীর কত স্নেহময়ী মাতার ক্রোড় শূন্য হইয়াছে, কত স্ত্রী অনাথ হইয়াছে, কত ভাই বোনে চিরজীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। একশতেরও অধিক মৃতদেহ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, কত আহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, হাঁসপাতালে আর স্থান হইতেছে না। পুলিষ তদন্ত করিয়া বলিতেছেন, দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে;—কিন্তু কেহ কেহ বলেন ঢাকার নবাব সাহেবেরই ঐ পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। নবাবের ইন্দ্রভবন—রঙ্গমহল ইষ্টকস্তুপে পরিণত হইয়াছে; নবাবের স্কুল গৃহ, আফিস ও অন্তঃপুর ভূতলশায়ী হইয়াছে; গ্যাসের কারখানা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং সহরের নিকটবর্ত্তী একস্থানে নবাবের যে বাগান ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা নবাবেরই অধিক হইয়াছে। কিন্তু দানশীল পরদুঃখকাতর নবাব ইহাতে বিচলিত না হইয়া, ক্ষতিগ্রস্থ ঢাকাবাসীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার আর একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, রূপবাবু এবং তাহার ভ্রাতা রঘুবাবু, পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অর্থের সদ্ব্যয় ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? দুঃখীর দুঃখ দূর করাতেই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয়।

আর দুই একটি কথা। একটী ছোট ছেলের ইটের চাপে পেট গলিয়া গিয়াছিল, বার বৎসর

বয়স্কা তার একটী ভগ্নী নিজের মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও, ভাইএর কাছে বসিয়া আকুল-ভাবে কাঁদিয়া বার বার বলিতেছিল "হে পরমেশ্বর আমার প্রাণ নিয়া আমার ভাইএর জীবন রক্ষা কর।" ভগ্নীর স্নেহ স্বর্গের জিনিষ।

একটী বাবু তাঁহার কাঠের গোলাতে ছিলেন, গুরুতর আঘাৎ পাইয়া যখন তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর" তখন তাঁহার এক জন করাতী, নিজের জীবনের দিকে না তাকাইয়া, বুকের নীচে তাঁহাকে রাখিয়া বাঁচাইয়াছে। করাতী বাঁচে কি না সন্দেহ। ইহাই প্রকৃত সৎকীর্ত্তি!

একটী যুবতীকে মৃত অবস্থায় নদীতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার বুকের উপর বস্ত্রের দ্বারা একটী শিশু দৃঢ় বদ্ধ ছিল। উভয়ই মৃত। মা কিন্তু বুকের শিশুকে বুকেই রাখিয়াছেন; মা বুকের অসহায় শিশুকে অতি যত্নে বুকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! স্বর্গের শোভা আর কোথায়?

কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনাও শুনা যাইতেছে; অদ্ভুত হইলেও কিছুই অসম্ভব নহে। নবাবের নহবৎ খানা হইতে একটী বালককে লালবাগে নিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু বালকটী জীবিত আছে। নহবৎখানা হইতে লালবাগ এক মাইলের অধিক।

নবাব বাড়ীর ইটের স্তুপের নীচে তিন দিন পরে একটী জীবিত মানুষ পাওয়া গিয়াছে।

শাঁখারী বাজারের তেতালার উপর একখানি গাড়ী পাওয়া গিয়াছে।

চক্ বাজারের কাছে একখানি জুড়ি গাড়ী, ঘোড়া সমেত শূন্যে উঠাইয়া লইয়া যায়, কোচ্‌মান লাফাইয়া পড়িয়া ঘোড়ার পা ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছে।

নদীতে একখানি নৌকায় ছয়জন লোক ছিল। তাহার একজনকে উড়াইয়া নদীর অপর পারে নর্ম্মাল স্কুলে ফেলিয়া দিয়াছে, লোকটী আহত হইয়াছে, কিন্তু মরে নাই। আর পাঁচজনের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

একটী স্ত্রীলোক শিশু কন্যা কোলে লইয়া বুড়ী গঙ্গার অপর পারে ছিল। ঘূর্ণবায়ুতে তাহাকে বিস্তীর্ণ বুড়ীগঙ্গার এপারে আনিয়া ফেলিয়াছে; কি প্রকারে আনিয়া ফেলিয়াছে সে কিন্তু বলিতে পারে না। মা ও মেয়ে কেহই কোন আঘাত পায় নাই।

চক্ বাজারের নিকট একটী লোককে শূন্যে কতকদুর উঠাইয়া আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। কে জানে কবে প্রকৃতির একটী সামান্য নিশ্বাসে আমরাও নিমেষে কোন অনন্ত অজানা দেশে উড়িয়া যাইব?

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

জীবন।

নূতন ধাঁধা।

বড়ই দুর্ব্বল আমি রমণী সমান।
আশ্রয় বিহনে মোর নাহি বাঁচে প্রাণ॥
ভূমিতে লুটায়ে কিম্বা পর পদতলে।
কাটাই জীবন মোর; ঘৃণয় সকলে॥
কিন্তু যদি উলটিয়া ধরহ আমায়।
হই আমি বলবান অতি মহাকায়॥
"ভীম প্রভঞ্জন" তবে কি করিতে পারে?
পথে ঘাটে থাকি আমি জান কি আমারে?

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা।
মে, ১৮৮৮।

মুক্তি ফৌজ।

খ্রীষ্টধর্ম্মের মুক্তি ফৌজ (Salvation army সম্প্রদায়ের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাঁদের সৈন্যদল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই আছেন। পরোপকার ও কর্ত্তব্য সাধন ইহাঁদের জীবনের মহাব্রত।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, লণ্ডন নগরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এমন শত শত লোক আছে যাহাদের রাত্রিতে মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্তও নাই। ইহারা অনেক সময় বড় বড় উদ্যানে (Park) ও রাস্তায় পড়িয়া থাকে। লণ্ডনে গরীব লোকের অত্যন্ত দুরবস্থা। সকল দেশেই পাপের ও অজ্ঞানতার স্রোত গরীব লোকের মধ্যেই বেশী প্রবাহিত—বিশেষতঃ লণ্ডনের দরিদ্রেরা অত্যন্ত মাতাল—ইহাদের অসাধ্য কোন দুষ্কর্ম্মই নাই। এই সকল লোককে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সুনীতির পথে আনিতে খুব সাহস, নৈতিক বল ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায় ইহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দানে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এই চিন্তা তাঁহাদের মনে উদয় হইল! প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলে ইহারা শুনিবে না—হলে বক্তৃতা শুনিতে কখন আসিবে না—যদিই বা আসে তাহা হইলেও মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের হলে অত লোকের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। এ সব উপায়ে ইহাদিগকে সুনীতির পথে আনা অসম্ভব। শেষে এই উপায়টী স্থির হইল—এই সকল দরিদ্র ও অজ্ঞান লোকদিগের বাসের পল্লীতে, ঠিক ইহাদের মত থাকিয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ধীরে ধীরে ইহাদিগকে পরিবর্ত্তন করাই সঙ্গত। এই কার্য্যে খুব মানসিক বল ও সহিষ্ণুতা চাই। কে এই ভয়ানক মাতাল ও দুরাচারীদের সহিত বাস করিবে!!!

প্রথমে কেবলমাত্র দুইটী ভগিনী এই কার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালওয়ার্থে কার্য্য আরম্ভ হইল। এই দুইজন সাধুশীলা ভগিনী মলিনগৃহে, মলিনবেশে, মাতাল ও দুষ্টলোকদিগের পল্লীতে বাস করিয়া, ইহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, পীড়ার সময় জননীরূপে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়া, বিপদের সময় উপদেশ দিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া, উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সকল বিতরণ করিয়া, দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া এই সকল দরিদ্র দুরাচারীদের বন্ধু হইলেন। ইহাদের মনে ধর্ম্মের ভাব জাগরিত করিতে লাগিলেন। এইক্ষণ ইহাঁদের কার্য্যক্ষেত্র অনেক পরিসর হইয়াছে। এখন লণ্ডনে এই ভগিনীদের থাকিবার ১৬টী আবাস আছে। ইহাতে

৪০ জন ভগিনী থাকেন। এই সকল আবাস দরিদ্র-পল্লীতে ও ঠিক্ দরিদ্রদিগের মত। ইঁহারা বেতন-ভোগী নহেন—কেবল গরীবলোকদের মত থাকিতে যাহা কিছু- ব্যয় হয় তাহাই লয়েন। এক বৎসর ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়াছেন; ৩০।৪০ জন পতিতা রমনীকে উদ্ধার করিয়াছেন ও ইহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়াছেন। ১৭০০ জন লোক নিজ নিজ পাপ স্বীকার করিয়া যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস করিয়াছে। ইহারা গত অধিবেশনের দিন প্রকাশ্য সভায় কৃতজ্ঞতা পূর্ণ বাক্যে সমস্ত উপকার স্বীকার করিয়াছে। ৯৬,৯৭৪ খানি দরিদ্রগৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন ও সেখানে উপদেশ দিয়াছেন। ৩২,৫৬৯ বার দরিদ্রের বাড়ী যাইয়া ইহাদের পরিবারবর্গের সহিত একত্রে উপাসনা করিয়াছেন। এবং প্রায় ২১২০ জন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়াছেন। এই সকল মহৎকার্য্য রাস্তায় রাস্তায় ব্যাণ্ড বাজাইয়া বা বক্তৃতায় সাধিত হয় নাই। খুব সহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ইহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। এ রকম না করিয়া সুধু বক্তৃতা করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের পথে আনা যায় না। আমাদের দেশেও দরিদ্রদের অবস্থা বড় শোচনীয়। জাহাজের খালাসী প্রভৃতির দুরবস্থা দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়; ইহারা যাহা পায় সমস্তই মদ খাইয়া ফেলে—ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই—আছে বই কি? শুধু বক্তৃতার ছটায় কিছু হইবার আশা নাই; ইহাদের সহিত মিশিয়া, ইহাদের দুঃখের ও কষ্টের সময় সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরন কাস্তগিরির বাটীতে কতকগুলি দেশী খালাসীকে আহ্বান করিয়া চা, কমলালেবু প্রভৃতির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। এই সকল লোককে ও এই রকম অবস্থাপন্ন অন্যান্য দুঃখী লোকদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিতে পারিলে একটা মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে।

সে দিন বোম্বাই সহরে এই মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের একজন কাপ্তেন তত্রস্থ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ক্রলিবেভী সাহেবের নিকট বলেন যে, তাঁহার নিকট মদ খাইয়া মাতলামি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি স্বয়ং কোন দণ্ড না দিয়া মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পন করেন—এই সম্প্রদায়ই এই সকল মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিবেন। বোম্বাই সহরে মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায় অনেক মাতালকে ভাল করিয়াছেন। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের দ্বারা যে অশেষ হিতকর কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে সন্দেহ নাই।—ইহাদের সদ্দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

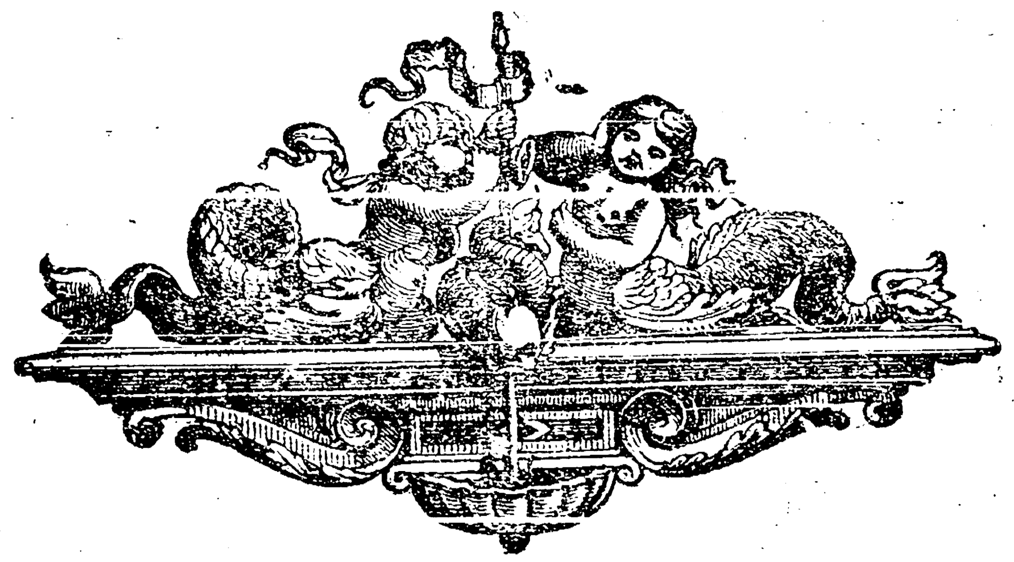

আলোক পরীক্ষা।

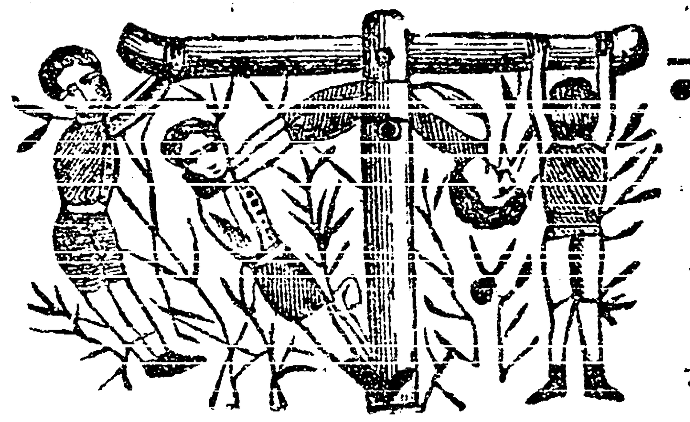
ন একটী জিনিস জান্‌তে হ'লে তার বিষয় অনুসন্ধান কর্‌তে হয়, সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হয়, তার সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা কর্‌তে হয়। তুমি যদি বল গোপাল বাবু খুব ভাল লোক, তার মানে এই যে, তুমি অনেক দিন গোপাল বাবুর সঙ্গে মিশেছ, তাঁহাকে বেশ জান শোন, তাঁর কায কর্ম্ম ব্যবহার দেখেছ, তাঁকে পরীক্ষা করেছ, তবে বুঝেছ তিনি খুব ভাল। এইরূপ সতীশ ছেলেটী কেমন জান্‌তে হ'লে তার সঙ্গে মিশে তার কায কর্ম্ম ব্যবহার দেখা চাই, তাকে পরীক্ষা করা চাই তবে সে ভাল কি মন্দ, বোকা কি বুদ্ধিমান জানা যাবে। আম না চেখে দেখলে ভাল কি মন্দ টের পাওয়া যায় না। পরীক্ষাই প্রায় সকল জ্ঞানের মূল। পরীক্ষা ভাল করিয়া করিতে পারিলে সকলেরই গুণ টের পাওয়া যায় কেহই ফাঁকি দিয়া বড় রেহাই পাইতে পারেন না।

যারা অন্ধ তাদের কি কষ্ট! তাদের জীবনের অর্দ্ধেক সুখ অর্দ্ধেক আনন্দ চলে যায়। আমাদের চোখ আছে তাই বাহিরের কত সুন্দর সুন্দর শোভা দেখে কতই সুখ অনুভব করি। কিন্তু এই চোখ থেকেও আমরা অন্ধ হইতাম যদি আলো না থাকিত। অন্ধকারে চোখ থাকুলেই বা কি আর না থাকুলেই বা কি, সবই সমান; যদি আলো না থাকে।

আলো যখন এমন জিনিস, যা না থাকুলে চলে না, তার বিষয় কি কিছু জানা উচিত নয়?

আলোর বিষয় অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে আমরা এই টের পাই যে, কতকগুলি বস্তু আলোককে বড় সম্মান ক'রে চলে, তাদের সামনে এলেই অমনি তারা যাবার পথ ছেড়ে দেয়, আলো তাদের ভিতর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলে যায়। আবার অনেক ভায়া আছেন তাঁরা বড় একটা কেয়ার করেন না, আলো যদি সামনে এসে পড়ে তবে তাঁরা যেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান, পথ ছেড়ে দেন না; বেচারা আলো সেইখানে থেকে যান, না হয় আবার ফিরে আসেন। কাচ, জল, বাতাস এরা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে; আর ইঁট, পাথর, কাঠ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রদীপের সম্মুখে কাচ ধরিলে তার ভিতর দিয়া আলো আসে। তাই দেখ কাচের সেজ, কাচের চিম্‌নি, কাচের লণ্ঠন। জলের ভিতর দিয়া জলের তলায় কি আছে টের পাই। বাতাসের ত কথাই নাই। আমরা যখনই যা দেখি, সব বাতাসের ভিতর দিয়া। আবার দেয়ালের আড়ালে প্রদীপ রাখ দেয়াল ভেদ করিয়া আলো আসিবে না। ধামা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে প্রদীপ আর দেখ যায় না। চোখের সামনে তোমার স্লেটখানি ধর স্লেটের ওপাশে সম্মুখের বস্তু কিছুই দেখিতে পাইবে না। অর্থাৎ ইহারা আলোর পথ ছাড়িয়া দিল না। প্রথমগুলিকে স্বচ্ছ বলে, দ্বিতীয়গুলি অনচ্ছ।

আলোর প্রথমগুণ এই জানা যায় যে আলো সোজা পথে চলে। কোনও বাধা না পড়িলে কখনও বাঁকা পথে যায় না! ইহার প্রমাণ কি? পরীক্ষা কর।

(ক) সোজা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায়, বেঁকা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায় না। কাগজের

সোজা একটী চোঙ্গার ভিতর দিয়া যদি দেখ তবে চোঙ্গার ওপাশে যা আছে তা দেখতে পাবে। যদি চোঙ্গ মাঝা মাঝি বেঁকাও তবে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

(খ) প্রদীপ ও চোখের মাঝে একখানি বই ধর প্রদীপটী দেখিতে পাইবে না। বইএর পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তোমার চক্ষে আলো পড়িল না।

(গ) একটী ঝাঁটার কাটীতে বা সোজা একটী লৌহ সলাকায় তিনখানি তাস বা ব্যবহৃত পোষ্ট-কার্ড ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া বিদ্ধ কর। আর একটী সলাকা এধার ওধার ফুঁড়িয়া তাস তিনটীর উপরে এক একটী করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র তিন-টীই এক সরল রেখায় হইবে। শেষের তাসের ছিদ্রের নিকট যদি একটী প্রদীপ রাখা যায় তবে সম্মুখের তাসের ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে প্রদীপ দেখা যাইবে। কিন্তু কোন একখানি তাসকে ডান কিম্বা বাম দিকে ঈষৎ হেলাইয়া সরল রেখা হইতে বিচ্যুত করিলে আর ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইবে না।

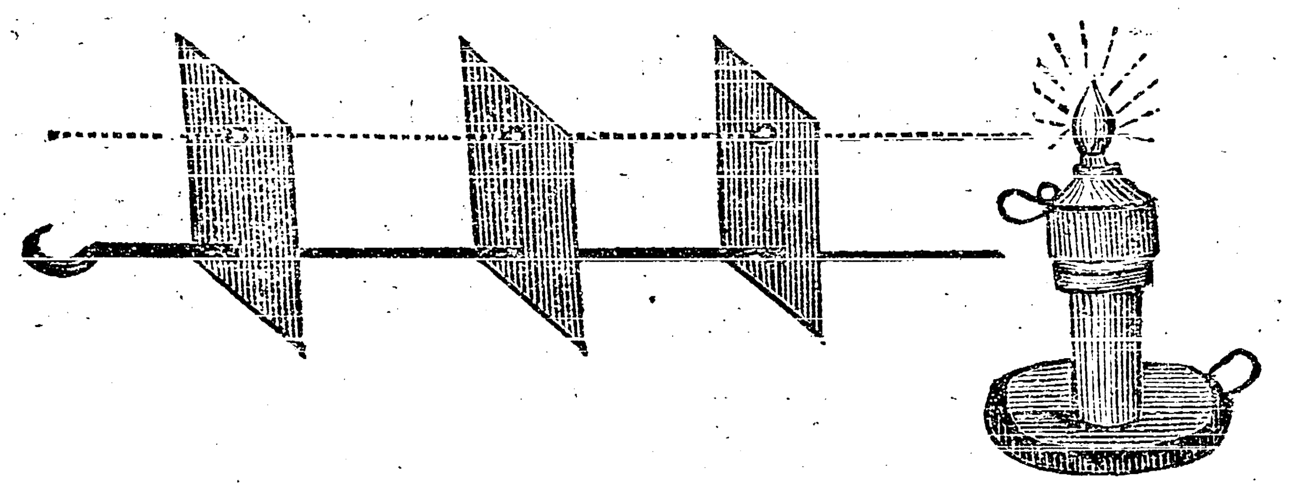

আলো সরল পথে যায় বলিয়া পদার্থের ছাঁয়া পড়ে। বন্দুক বা তীর ছুঁড়িবার সময়ে লক্ষ্য বা নিশানা করিতে পারা যায়। এই গুণ থাকাতেই নাবিকেরা জাহাজ চালাইতে সক্ষম হয়। এই গুণ থাকাতেই জ্যোতির্ব্বিদ দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই গুণ থাকাতে একটী বড় মজা হয় দেখ্‌বে। যে ঘরের একটী দিক্ বেশ খোলা সেই ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে অন্ধকার হলে সেই খোলাদিগের দরজা বা জানালার কাছে গিয়া দেখ তাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, থাকেত ভালই, যদি না থাকে ত একটী ছিদ্র করে নাও। সেই ছিদ্রের কাছে যদি একখানি সাদা কাগজ ধর দেখবে যে সেই কাগজের উপর বাহিরের বস্তুর কেমন সুন্দর একটী উল্টা ছবি পড়িয়াছে। কাগজখানি যত সরাইবে ছবিটী তত বড় হইবে। হয়ত দেখিবে দেয়ালে একটী বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে। ছোট ছোট কাগজের বাক্সের পাশে একটী করিয়া যদি ছিদ্র করিয়া লও, তবে নানা জিনিসের ছবি সেই বাক্সের ভিতর দেখিতে পাবে। একটী দেশালাইয়ের বাক্সের খোলটীর

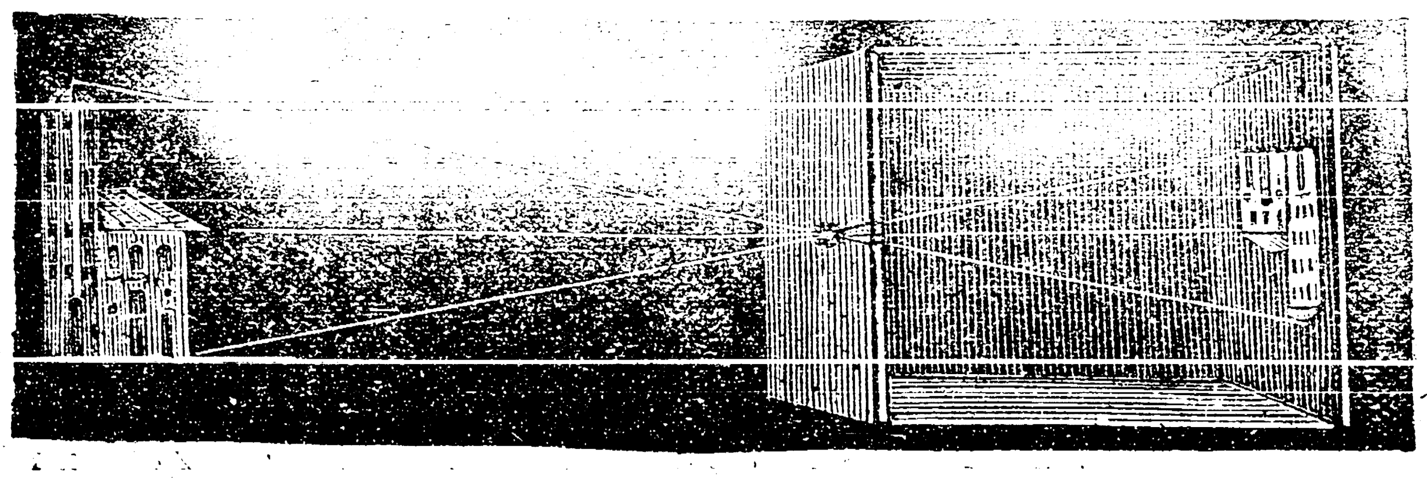

উপরে যেদিকে লেখা থাকে সেই দিকের মাঝ-খান একটী ছিদ্র করিয়া যদি লও আর কোন বাড়ী ঘর কি গাছ পালার দিকে যদি সেই ছিদ্রটী ফিরাও তবে পাশ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে অপর দিকে কেমন ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর উল্টা ছবি পড়িয়াছে।

আলোর দ্বিতীয় গুণ এই টের পাবে যে, যখনই কোন মসৃণ পালিশ করা জিনিসের উপর আলো পড়ে তখনই সেখান হইতে ফিরিয়া যায়। নদী বা পুকুরের পারে দাঁড়াইলে জলে ওপারের গাছ-পালার ছায়া পড়েছে দেখ্‌তে পাবে। একখানি আর্শির সামনে যদি একটী প্রদীপ বা তোমার মুখ-খানি ধর তবে আর্শিতে প্রদীপের বা তোমার মুখের ছবি দেখিতে পাবে। গাছপালা থেকে যে আলো, কিম্বা প্রদীপ বা তোমার মুখ থেকে যে আলো জল বা আর্শীর উপর প'ড়ে ছিল সেগুলি চলে যাবার পথে বাধা পেয়ে সেখান থেকে তোমার দিকে ফিরে এসে তোমার চখে পড়্‌ল তাই তুমি জল ও আর্শির ভিতর ছবি দেখিতে পেলে। এই ফিরে আসারও একটী নিয়ম আছে। সেটি এই:— আর্শির (বা যে কোন পালিশ করা জিনিস হউক) উপর আলো যত হেলে পড়ে সেই পড়িবার স্থান হইতে বিপরীত দিকে ফিরে যাবার সময়ে আর্শির দিকে ততটা হেলে যায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিক কথায় বলে "পতন কোন পরাবর্ত্তন কোনের সঙ্গে সমান হয়"। এটী সহজে পরীক্ষা করা যায়। বাজারে যে একপয়সা বা দুই পয়সা করে ছোট ছোট আর্শি পাওয়া যায় তাহারই একখানি আর্শি চছজঝ পুরু কার্ডবোর্ডের ঠিক মাঝখানে ছুরি দিয়া একটু চিরিয়া তাহার ভিতর বসাইয়া দাও। আর্শি-খানির মাঝখানে (খ) একটু ফাঁক রাখিয়া আর সব একটুক্রা কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও।

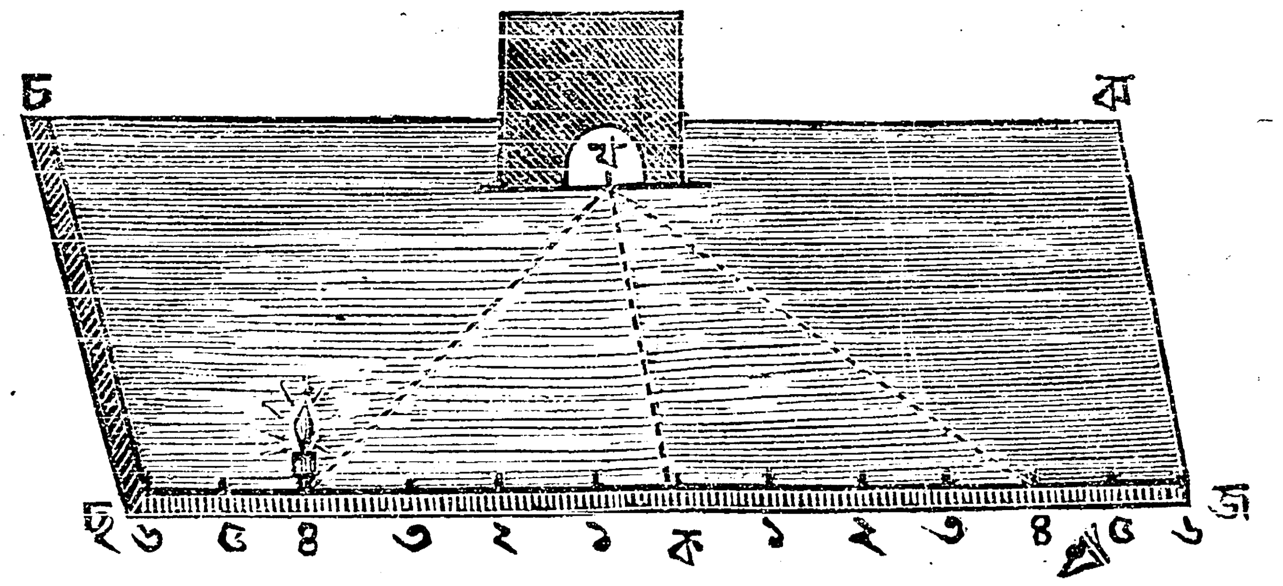

ছজ র ঠিক মাঝখানে (ক) একটী দাগ দাও। ক হইতে খ পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা টান। রেখাটী যেন আর্শির উপর না হেলে থাকে, যেন সোজা হয়ে থাকে অর্থাৎ জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে তাই যেন হয়। ছক ও জক কে কয়েকটী সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দাগ দাও। ছক র এক এক ভাগ যেন জক র এক এক ভাগের সমান হয়। এখন দেখ যে ছক র কোন একভাগ যথা ৪ চিহ্নের উপর যদি একটী ছোট বাতী বা অন্য কোন ক্ষুদ্র বস্তু রাখ তবে জক র দিগের ৪ চিহ্নের নিকট চোখ রাখিয়া যদি খ র দিকে তাকাও তবে আর্শির ভিতর তার ছবি দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু চোখ যদি ২ এর কাছে বা ৬ এর কাছে আন তবে আর সে ছবি দেখ্‌তে পাবে না। আর ৪এর কাছে যদি চোখ থাকে তবে বাতীটা যদি ৫,৬,৩, বা ১ এর কাছে আন, আর তার ছবি দেখতে পাবে না। এ ধারে যে চিহ্নের কাছে বাতী রাখিবে ওধারে ঠিক সেই চিহ্নের কাছে চোখ না লইয়া গেলে ছবি দেখা যাইবে না।

তাহার কারণ কি বুঝিলে ;-এধারের ১, ৩ বা ৬ যে চিহ্ন হ'তে খ পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা টানা যায় সে রেখাটী আর্শির উপর বা কখ র সহিত যতটা হেলে বা ঝুঁকে থাকে ও ধারে খ হ'তে ১, ৩ বা ৬ চিহ্ন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা টানিলে সে রেখাটীও আর্শির উপর বা কখ র সহিত ওধারে ততটীই হেলে বা ঝুঁকে থাক্‌বে। অন্য কোন রেখা তা হবে না। সেই জন্য অন্য চিহ্ন হ'তে দেখা যায় না।

আবার জিনিসটী আর্শির সামনে যত দূরে থাকে তার ছবিটী আর্শির পিছনে ঠিক তত দূরে দেখায়।

দুখানি আর্শি যদি সাম্‌না সাম্‌নি কাত করিয়া লাগাইয়া রাখা যায়, আর তার মধ্যে যদি কোন জিনিস ধরা যায় তার অনেকগুলি ছবি পড়ে। যদি একটার উপর আর একটা ঠিক দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, তবে তিনটি ছবি পড়ে। আরও বেশী কাত করিলে আরও অধিক ছবি পড়ে। ইহার কারণ এই যে দুখানি আর্শিতে ত দুটী ছবি পড়িবেই ; তা ছাড়া ছবির ছবি তার ছবি এই দুইখানি আর্শিতে ক্রমাগত প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। বাজারে এক রকম খেলনা পাওয়া যায় ; একটী কাগজের চোঙ্গার ভিতর দিয়া দেখিতে হয় আর চোঙ্গাটী ঘুরাইতে হয়, ইহাতে অনেক রকম রং-করা ছক্‌কাটা ফুল দেখিতে পাওয়া যায়।

এই চোঙ্গার ভিতর তিনখানি লম্বা কাঁচের টুকরা পরস্পর কাত করিয়া বসান থাকে। চোঙ্গার তলাটী গোল কাঁচ দিয়া বন্ধ করা, তার ভিতর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রং করা কাঁচের টুকরা দেওয়া থাকে, সেইগুলি ঐ তিনখানি কাঁচ হইতে বারে বারে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া নানা রকম ছক্‌কাটা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

দর্পন যদি চেপটা না হইয়া গোল কিম্বা চোঙ্গার মত হয় তবে ছবিগুলি বড় মজার বিকৃত হইয়া পড়ে। শিশি বোতল বা চক্‌চকে কাঁসার গেলাসে বা ঝক্‌ঝকে ঘটী বা কলসীর উপর তোমার মুখের ছবি দেখ। কেমন বিকৃত দেখাবে।

নূতন-খেলা।*

এস এস ভাই আজ সকলে মিলিয়া,
খেলিব নূতন খেলা আমোদে মাতিয়া।
বড়ই সুন্দর-খেলা দেখিবে এখন,
কতই আমোদ পাব নূতন নূতন!
এক, দুই, তিন, চারি, ছয় জন করি,
গোল হ'য়ে দাঁড়াইব হাত ধরা ধরি!
ফুলে-দলে সরোজেরে দিব সাজাইয়া,
ফুল-রাণী সেজে রবে মাঝে দাঁড়াইয়া!
ছয় জনে ছয় ঋতু আমরা সাজিয়া,
নেচে নেচে চ'লে যাব ঘুরিয়া-ফিরিয়া!

তুমি ত হইবে গ্রীষ্ম ভাবনা কি তার!
পাগল-বরষা হবে নলিনী আমার!
শরত হইবে শশী, আমি ত হেমন্ত!
যামিনী হইবে শীত, কামিনী বসন্ত!

এস তবে গোল হ'য়ে দাঁড়াই সবাই,
জোর ক'রে হাত তবে ধর সব ভাই!

* ইংরাজী রয়াল রিডার নামক পুস্তকের কোন একটী কবিতার ভাব অবলম্বন করায় এই কবিতাটী লিখিত হইল।

ঘুরিব সকলে যেন চক্রের মতন!
ঘন ঘন শ্বাস নাহি বহে যতক্ষণ!
যতক্ষণ গাল-দুটী না হইবে লাল,
ঘুরিব সে নেচে নেচে সবে তত কাল!

এস তবে এস ভাই দেরী কেন কর!
ঘূরে ঘূরে চল সবে হাত তবে ধর!
এই চ'লে গেল গ্রীষ্ম, বরষা আসিল!
শরতের হাত ধরি হেমন্ত চলিল!
দেখিতে দেখিতে শীত হ'য়ে গেল অস্ত!
এই এল, চ'লে গেল, সাধের বসন্ত!

নিদাঘ, বরষা, আর শরত, হেমন্ত,
ফিরে ঘূরে আসে শীত লইয়া বসন্ত!
ছয় ঋতু চ'লে যায় নাচিয়া নাচিয়া!
নূতন বৎসর-মালা গলায় পরিয়া!

(প্রাপ্ত)

বিলাসের শিক্ষা।

(বালকের রচনা।)

বিলাসচন্দ্র বড় লোকের সন্তান। বড় লোকের সন্তান হইলে সাধারণতঃ যে সমুদয় গুণ থাকে আমাদের বিলাস বাবুর তাহার কিছুরই অভাব ছিল না।

বিলাস ছেলে বেলা হইতেই অত্যন্ত আমোদের ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া ধিঙ্গি হইয়াছেন। বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বিলাসের এপর্য্যন্ত পাঠশালা স্কুল বা কলেজের "ক" "খ" বা "এ" (*A*) "বি" (*B*) র সহিত আলাপ হয় নাই। শান্তিপুরের ১০৷৷০ টাকা বা ২০৲ টাকা দামের জোড়ার মিহি কাপড় পরেন। নানাপ্রকারের সার্ট, কামিজ, টাইট কোট, ইংলিশ কোট, চায়না কোট, পার্শিয়ান কোট, জর্ম্মান কোট, রাষিয়ান কোট, ইটালি কোট, আরবি কোট প্রভৃতি আকারান্ত ও ইকারান্ত কোট সমূহে তাঁহার চারিটী বাক্স পূর্ণ। রিমেলের ইউডিকলোন, ল্যাভেণ্ডার, পমেটম না হইলে তাঁর চুল ফেরান হয় না। সুগন্ধি নারিকেল তৈল (Perfumed rosy Cocoanut Oil) মাখেন। মণ্টিথের বাড়ীর জুতা পায় দেন। নানারূপ আতর মাখেন। হাতে এক গাছি সরু ভাল ছড়ি লইয়া কোঁচার ফুলটী সন্তর্পণে ধরিয়া চাদরটী বুকে জড়াইয়া ফুল কাটিয়া রুমালের অর্দ্ধেক খানি পকেট হইতে ঝুলাইয়া সুগন্ধে ভূষিত হইয়া বিলাস বাবু যখন হাটেন তখন বোধ হয় যেন কার্ত্তিক কলিতে ময়ূর হারা হইয়া বেড়াইতেছেন। এ সব দোষ ছাড়া বিলাসের আরও কয়েকটি দোষ আছে, বিলাস বড় অহঙ্কারী, বড় রাগী, এবং বড় রুক্ষ। যে কথা বলে তার উপরই চড়া চড়া কথা। বিলাস মনে করেন যে তাঁর ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই। বিলাস কিন্তু নিজের পোষাকগুলি বড় ভাল বাসিত। পোষাক যাহাতে ময়লা না হয়, পোষাকে ধূলা কুটা না পড়ে, কেহ না নাড়ে এটী বিলাসের বড় ইচ্ছা। বিলাস বেড়াইয়া আসিয়া পোষাকগুলি ছাড়িয়া বেশ করিয়া ব্রস্ দিয়া ধূলা কুটা ঝাড়িয়া একটি পরিষ্কার আলনায় বন্ধ করিয়া রাখেন। কেহ তাহা না ছোঁয়,—না নাড়ে।

বিলাস একজনকে বড়ই ভালবাসিত। সে ফণীভূষণ বাবু। ফণী বাবু এবার বি, এ, ক্লাশে পড়েন। বিলাস তাঁহাকে বড় ভক্তি করে। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিলাসকে নানা উপদেশ দেন। কিন্তু তাহা ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বিফল।

যাহা হউক একদিন ফণী বাবু গিয়া দেখিলেন যে, বিলাস তাহার এক স্যুট পোষাক সম্মুখে করিয়া কাঁদিতেছে। টেবিলের উপর কতকগুলি চক্, এক খান সাবান, কতকগুলি আমরুল শাক পড়িয়া আছে। ফণী বাবু দেখিয়া অবাক্ !

বিলাস বেড়াইয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছে এমন সময় তাহার ছোট ভগ্নী আসিয়া চেয়ারে বসিল। দুর্ভাগ্যক্রমে টেবিলে ইংরাজি কালীপূর্ণ একটী দোয়াত ছিল। চারি বৎসরের বালিকা কি জানে ? সে বেশ রঙ্গীন দোয়াতটী দেখিয়া যেমন হাতে করিতে গিয়াছে অমনি কালীর দোয়াতটীর সমুদায় কালী বিলাসের কাপড় চাদর জামা প্রভৃতিতে লাগিয়া গেল। বালিকা দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু বিলাস আসিয়া যেই দেখিল যে তার সাধের পোষাকে কালী লাগিয়াছে তখন তার কান্না দেখে কে ? অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে এই সব সাবান, খড়ি, আমরুল শাক প্রভৃতি লইয়া ক্রমাগত অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ঘষিতেছে, কিন্তু পোড়া কালির দাগ কিছুতেই উঠিতেছে না। তাই সে নিরুপায় হইয়া কাঁদিতেছে। আর সময় সময় ঐ পোষাকের দিকে তাকাইতেছে। বিলাসের পোষাক অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহলে কি হয় ? তার পোষাকের প্রতি এতই মমতা যে সে এক স্যুট পোষাক নষ্ট হওয়া দেখিতে পারিতেছে না।

ফণী বাবু বিলাসকে অনেক বুঝাইয়া পরে অনেক কষ্টে পোষাকের কালীর দাগ উঠাইলেন ; তখন বিলাসের আনন্দ দেখে কে? বিলাস আনন্দে নাচিতে লাগিল।

পরে ফণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "দেখ বিলাস ! তুমি এই সামান্য পোষাকের কালীর দাগ উঠাইতে যত কষ্ট করিলে ইহার পরিবর্ত্তে যদি তুমি তোমার অন্তরের কালী মুছাইতে চেষ্টা করিতে তবে বড় সুখের বিষয় হইত। দেখ তোমার অন্তরে কেমন দৃঢ় কালী পড়িয়াছে। তুমি লেখা পড়া কিছুই জান না। তুমি বিনয়ীর পরিবর্ত্তে অহঙ্কারী, বিদ্বানের পরিবর্ত্তে মূর্খ এবং ক্রোধ সংযমীর পরিবর্ত্তে ক্রোধী হইয়াছ। দীনে দয়া, পরোপকার, জীবে কষ্ট না দেওয়া প্রভৃতি সৎগুণগুলি তোমার অন্তর হইতে বিদূরিত হইয়াছে, কেবল তুমি অত্যন্ত বিলাসী, অহঙ্কারী, দম্ভী হইয়াছ। বল দেখি বিলাস ! এগুলি কি অন্তরের কালী নয় ? দেখ দেখি প্রত্যেক লোকে তোমাকে নিন্দা করে। কেহই তোমাকে ভালবাসে না ! সকলেই তোমাকে বিষ নয়নে দেখে ? বল দেখি এত লোক থাকিতে লোকে তোমাকেই এরূপ করে কেন ? তোমার খুড়তুতো ভাই দেবেন্দ্রকে তো কেহই এমন বলে না। সকলেই তাকে আদর করে, ভালবাসে, প্রশংসা করে ! কেন বল দেখি ? এ আর কিছুই নয় ! এ কেবল তোমার অন্তরের কালীর জন্য ! দেবেন্দ্র দেখ তোমাপেক্ষা ছোট, সে এবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। আর তুমি কিছুই জান না ? কথায় বলে যে 'ভালবাসা চাও যদি নিজে ভাল হও।' অতএব তুমি আজ হইতে এসব বিলাসিতা ত্যাগ কর। বিদ্যা ও সৎগুণে দেহ ভূষিত কর। বিদ্যা ও সৎগুণের ন্যায় পোষাক জগতে নাই। ঈশ্বরকে ভক্তি

কর। কুকাজ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিও না ! দেখিবে তোমার মন প্রফুল্ল হইবে। তখন তুমি মনে এত সুখ পাইবে যাহা বলিবার নহে। অতএব ভাই ! মনের কালী দূর কর। মন স্থির করিয়া যাহাতে বিদ্যা, বিনয়, পরোপকার, দয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিতে পার তাহার চেষ্টা কর। প্রত্যহ দৈনিক কাজ তত্ত্বাবধান করিয়া দেখিও কোন রূপ কুকাজরূপ ধূলা কুটা পড়িয়াছে কি না, যদি প'ড়ে, থাকে, বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবে আর সতর্ক হইবে যেন আর সেরূপ না হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে মারিতে চাও তবে মনে করিবে যে, যদি কেহ তোমাকে মারে তবে তাহা তুমি ভাল বোধ কর কি না। অবশ্যই করিবে না, অতএব অপরকেও মারিও না বা কষ্ট দিও না। কোন অসৎ প্রবৃত্তি বা অসৎ অভিপ্রায় মনে উদয় হইবামাত্র পিতা মাতা আদি গুরুজনের নিকট বা যেখানে সৎ কথার আলোচনা হইতেছে তথায় যাইবে। অসৎ বালকগণের সঙ্গ বা অসৎ পুস্তক পাঠ পরিত্যাগ করিবে। প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট সৎ-প্রবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিবে। আজ এই পর্য্যন্ত। যদি দেখিতে পাই তুমি এই কথা মানিয়া চলিতেছ, তবে আর এক দিন তোমাকে আবার উপদেশ দিব। দেখিও যেন ভুলিও না।" বিলাস কথাগুলি নীরবে শুনিল, এবং মনে মনে বুঝিল। এবং তার পরদিন হইতে বিলাস রীতিমত বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠাদি আরম্ভ করিল ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিল। বিলাস আর অসৎ সঙ্গে যায় না। এক বৎসরের মধ্যে বিলাস মাইনর পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইল। এবং এখন বিলাসের চরিত্র বেশ ভাল হইয়াছে। গ্রামে এখন বিলাসের বড় প্রশংসা হইয়াছে।

মামথ ।

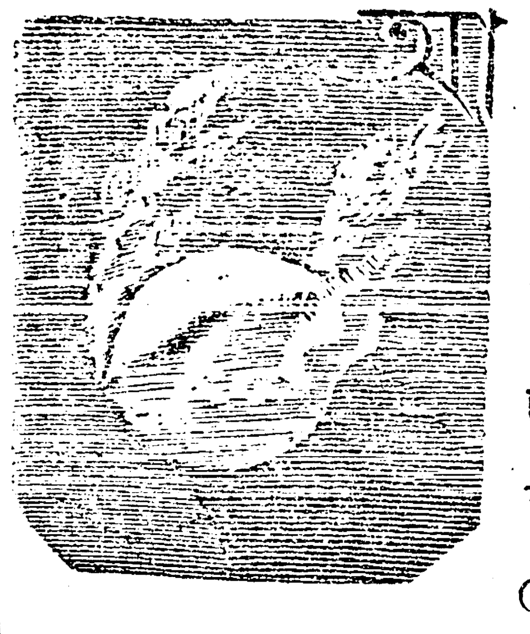

আজ তুমি যত বড় হইয়াছ, পাঁচ বছর পূর্ব্বে আর কিছু তুমি এত বড় ছিলে না। এমন সময় ছিল যখন তুমি চলিতে পারিতে না, কথাটীও কহিতে পারিতে না, তখন তোমার সম্বল ছিল কেবল মাত্র ক্রন্দন। তার পর ক্রমে তুমি হাত পা নাড়িতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে তোমার মুখে কথা ফুটিল, তুমি দু এক পা চলিতে শিখিলে। আরও দুই চার বছর গেল, তুমি ও ক্রমে বাড়িতে লাগিলে ; ক্রমে দশ জনের একজন হইয়া উঠিলে। এ সব হইল বটে, কিন্তু তোমার সেই বাল্যকালের সম্বল—ক্রন্দনটী কিন্তু তুমি ছাড়িলে না। যখন তোমার আর কোন উপায় না ছিল, তখন ক্রন্দন তোমার সম্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তোমার যখন ক্রমে সব হইল, তখনও তুমি কেন ওটী ছাড়িলে না ? এখনও তুমি একটুতেই মুখ ভার করিয়া নাক ফুলাইয়া কাঁদিতে বস। কিন্তু সে কথা যাক্, যাহা কেহই ছাড়িতে পারিল না, তাহার জন্য তোমাকেই বা কেন দোষ দি ; আর বুঝি ইহা কেহই ছাড়িতে পারে না—মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, আর যে দিন এসংসার পরিত্যাগ করিয়া যায় সেই দিন তাহার ক্রন্দনের শেষ হয় !

যাহা হউক বলিতেছিলাম যে, আজ তুমি যত বড় হইয়াছ, চিরকালই কিছু তুমি এত বড় ছিলে না। আজ পৃথিবীকে যে অবস্থায় দেখিতেছ,

পৃথিবীও চিরকাল এমনতর ছিল না। তুমি যেমন এক সময় শিশু ছিলে, পৃথিবীও তেমনি এক সময় শিশু ছিল। তোমার যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর গিয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ ; পৃথিবীরও তেমনি শৈশব, বাল্য, কৈশোর গিয়াছে ;—মনে হয় যেন পৃথিবীও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আজ পৃথিবী সুজলা, সুফলা, শ্যামলা। বৃক্ষ, লতা, তরু, গুল্ম আজ পৃথিবীর অপূর্ব্ব-শোভা ; বৃক্ষ লতা আজ ফুল ফলে পরিপূর্ণ ; কুসুমের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছ, চিরদিন ইহা ছিল না—থাকিবেও না। কাল তুমি যাহা ছিলে, আজ আর তুমি তাহা নও, কালকার সে তুমি—আর আজকার তুমি নও ; কালকার তুমি ছিলে একজন, আর আজকার তুমি আর একজন ; প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। পৃথিবীরও তাহাই। কালকার পৃথিবী যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই, প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ সকল কবিত্বের কথা নহে ; বিজ্ঞানের কথা। তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, এই যে সুজলা, সুফলা, শ্যামলা, মানুষের বাসের উপযোগী পৃথিবী আজ আমরা দেখিতেছি, চিরদিন ইহা এ প্রকার ছিল না। এই পৃথিবীর এমন সময় ছিল, যে সময় এ সকল কিছুই ছিল না। প্রথমে পৃথিবী তরল অগ্নিময় অবস্থায় ছিল। কালক্রমে ইহার উপরে, অথবা বাহিরের দিক্‌টা শীতল হইয়া ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করিল। উপরে একটা কঠিন আবরণ হইল বটে, কিন্তু ভিতরে সেই প্রকার তরল অগ্নিময় অবস্থাই রহিয়া গেল। আগ্নেয়গিরি বা জ্বালাভূমি, উষ্ণপ্রস্রবণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। ক্রমে এই কঠিন আবরণের উপরে চারিদিকের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। পৃথিবীর উপরের আবরণ যখন ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল, তখন সকল স্থান সমান উচ্চ হয় নাই ; কোনও স্থান উচ্চ কোনও স্থান নিম্ন হইয়া গিয়াছিল ; এই সকল স্থানে জল দাঁড়াইল। যে কঠিন আবরণের কথা বলিয়াছি, তাহা কিন্তু মৃত্তিকা নহে, তখনও মৃত্তিকার জন্ম হয় নাই ; পর্ব্বতের ন্যায় একটা কঠিন আবরণ মাত্র। সুতরাং তখন পৃথিবীতে কেবল জল ও পর্ব্বত, পর্ব্বত ও জল। ভূতত্ত্ববিদেরা এই কঠিন আবরণকে "আদি শৈল" নাম দিয়াছেন। এই আদি শৈলের অধিকাংশই মাটি হইয়া গিয়াছে কিন্তু এক আদি শৈল হইতেই মৃত্তিকার জন্ম হয় নাই, তাহা পরে বলিব। আদি শৈল হইতে মৃত্তিকার জন্ম হইয়াছে, আবার কালবশে মাটি হইতে আবার পাহাড় হইয়াছে, আবার এই পাহাড়ের মধ্যেও কতক আবার মাটি হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতময় দেশে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, মাটি কেমন করিয়া পাথর হয়, আবার পাথর কেমন করিয়া মাটি হয়।

আদি শৈল হইতে মৃত্তিকা হইল, তাহাতে ক্রমে উদ্ভিদের জন্ম হইল ; কিন্তু সে সময়ের উদ্ভিদের সহিত এখনকার ফল ফুলে শোভিত বৃক্ষলতার কোন সাদৃশ্য নাই ; এখন আর তাহা পাওয়া যায় না ; তবে ভূতত্ত্ববিদেরা অনুসন্ধান করিয়া তাহারও আকার জানিতে পারিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রাণীর চিহ্ন নাই। ক্রমে জীবন বিশিষ্ট প্রাণীর জন্ম হইল ; কিন্তু এখন যে সমস্ত জীবিত প্রাণী—যে সকল জীবজন্তু দেখিতেছ, এ প্রকার প্রাণী তখন ছিল না। কারণ পৃথিবীর তখনকার অবস্থায় এখনকার জীব বাস করিতে পারিত না ; সেই সময়ের উপযোগী

জীবের তখন সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি পৃথিবীর অবস্থার প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন হইতেছে ; ক্রমে সে সকল জীব জন্তুর মৃত্যু হইল। এই জীব জন্তুর দেহও সেই সময়ের উদ্ভিদে মিলিত হইয়া মাটির স্তর নির্ম্মিত হইল। এই নূতন রকমের মাটিতে আবার নূতন প্রকারের গাছ পালা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, নূতন প্রকারের জীব পৃথিবীতে দেখা দিল। এইরূপে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও নানা জাতীয় জীবের দেহ আদিশৈলের সহিত লক্ষ লক্ষ শতাব্দী ধরিয়া মিশ্রিত হইয়া এখনকার মৃত্তিকার জন্ম হইয়াছে এবং মানুষ ও এখনকার অন্যান্য জীব জন্তুর বাসের উপযোগী হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসকে চারি যুগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম মৎস্যযুগ, কারণ তখন কেবল চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ। আমাদের পুরাণেও কথিত আছে যে বিষ্ণু এই যুগে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয়যুগ সরীসৃপ প্রধান, এই যুগে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া মৎস্য অপেক্ষা সরীসৃপেরই অধিক বাসের উপযোগী হইয়াছিল ; এই সময়ের সরীসৃপ

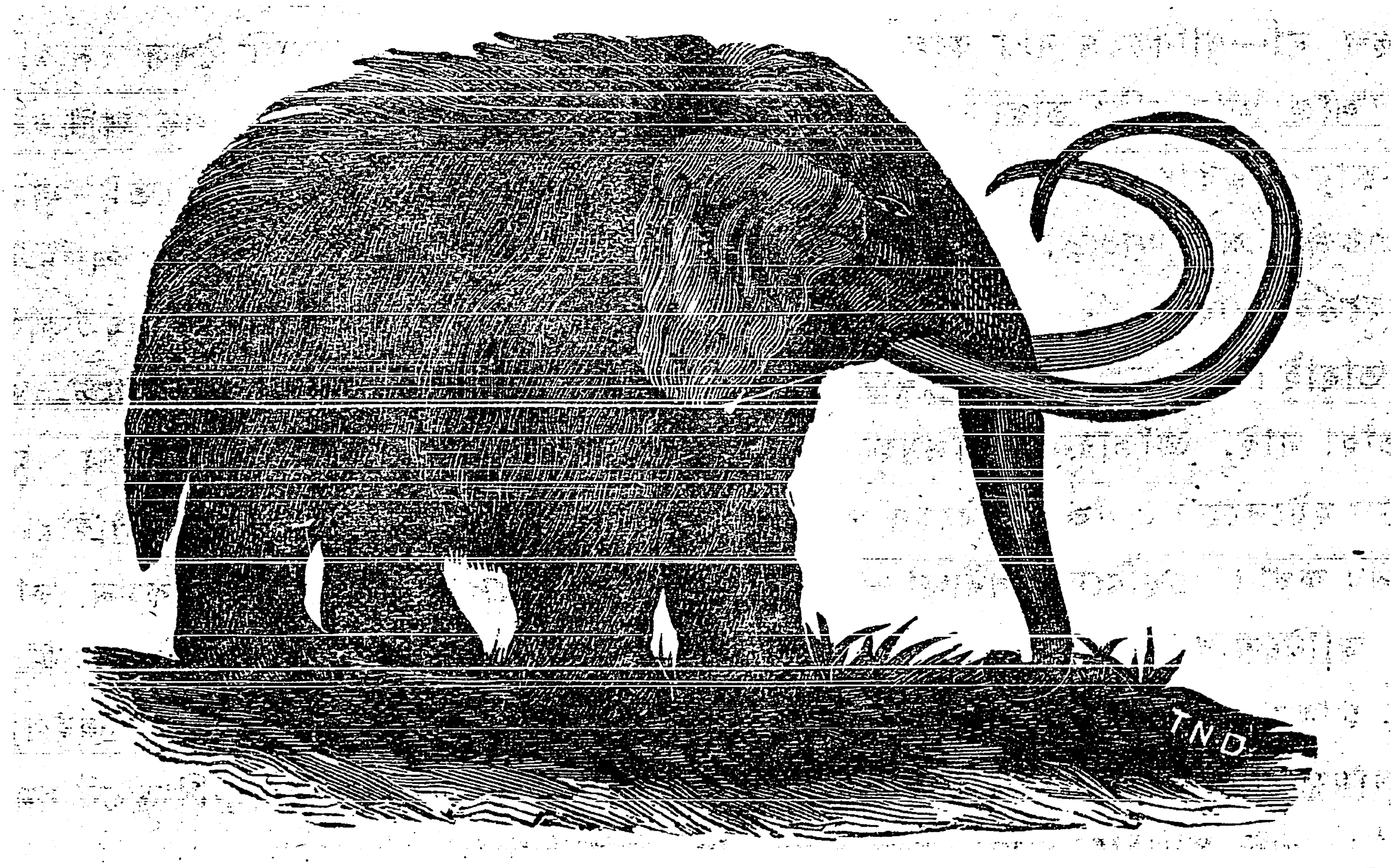

অতি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত আকারের। পুরাণে এযুগে বিষ্ণুর কূর্ম্ম অবতার লিখিত আছে। কূর্ম্ম সরীসৃপ জাতীয়। তারপর তৃতীয়যুগে স্তন্যপায়ী ও স্থূলচর্ম্ম বিশিষ্ট জীবই প্রধান ; যেমন হস্তী, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি। কিন্তু সে সময়ের হস্তী, মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি, এখনকার হস্তী প্রভৃতির মত ছিল না ; তাহার আকার অতি প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত ছিল। এই যুগে মামথের সৃষ্টি হয় (ছবি দেখ), আমরা সেই মামথের কথাই বলিতে এতগুলি কথা বলিলাম। পণ্ডিতেরা সর্ব্বশেষ যুগকে, মনুষ্যযুগ, বলিয়াছেন, কারণ পৃথিবীর এখনকার অবস্থা মনুষ্যেরই বাসের বিশেষ উপযোগী এবং মনুষ্যই এখনকার প্রধান জীব। পৃথিবীর যে আর পরিবর্ত্তন হইবে না বা হইতেছে না, তাহা মনে করিও না। প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহার পর কি যুগ আসিবে, এবং তখন পৃথিবী কি প্রকার প্রাণীরই বা বাসস্থান হইবে—কে জানে ? পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ক্রমে পৃথিবীবাসী

জীবেরও পরিবর্ত্তন হইবে ; তখন হয়ত কিম্ভুত কিমাকার একপ্রকার প্রাণী পৃথিবীর প্রধান জীব হইবে। মানুষ হয়ত তখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

মামথের বিষয় লিখিতে গিয়া আমরা অনেক অন্য কথা বলিলাম। এবার আমরা মামথের বিষয় আর কিছু বলিব না—আগামী বারে যাহা হয় বলিব। এবারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও পাঠক পাঠিকাদিগের উপকারে আসিবে এই মনে করিয়াই বলিলাম।

ক্রমশঃ।

কৃপণ।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে রসিক কৃষ্ণ দত্ত নামে এক জন লোক বাস করিতেন। এ বহু দিনের কথা। তাঁহার অবস্থা অতি হীন ছিল, এমন কি দুই বেলা আহারের সংস্থানও হইত না। চাকুরীর কোন প্রকার সুবিধা করিতে না পারিয়া এইরূপ কষ্টে কিছু দিন কাটাইয়া রসিক কৃষ্ণ সেই গ্রামের এক জন মহাজনের নিকট হইতে ১০৲ দশ টাকা ধার করিলেন ও গ্রামে একটি ছোট মনোহারীর দোকান দিলেন।

রসিক কৃষ্ণের যত্নে এবং পরিশ্রমে দোকানের উন্নতি দিন দিন দেখা দিতে লাগিল। এই সামান্য দোকান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কলিকাতার বড় বাজারে স্থানান্তরিত হইল। শেষে গঙ্গার পারে একটী বড় বাড়ীতে যাঁহারা এই দোকান দেখিয়াছেন তাঁহারাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এত সামান্য অবস্থা হইতে এতদূর উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, এই দোকানের অবস্থা দেখিয়াও অনেকেই বিশ্বাস করিতেন না। রসিক কৃষ্ণ এখন এক জন বড় লোক। তাঁহার আপীসে, ৫০। ৬০ জন কেরাণী খাটিতেছে; দরজার সাম্‌নে ২ জন দারওয়ান বসিয়া আছে, আপীস ঘরে অনবরত পাখা চলিতেছে। দশ টাকা মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিয়া এখন প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূলধন হইয়াছে। মাসে প্রায় ৩। ৪০০০৲ টাকা আয় হইতেছে। এক দিকে তিনি যেমন এত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন অন্যদিকে তিনি আবার ঠিক এত টাকা পরের দুঃখ মোচনের জন্য খরচও করিতে লাগিলেন। যদিও এখন তিনি ফিটনে চড়িয়া আপীসে যান, ও আপীস হইতে চেরিয়াট হাকাইয়া বাড়ী যান তথাপি তাঁহার মনে কোনরূপ অহঙ্কার হয় নাই। ছেলে বেলায় তিনি যেরূপ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন সেই কষ্ট এখনও তাহার মনে রহিয়াছে।

বাড়ীতে ৪০। ৫০ জন গরীব ছেলে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গরীব দুঃখী বাড়ীতে আসিলে নিজে থাকিয়া তাহাদের যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া কাপড় পরাইয়া বাড়ী হইতে বিদায় দিতেন। নিজ গ্রামে একটী ফ্রি এণ্ট্রান্স স্কুল এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিলেন। এই দুইটীতে মাসে প্রায় ৪০০। ৫০০৲ টাকা অকাতরে দিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গরীব ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষা ও গ্রামস্থ লোকদের বিনামূল্যে ব্যারাম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন অপর দিকে যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে

মতি থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গ্রামে ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য একটী দেব-মন্দির সংস্থাপন করিয়া দিলেন। নিজ বাড়ীতে গ্রামের লোক সহ মিলিত হইয়া বার মাস ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতেন। এই সমুদায় গুণে রসিক কৃষ্ণ গ্রামে সকলের পিতৃ তুল্য হইলেন। তাঁহার এক মাত্র ছেলে রামদাস বাবু এম, এ, পাশ দিয়াছেন। রামদাস বাবুর পাশ হইবার কিছু দিন পরেই সকলকে কান্দাইয়া রসিক বাবু বৃদ্ধ বয়সে এই সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রামদাস বাবু একেলে লোক। তাঁহার কারবার করা ছোট লোকের কাজ বলিয়া মনে হইল। তিনি উপযুক্ত লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তাঁহার চাকুরী করাই কর্ত্তব্য, তাঁহার পিতা লেখা পড়া শিখেন নাই, কাজেই তিনি দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পিতার সমুদায় দোকান পত্র Mackenzie, Lyall & Co. মেকেঞ্জী লায়েল কোম্পানি নিলাম ওয়ালার দ্বারা বিক্রী করিয়া ফেলিলেন। বিক্রী করিয়া যে টাকা পাইলেন তাহাদ্বারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলেন। গ্রামের ফ্রি স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় উঠাইয়া দিলেন। দেব-মন্দিরের মাসিক আর্থিক সাহায্য বন্দ করিয়া দিলেন। যে সমুদায় নিঃস্ব গরীব সন্তান তাঁহার পিতার দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইতেছিল তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। রামদাস বাবু এইরূপে সমুদায় খরচ কমাইয়া নিজে সাহেবদের খোসামুদ করিয়া একটী ডিপুটীগিরি পাইলেন। যাঁহার পিতার আপীসে কত সাহেব, বাঙ্গালী চাকর হইবার জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাঁহারই ছেলে আজ নিজ বুদ্ধি-গুণে পরের নিকট চাকুরীর জন্য উমেদার। নিজের নামে যে কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছেন তাহার বার্ষিক সুদ ৮০০০৲ টাকা তত্রাচ চাকুরীর প্রার্থী। চাকুরী না করিলে মান থাকে না; এই জন্যই রামদাস বাবু কারবার তুলিয়া দিয়া চাকুরী লইলেন। মাহিয়ানা ৪০০৲ পর্য্যন্ত হইল। ৪০০৲ মাহিয়ানা হইল, ৪০৲ টাকা মাসিক খরচের বরাদ্দ করিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্কে মাসে মাসে জমাইতে লাগিলেন।

একমাত্র বিধবা ভগ্নী ছেলেপেলে লইয়া নিজ বাড়ীতে না খেতে পেয়ে মরিতেছেন, গুণবান দাদার সে দিকে মাত্র দৃষ্টি নাই। কেহ এ কথা উত্থাপন করিলে তাহার উপর খড়্গহস্ত হন, বলেন "আমি কোথায় টাকা পাইব? যাহারা গরীব তাহারা গরীব ভাবেই থাকিবে, তাহাদের বেশী আশা করা অন্যায়।" যে পিতার প্রসাদে তিনি আজ এত বড় বিষয়ের অধিকারী, যাহার জন্য তিনি আজ ৮০০০৲ টাকা বার্ষিক সুদ পাইতেছেন, তাহারই নাম একবারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। দুই পয়সা খরচ হইবে এই ভয়েই তিনি বার্ষিক শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত করেন না। গ্রামের লোকের উপরও ভারী চটা—গ্রামের লোকের নাম শুনিলেই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠেন। রাগের কারণ এই যে, গ্রামস্থ লোক তাঁহার নিকট হইতে স্কুল ও চিকিৎসালয় এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য সময়ে সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করে!

স্কুল ও চিকিৎসালয়ের চাঁদার জন্য কতিপয় উৎসাহী যুবক একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়াতে তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন "স্কুলে টাকা দেওয়া অপব্যয়; কেন না দেশে স্কুল থাকিলে যত ছোট লোক লেখা পড়া শিখিয়া তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা

প্রদর্শন করিবে এবং এই জন্যই শেষে জিনিষ পত্র সমুদায় মহার্ঘ্য হইয়া উঠিবে। এখন যে চাউল /৫ করিয়া সের কিনিতেছি তখন তাহা ৵০ করিয়া সের কিনিতে হইবে। সুতরাং যে কার্য্যে ভবিষ্যতে ঠকিতে হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।'' আর একদিন কথায় কথায় বলিলেন যে "খাওয়া দাওয়ার জন্য, শরীর পুষ্টির জন্য বেশী পয়সা খরচ করা মূর্খের কাজ; কেন না ছয় মাস কি ১ বৎসর খাইয়া যে টুকু তোমার শরীর পুষ্ট হইবে ২ দিন জ্বরে ভুগিলেই আবার যেরূপ ছিলে সেই হইবে। সুতরাং এত টাকা যে খরচ হইল তাহার কিছুই উপকার হইল না। অপর পক্ষে এই টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা করিয়া কোম্পানির কাগজ করিলে মাসিক কিছু আয় হইত।" একবার একমাত্র পুত্রের ওলাউঠা ব্যারামের সংবাদ টেলিগ্রাফে পাইয়া চাকুরী-স্থান হইতে পুত্রকে দেখিবার জন্য গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পুত্রের অবস্থা বড়ই খারাপ, তত্রাচ বিনা পয়সার চিকিৎসারই ব্যবস্থা হইল। হুগলী হইতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করিবার কল্পনাও করিলেন না। দুই এক জন এ বিষয়ে পরামর্শ দিলে তিনি বলিলেন "বাঁচা মরা পরমেশ্বরের হাত। অদৃষ্টে থাকিলে বাঁচিবে আর তাহা না থাকিলে নিশ্চয়ই মরিবে, এজন্য অনর্থক ডাক্তারকে এত পয়সা দেওয়া অপব্যয়"। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সে বার পুত্র ব্যারাম হইতে উদ্ধার হইল। রামদাস বাবু গ্রামের লোকের উপর ভারী চটা, দুই চারি বৎসর অন্তর নিজ গ্রামে যাইতেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত মিল নাই। বাড়ী গিয়া নিজের জিনিষ পত্র সমুদায় গুছাইয়া আহারাদি করিতে অনেক খরচ পড়ে এই জন্য পরের বাড়ীতে কোন বেলা শুধু চা'ল এবং কাচকলা পাঠাইয়া দিয়া বলিতেন যে "কাচকলা ভাতে ভাত হইলেই আমাদের চলিবে"; আর কোন দিন বা চা'ল এবং কিছু ডা'ল পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইতেন যে "শুধু ভাত ও ডা'ল হইলেই চলিবে" এইরূপ ১২ দিন কাটাইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইতেন। ॥৵০ হাতে হইলেই আর।৵০ কর্জ্জ করিয়া ১৲ পুরাইয়া ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখেন। একটী পয়সাও বিনা সুদে পড়িয়া থাকিবার যো নাই। শরীরকে এইরূপে কষ্ট দিতে দিতে এবং চাকুরী স্থানের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির দরুণ তাঁহার যক্ষ্মা রোগের সূচনা হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ব্যারাম শক্ত হইয়া উঠিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি মাহিয়ানার টাকার মমতা ছাড়িতে পারিলেন না। চাকুরী করিতে লাগিলেন। ব্যারামের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ লইলেন না। ডাক্তারের ভিজিট দিতে হইবে এই ভয়ে ডাক্তার ডাকিলেনও না। দেখিতে দেখিতে তিনি সকলকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মরিবার সময়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া মরিলেন। রামদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রও পিতার মত টাকা সঞ্চয়করিতে লাগিল।

এই কৃপণের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া আমরা যদি বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করি তবে বুঝিতে পারি যে, বঙ্গদেশে এইরূপ বোকা রামদাসের সংখ্যাই বেশী। কেহ বা কিছু বেশী কেহ বা কিছু কম রকমের। যে কিছু টাকা ঘরে থাকিবে তাহা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিবার অথবা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিবার এবং পরের গোলামী করার ইচ্ছা অধিকাংশ লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

কি কুক্ষণে যে কোম্পানির কাগজ সৃষ্টি হইল তাহা আর বলা যায় না। ইহার সুদের উপরই

সকলের ঝোঁক। ইংরাজেরা নিজ দেশ হইতে এক ছড়ি হাতে করিয়া আসিয়া এখানে সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন দিলেন যে "আমি অমুক ব্যবসা করিবার জন্য একটা হাউস খুলিব, ১০০০,০০০ মূলধন চাই" অমনি ১০।১৫ জন যাইয়া তাঁহাকে টাকা দিবার জন্য প্রার্থী হইলেন।

সাহেব বিনা কষ্টে টাকা পাইয়া ব্যবসার খুলিয়া দিলেন, চৌরঙ্গীতে ৪০০।৫০০৲ টাকার ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাসা করিলেন, প্রকাণ্ড বাড়ীতে অপীস করিলেন, ২০০।৩০০ কেরাণী রাখিলেন, গাড়ী ঘোড়া করিলেন। সমুদায়ই পরের টাকা দিয়া। ক্রমে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া শেষে ১০।১৫ লক্ষ টাকা লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। এইরূপই এখানের অবস্থা। বাঙ্গালী বাবু টাকা দেন, সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেন, আপীসের লেখা পড়ার কাজ করেন আর সাহেবেরা মজা করিয়া লাভের সমুদায় টাকা গুলি লইয়া যান। যাহার টাকা সে বাবুটীর ছেঁড়া ইজের এবং চাপকান আর ঠনঠনীর কম্প জুতা কিন্তু ঘুচিল না। বাড়ী হইতে দুই প্রহরের রৌদ্রের সময়ে হাঁটিয়া আপীসে যাওয়া এবং সন্ধ্যার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসা ইহারও কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না।

এখানকার বড় বড় দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষেরা সময়ে সময়ে ছোট লাট ও বড় লাট সাহেবের মন্ত্রী সভার সভ্য, মিউনিসিপালিটীর কমিসনর ও পোর্ট কমিসনর হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া দোকান করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতেছে আর আইন সভার সভ্য হইয়া আবার আমাদেরই শাসন করিবার জন্য আইন করিতেছে। আমাদের দেশের এই অবস্থা!

পথের ছবি।

নরেন্দ্রপুর গ্রামের পথ।

যাদব, মাধব ও নিতাই।

মাধব। কিহে যাদব এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথা চলেছ?

যাদব। আরে তুমি ঘুমিয়ে থাক না কি; আজ যে নরেন্দ্রপুরের মেলা, তা কি তুমি জান না?

মাধব। ওহো, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম; নিতাই, তুমিও কি মেলা দেখ্‌বে না কি?

নিতাই। হ্যাঁ ভাই, বছরের একটা দেখ্‌বার জিনিষ, দেখে রাখি।

(দিগম্বর বাবুর প্রবেশ।)

মাধব। তাইত, একবার গিয়ে দেখে এলেও হয়। (দিগম্বর বাবুর প্রতি) মশাইও কি মেলায় যাচ্চেন?

দিগ। কোথায় মেলা, কিসের মেলা?

মাধব। এই যে মাঘী-পূর্ণীমায় নরেন্দ্রপুরে মস্ত মেলা হয়, তা কি মশাই জানেন না? আমরা যাচ্ছি, মশাই যাবেন কি?

দিগ। মেলায় গিয়ে কি হবে?

যাদ, মাধ, নিতা। কি হবে কি মশাই? দেখ্‌তে যাব; এ অঞ্চলে এত বড় মস্ত মেলা আর কোথাও হয় না।

দিগ। মেলায় আর কি দেখ্‌বে?

নিতাই। কত যায়গার কত লোক আস্‌বে—

দিগ। (নিতাইকে বাধা দিয়া) লোকের আর একটা কি দেখ্‌বো। যেমন তুমি আমি, এমনি তর দুশ পাঁচশ, না হয় দুই হাজার লোকই আস্‌বে; তার আর একটা দেখ্‌বো কি?

যাদব। কত যয়গা থেকে কত নানা রকমের জিনিষ——

দিগ। (যাদবকে বাধা দিয়া) জিনিষেরই বা একটা কি দেখ্‌বে; রোজই, কত রকম জিনিষ দেখ্‌ছ, আজ আর তার একটা নূতন কি? মেলায় গিয়ে বৃথা আমোদ করা ও সময় নষ্ট করা অপেক্ষা আমাদের

আরও অনেক গুরুতর কাজ আছে। তোমরা যেতে পার, আমার সময়ের অনেক মূল্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিয়ালদহ ষ্টেশন।

বিনোদ ও তাহার পিতা রামহরি বাবু।

রামহরি। তাইত, এক আধ জন ভদ্র লোক পেলে তাকে না হয় বলে দিতাম, কখনও তুমি যাওনি, একেবারে একাকী কেমন করেই যাবে তাই ভাবছি।

বিনোদ। তা এত ভাবছেন কেন? ভয় আর কি; কত লোক ত যাচ্চে, আমি আর যেতে পার্‌বো না?

(দিগম্বর বাবুর প্রবেশ।)

রামহরি। (দিগম্বর বাবুকে দেখিয়া) ভাল হ'ল, আপনি কোথা যাবেন?

দিগ। কেন, কি প্রয়োজন?

রামহরি। প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়, তবে এই আমার ছেলেটী এই নূতন দারজিলিং যাচ্ছে, আর কখনও যায়নি, তাই আমি দেখ্‌ছিলাম, আর কেহ যদি যান, তবে তাঁকে একটু বলে দি, তিনি একে একটু দেখেন।

দিগ। দারজিলিং কেন? কোন কার্য্য উপলক্ষে?

রামহরি। না কাজকর্ম্ম কিছুই নয়। অনেক দিন থেকে পাহাড় দেখ্‌বে বলে আমাকে বড় ধরেছে, আর শরীরও ওর একটু খারাপ আছে; তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাজ কর্ম্ম কিছু নয়।

দিগ। পাহাড়ের আর একটা দেখ্‌বে কি?

বিনোদ। কেন, পাহাড়ের শোভা?

দিগ। পাহাড়ের আর একটা শোভা কি, স্তূপাকার পাথর বইত ও আর কিছু নয়? পাথর ত দেখেছ, তবে পাহাড় দেখা হয়েছে; পাহাড়ের আর বেশী একটা কি দেখ্‌বে?

বিনোদ। শুনেছি পাহাড়ের একটা কেমন গম্ভীর ভাব আছে, পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিরের উপর কিরণ প'ড়ে শুনেছি বড় শোভা হয়; পর্ব্বতের গায়ে ঝর ঝর করে যখন ঝরনা বহিতে থাকে, আর সেই ঝরনার জলে যখন ঊষার বরণ, চাঁদের কিরণ পড়ে তখনও বড় সুন্দর দেখায়। তাই একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি।

দিগ। (রামহরির প্রতি) মহাশয় আপনি অতি অন্যায় কার্য্য কচ্ছেন। দেখ্‌ছেন না যে আপনার পুত্রের সর্ব্বনাশ হচ্ছে? আপনি এখনও সাবধান হউন। একে কখনও আপনি দারজিলিং যেতে দিবেন না। দারজিলিং না দেখেই এর এতদূর হয়েছে, দেখ্‌লে কি কর্‌বে জানি না। এ প্রকার কল্পনা-প্রিয় হয়ে পড়লে এর দ্বারা কোন কাজই হবে না। কল্পনার রাজ্যে বেড়ান অপেক্ষা আমাদের আরও গুরুতর কাজ আছে। আমি—

এমন সময়, সময় হওয়াতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল, দিগম্বর বাবুর বক্তৃতা স্রোত হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, তাঁর চমক ভাঙ্গিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন

"তাইত গাড়ী যে ছেড়ে দিলে।"

দিগম্বর বাবু বারাকপুর যাইতেছিলেন, বক্তৃতা ও "গুরুতর কার্য্যে" ব্যস্ত থাকায় তিনি গাড়ী 'মিস্' করিলেন। বিনোদ এ কেলে ছেলে, সে আগেই গাড়ীতে উঠে গল। বার করে কথা বলিতেছিল, গাড়ী যখন হুস্ হুস্ করে প্ল্যাটফরম্ ছাড়িল, তখন সে দিগম্বর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "কল্পনার রাজ্যে তুমি বেড়াও, না আমি বেড়াই?" দিগম্বর বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

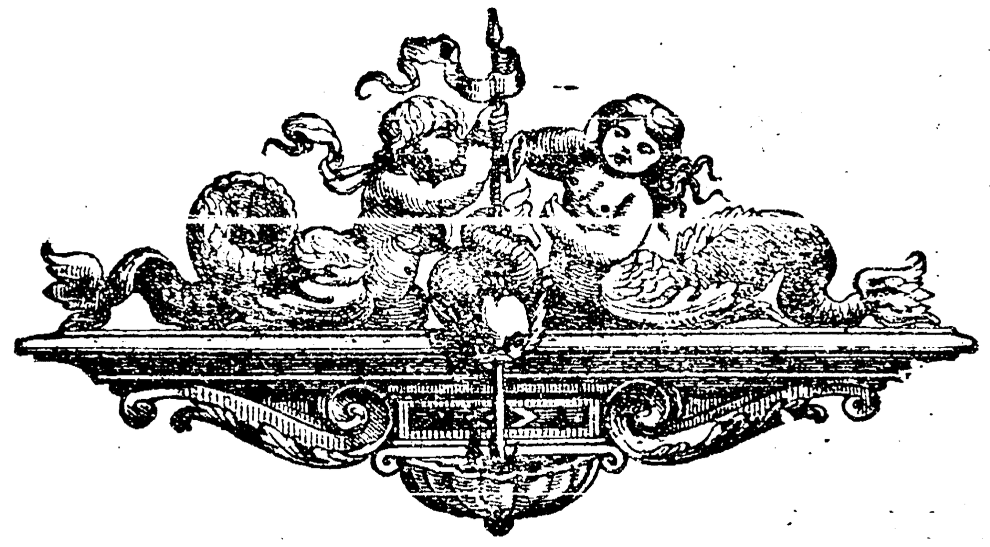

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। ষষ্ঠ সংখ্যা।
জুন, ১৮৮৮।

আদর্শ শিক্ষা।

অমল কৃষ্ণ মিত্র এবং কমলাকান্ত বসু—র বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন কলিতার কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। বালক দুটির মধ্যে বড়ই ভাব; আপন ভায়ে ভায়েও এমন সদ্ভাব এবং স্নেহ মমতা সচরাচর দেখা যায় না। ছেলে দুটির মধ্যে এইরূপ অকৃত্রিম ভাল-বাসা এবং সদ্ভাব দেখিয়া ইহাদিগের পিতা মাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, দুটিতেই একত্রে পড়া শুনা করে, একত্রে বেড়ায়, এবং একত্রে খেলা করে। এরূপ প্রায় দেখা যায় যে, ছেলেরা একবার বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে শিক্ষক-দিগের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অমল ও কমলের এখনও—র বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। অবসর পাইলেই ইহারা—র আসিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত দেখা করে এবং অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিয়া বাড়ী যায়। কেবল যে ছেলে দুটিই শিক্ষক মহাশয়ের কাছে আইসে তাহা নয়। শিক্ষক মহাশয়ও প্রায় মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়ে ছেলে দুটিকে দেখিয়া আইসেন। কখন কখন শিক্ষক মহাশয় অমল ও কমলকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যান এবং এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার গল্প করেন। গল্প বটে, কিন্তু বড় কাযের গল্প, পরে জানিতে পারিবে। বস্তুতঃ বালক দুটি শিক্ষক মহাশয়ের বড়ই বাধ্য, তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোন কায করে না, এদিকে শিক্ষক মহাশয়ও অমল ও কমলকে যথেষ্ট ভাল বাসেন ও যত্ন করেন; তাহারা সৎ-শিক্ষা পায়, সচ্চরিত্র হয়, এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে এই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। যাহাতে বালকেরা এক সঙ্গে শিক্ষা এবং আমোদ পায় এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান।

বিগত গ্রীষ্ম অবকাশের সময় বালক দুটিকে সঙ্গে লইয়া এক দিন তিনি শিবপুর বটানিক গার্ডেনে (Botanical garden) যান, এবং প্রায় সমস্ত দিন সেখানে কাটাইয়া পাঁচটার সময় ফিরিয়া আইসেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিক্ষক মহাশয় বালক দুটির সঙ্গে নানা প্রকার গল্প করেন এবং সে সকল বড় কাযের গল্প; আর বাস্তবিক সে গুলি কত কাজের গল্প তাহা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

অ। আহা কি সুন্দর ঘাট, কেমন পরিষ্কার!

পণ্ডিত মহাশয় আসুন আমরা এই বাঁশতলায় কিছু কাল ব'সে বিশ্রাম করি এবং নদীর শোভা দেখি।

ক। অমল তুমি এর মধ্যেই কি ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছ, এই না বল্‌ছিলে সমস্ত দিন বেড়াবে, চারিদিক ঘুরে দেখ্‌বে, আর সন্ধ্যা না হ'লে বাড়ী ফির্‌বে না?

অ। আমি ক্লান্ত হই নাই; নদীর শোভা দেখে বড় মুগ্ধ হয়েছি তাই এখান থেকে যেতে মন হচ্ছে না। দেখ অল্প অল্প বাতাসে নদীর বুকের উপর কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ উঠ্‌ছে, আর ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলে কেমন নেচে নেচে চল্‌ছে। দেখ দেখ কি সুন্দর দৃশ্য! কলিকাতার দিকে এক বার চেয়ে দেখ, জাহাজের শত শত মাস্তলগুলি কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি।

ক। (কয়েকটি পাতা লইয়া) পণ্ডিত মহাশয়, কেমন সুন্দর পাতা দেখুন; এমন পাতা আর কখন দেখি নি।

প। কমল, বড় অন্যায় কায করেছ; পাতাগুলি ছেঁড়া উচিত হয় নি।

ক। কেন পণ্ডিত মহাশয়, বলুন না কেন অন্যায় হয়েছে? এই কটি পাতা ছেঁড়াতে গাছটি কি ম'রে যাবে?

প। বাগানের নিয়ম বিরুদ্ধ কায হয়েছে। গেটের দুই দিকে বড় বড় অক্ষরে কি লেখা আছে পড়িয়া দেখ। অমল এবং কমল তাড়াতাড়ি পড়িতে গেল।

প। পড়া হয়েছে, এখন কি বুঝ্‌তে পেরেছ কেন অন্যায় হয়েছে?

অ, ক। হ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় পেরেছি।

প। তোমরা এইখানে একটু অপেক্ষা কর আমি আস্‌ছি।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এত পাতা কোথা পেলেন আমাকে দিন না।

ক। আমাকে দিন না।

প। (পাতাগুলি ভাগ করিয়া দুজনের হাতে দিয়ে) আমি এই বাগানের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিবার অনুমতি লইতে গিয়াছিলাম। তিনি আমার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া অতি আগ্রহের সহিত একজন সর্দ্দারকে কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক ঐ বাগানের অধ্যক্ষ এক জন হৃদয়বান লোক, এদেশের ছাত্রেরা উদ্ভিদ বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করে এটি তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। তিনি অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এক শত বৎসর অতীত হইল এই বাগান স্থাপিত হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক হইতে উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন দেশীয় লোকও উদ্ভিদ বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিল না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এখন চলুন বাগানের ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখি, ক্রমে বেলা বেশি হইতেছে।

প। আমিও তাই বল্‌ছিলাম ত, চল।

ক। (যাইতে যাইতে) পণ্ডিত মহাশয় এই চারা-গুলি রৌদ্রে মরে যাচ্ছে, দেখুন কেমন শুকিয়ে উঠেছে; বোধ করি ইহারা যত্ন করে জল-টল দেয় না।

প। না কমল তা নয়, ইহাদের শুকাইবার সময় হয়েছে, ইহারা আর অধিক দিন বেঁচে থাক্‌তে পারে না। এক বৎসর এমন কি কয়েক মাসের মধ্যেই, এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সমস্ত কায শেষ হয়—বীজ হইতে চারা হয়, ফুল হয় এবং

ফুল হইতে আবার বীজ হয়। তোমরা ঐ চারাগুলির কাছে গিয়ে দেখ, হয়ত ঐ শুষ্ক ফুলগুলির মধ্যে বীজ দেখ্‌তে পাবে।

অ। হ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় তাই ত।

ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয় আপনি ঠিক বলেছেন। খুব ছোট ছোট হাজার হাজার বীজ রয়েছে।

প। এ শ্রেণীর চারা কি তোমরা আর কখন দেখনি?

ক। না, পণ্ডিত মহাশয়।

অ। আমি দেখেছি, আমাদের বাগানে প্রতি বৎসর শীতের পূর্ব্বে বাবা নানা রকমের চারা পোতেন, সেগুলিতে শীতের সময় কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল হয়, আবার এই সময়ে শুকিয়ে যায়।

ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয় মনে হয়েছে আমিও দেখেছি। আপনি সেবার কতকগুলি বীজ দিয়েছিলেন, আমি সেগুলি একটী গামলায় পুতে ছিলেম, দুই চা'র দিন পরে দেখি সেই বীজ থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বেরিয়েছে; ক্রমে সেই চারাগুলির সুন্দর সুন্দর ফুল ফুট্‌ল, ফুলগুলি যখন ঝ'রে গেল তখন চারাগুলিও ক্রমে শুকিয়ে গেল।

অ। সকল প্রকারের গাছ ত এরূপ শুকিয়ে যায় না, আমাদের বাগানে যে বড় বড় আম, কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ আছে তাহারা ত বরাবর বেঁচে থাকে।

প। হ্যাঁ তা ঠিক, আচ্ছা বল দেখি ইহা হইতে কি শিখ্‌লে।

ক। কি আর শিখ্‌ব।

অ। পণ্ডিত মহাশয় আমি বল্‌ব। কতকগুলি উদ্ভিদ অল্প কাল বাঁচে, আর কতকগুলি অধিক কাল বাঁচে।

প। বড় সন্তুষ্ট হলেম। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের মধ্যে যে নিয়ম, উদ্ভিদের মধ্যেও তাই। কোন কোন শ্রেণীর পশু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে যেমন হস্তী, গণ্ডার; কোন কোন পশু চৌদ্দ, পনের বৎসরের অধিক বাঁচে না, আবার এমন অনেক জীব আছে যাহারা এক দিনের বেশীও বাঁচে না। উদ্ভিদ দিগের মধ্যেও সেই নিয়ম। পৃথিবীর অনেক স্থলে এমন বৃক্ষ আছে যাহাদের দীর্ঘ জীবনের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই বাগানেই এমন অনেক গাছ আছে যাহাদের বয়স এখন এক শত বৎসরেরও অধিক। আবার কতকগুলি গাছ পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আমি জানি পেঁপে গাছ পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে ম'রে যায়।

অ। কলা গাছ একবার ফলেই মরে যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, জীব জন্তুর কথা বল্‌বার সময় "বেঁচে থাকে" "ম'রে যায়" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু গাছ পালার কথা বলতে ঐ সকল শব্দ কেন ব্যবহার করি? উদ্ভিদের সঙ্গে আর জীব জন্তুর সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধ নাই।

প। জীব জন্তু কাহাকে বলে বল দেখি।

ক। কেন? এই হাতী, ঘোড়া গরু, ছাগল প্রভৃতি সব জীব জন্তু।

প। তা ত বুঝ্‌লেম; কেন ইহাদিগকে জীব বলে তাই শুন্‌তে চাই।

ক। ইহারা ইচ্ছামত চ'লে বেড়াতে পারে।

প। তার পর।

ক। ইহারা আহার করে,

প। আর কি?

ক। আর কি, জানি না।

অ। কেন পণ্ডিত মহাশয় জীব জন্তুর ছানা হয়, ছানা গুলি ক্রমে বড় হয়।

প। এ সকল জীবনের লক্ষণ বটে ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অনেক আছে। যা'ক,এই কয়েকটিতেই আমাদের আপাততঃ কায হবে।

এই সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতেই বেলা দুইটা বাজিয়া যায়। দুইটার পর বাগানের কর্ম্মচারিরা আপন আপন কায কর্ম্ম করিতে লাগিল।

ক। পণ্ডিত মহাশয় ঐ গাছগুলির গোড়ায় গোবর আর পচা পাতার মত কি দিচ্ছে ; —কেন ?

অ। পণ্ডিত মহাশয় দেখুন, ঝর্ণায় ক'রে কেমন জল দিচ্ছে, আর জল পেয়ে গাছগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

প। তোমাদের ক্ষিদে পাই নি ? বেলা ত দুটা বেজে গিয়েছে।

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয় ক্ষিদে পেয়েছে।

প। তবে চল ঐ বট-গাছ তলায় বসে কিছুকাল বিশ্রাম করা যা'ক এবং সঙ্গে যাহা খাবার আছে তাহা আহার করা যা'ক।

বটতলায় সকলের উপবেশন।

প। আচ্ছা বল দেখি তোমরা যদি এখন কিছু না খাও কিম্বা কিছু না পান কর তা হ'লে কি হয়।

ক। কি আর হবে, আরও ক্ষিদে পায়।

প। তার পর।

অ। তার পর বোধ হয় কিছুকাল পরে আর চল্‌তে পারি না।

প। মনে কর দুই তিন দিন তোমাদিগকে যদি আহার কিম্বা জল না দিয়ে রাখা হয় তা হলে কি হয় ?

ক। বোধ হয় আর উঠ্‌তে পারি না।

প। এইরূপ কুড়ি পঁচিশ দিন যদি আহার কিম্বা পান করিতে না পাও তাহা হইলে মরিয়া যাও।

স্কুলের সেই মালিকে জরিমানা করার কথা মনে আছে ?

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয়, আছে, আপনি স্কুলের বাগানে কতকগুলি চারা গাছ লাগিয়েছিলেন, মালি মনোযোগ করে সে গুলিতে জল দেয় নি, চারাগুলি মরে গিয়েছিল।

প। ঐ চারাগুলি শুকিয়ে যাওয়ার কারণ কি বল দেখি।

ক। কেন, জল না পেয়ে শুকিয়েছিল।

প। তবে দেখ্‌তে পাচ্ছ আমরা জল না পান করতে পেলে, আহার না পেলে যেমন মরিয়া যাই উদ্ভিদ্ জাতিও তেমনি মরিয়া যায়।

অ। উদ্ভিদ্‌রা কি কেবল জলেই বাঁচে, আর কোন আহার তাদের আবশ্যক হয় না ?

প। হয় বই কি। উদ্ভিদের আহারের উপযুক্ত পদার্থ মাটিতে আছে, জলের সহিত সেই সকল পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। আহার দ্বারা যেরূপ মনুষ্য এবং অন্য অন্য জীব জন্তুর শরীর পুষ্ট হয় এই সকল পদার্থ দ্বারা সেইরূপ উদ্ভিদাদির শরীর পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়।

ক। গাছে জল দেওয়ার কি উপকার তা আমরা বুঝ্‌লেম কিন্তু ঐ গোবর এবং পাতা পচা কেন দিচ্ছে তা ত বল্লেন না।

প। জমিতে সার দেওয়ার কথা তোমরা কখন শুননি কি ?

অ। শুনেছি, পণ্ডিত মহাশয় শুনেছি।

ক। সার দেওয়ার কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নি।

প। ক্রমে রসায়ন এবং উদ্ভিদ বিদ্যা যত অধ্যয়ন করিবে ততই জানিতে পারিবে যে ঐ গোবর এবং পাতা পচার মধ্যে এমন সকল পদার্থ আছে যাহা দ্বারা উদ্ভিদদিগের জীবন রক্ষা হয়, উহারা ঐ সকল পদার্থ আপন শরীরে শোষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক। মাটিতেই ত ঐ সকল পদার্থ আছে, তবে কেন সার দেয়।

প। তোমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছ যে, ভাঁড়ার ঘরে অনেকগুলি খাবার দ্রব্য সঞ্চয় করা থাকে ; ঐ সকল দ্রব্য বাড়ীর লোকের আহারের জন্য প্রত্যহ খরচ হয় ; ক্রমে যখন ভাঁড়ার ঘরের জিনিষগুলি কমিয়া আসে কিম্বা একেবারে ফুরাইয়া যায় তখন আবার ঐ সকল জিনিষ খরিদ করিয়া আনিতে হয়। এখন মনে কর, জিনিষগুলি ফুরাইয়া গেল, কিন্তু আর নূতন কিছু খরিদ করা হইল না, ক্রমে ভাঁড়ার ঘর শূন্য হইয়া গেল, কোন দিক হইতে আহারের উপযুক্ত কোন দ্রব্য আসিবার সম্ভব নাই—এরূপ অবস্থায় কি হয় ?

অ,ক। আমরা কেহই খেতে পাইনে।

প। তার পর।

অ,ক। ক্রমে বেশি দিন এইরূপ চলিলে আহার অভাবে মরিয়া যাই।

প। এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ সার দেওয়ার কি উপকারিতা

অ। পণ্ডিত মহাশয় বেশ বুঝিয়াছি।

প। বল দেখি কি বুঝিয়াছ ?

অ। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে উদ্ভিদ্‌দিগের আহারের উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ থাকে। উদ্ভিদ্‌রা জমি হইতে সেই সকল পদার্থ ক্রমাগত চুষিতে চুষিতে অবশেষে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন আর তাহারা আহার পায় না যাবেই নূতন করিয়া এমন কোন পদার্থ দিতে হয় যাহা দ্বারা ঐ জমি পুনর্ব্বার উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

প। এখন তোমরা বুঝ্‌লে জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্ জাতিও আহার করে।

অ,ক। বেশ বুঝেছি।

ক। কৈ জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্‌দিগের ত ছানা টানা হয় না।

প। হয় বই কি।—র বিদ্যালয়ের চারিদিগে যে সকল কৃষ্ণ বাবলার গাছ আছে তাহাদের ইতিহাস মনে কর দেখি।

ক। আমরা যেবার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি সেবার শরতের বড় গাছতলা থেকে আমরা কতকগুলি কাল কাল বীজ কুড়াইয়া আনি ; দুই এক দিন পরে সে গুলিকে তিন চারিটা টবে বোনা হয়, দুই তিন দিন পরেই ঐ সকল বীজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বাহির হয়, চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চ বড় হইলে মালি সেগুলিকে তুলিয়া বেড়ার ধারে ধারে লাগিয়ে দেয়, এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ চারা হইতে কত বড় বড় গাছ হয়েছে।

প। পশু পক্ষীর মধ্যেও কি ঠিক এইরূপ দেখা যায় না ? ঐ বুলবুলি পাখী দুটির কথা মনে করে দেখ ; প্রথমতঃ ডিম পাড়িল, কিছু দিন পরে তিনটি ডিম হইতে তিনটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা বাহির হইল, ঐ ছানাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া এখন উড়িয়া গিয়াছে। যে সকল নিয়মে পাখীর ডিম হইতে ছানা বাহির হয় সেই সেই নিয়মে উদ্ভিদ্‌দিগের বীজ হইতে চারা নির্গত হয়। যে সকল নিয়মে পাখীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা ক্রমে বড় হয় সেই নিয়মেই চারা গাছ হইতে বড় বড় গাছ হয়।

অ। বড় মজাত, উদ্ভিদ্ শ্রেণীও তা হ'লে সজীব পদার্থ—

ভুলু বাবু ও তাঁহার বিড়াল।

আমাদের ভুলু বাবু বড় আব্দারে ছেলে। তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই তাঁহাকে দিতে হবে; না দিলে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে, বাড়ী দুয়ে থাক, পাড়া শুদ্ধ মাথায় করে, তুলেন। এই রকম যখন তাঁর জিদের ঝোঁক চড়ে তখন তার মা সহ্য করিতে না পারিয়া খুব প্রহার করেন, না হয় হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখেন, আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে দেন না। ইহাতে ভুলুবাবু অনেক সময়ে বেশ জব্দ হন, তবু কিন্তু তাঁর আব্দারে স্বভাব একবারে যায় না। যাহা করিলে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাঁহাকে বলিলে, বুঝাইলে বা তজ্জন্য শাসন করিলেও তাঁহার জিদ ছাড়েন না। কেমন যে বদ স্বভাব সে আর শুধরায় না।

এ ছাড়াও ভুলু বাবুর একটা গুণ ছিল, তিনি কাহাকেও না বলিয়া চুপে চাপে যেখানে যে খাবারটুকু পাইতেন অমনি মুখের ভিতর পুরিতেন। একদিন তার দিদিমা পূজার জন্য কলা সন্দেশ প্রভৃতি রাখিয়া অন্য ঘরে গিয়াছেন ইতিমধ্যে ভুলু বাবু সেই ঘরে আসিয়া সব নষ্ট করিয়া গেলেন। আর একদিন তার মা তার দিদিকে দুটো ভাল আম খাইতে দিয়াছিলেন সে তখন না খাইয়া সিন্দুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখে। খানিক পরে খাবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু ভুলু বাবুর নজর সব দিকে যায়, বিশেষতঃ খাবার দিকে। যেই তার দিদি একটু এদিক ওদিক গিয়াছে অমনি ভুলু বাবু আম দুটী সেখান হইতে সরাইয়া একটী উদরসাৎ করিলেন, আর একটী খাইতে না পারিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলেন। ভুলু বাবু এই ধরণের ছেলে। আমার বেশ মনে হচ্চে সে একদিন খুব জব্দ হয়েছিল। লোভ আর জিদ দুইএরই ফল পাইয়াছিল। সেদিন তার দিদিমা কাসন্দি তৈয়ার করিবেন বলিয়া এক ডালা সরিষা গুঁড়া করিয়া রাখিয়াছেন, ভুলু বাবু কি মনে করিয়া জানি না, বোধ হয় চিনি বা ছাতু মনে করিয়া, এক-মুঠো লইয়া গালে পুরিলেন। খুব ঝাল লাগিয়াছে, কাঁদিতেও পারিতেছে না, কাহাকেও বলিতেও পারিতেছে না। পাছে তাহার লোভের ফল ধরা পড়ে এই লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে এবিষয় কিছুই টের পাই নাই। আমি হঠাৎ দেখিতে পাইলাম ভুলু টবের কাছে গিয়া কেবলই মুখ ধুইতেছে আর জিব রগড়াইতেছে। তার পর সব জানিতে পারিলাম। যেমন লোভ তেমনি ফল।

সেই দিন রাত্রে তার বাবা চিম্‌নি দেওয়া ল্যাম্পের সম্মুখে পড়িতেছিলেন, ভুলু বাবুর জিদ হইল চিমনিটী লইবেন। তার মা তাকে কত বারণ করিলেন কত বুঝাইলেন যে, হাত পুড়িয়া যাইবে, তা বাবু জিদ ছাড়িবেন কেন, 'আমি চিমনি নেবো'—বলে চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। মার কাছে দু চার যা চড়ও খাইলেন, তবুও জিদ। তখন তার বাবা রাগিয়া বলিলেন 'আয় চিমনি নে এসে'। ভুলু বাবু যেই চিমনিতে হাত দিয়াছেন অমনি বড় গরম লাগিয়াছে আর তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লইলেন। তার বাবা ছাড়িলেন না, তিনি তার হাত টানিয়া লইয়া সেই আগুনের মত তপ্ত চিমনি ধরাইয়া দিয়া বলিলেন 'না তুই চিমনি নিবি,তোকে নিতেই হবে'।—ভুলু

বাবুর হাত পুড়িয়া গেল, হাতের সব আঙ্গুলগুলিতে ফোস্কা পড়িল, যন্ত্রণায় ভুলু বাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন। আহা! বেচারার হাত পুড়িয়া গিয়াছে তার দিদির বড় দয়া হইল সে তার স্কুলের প্রাইজে একটা খেলিবার ভেড়া পাইয়াছিল সেটা ভুলুকে দিল। ভুলু সেই খেলনা পাইয়া শান্ত হইলেন। সেই রাত্রে ভুলু আর কোন আব্দার করে নাই।

তার পরদিন সকাল বেলা ভুলু বাবু দেখেন যে তাঁহার বিশেষ প্রিয় সখের বিড়ালটী কাঠের বেড়ার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া ম্যাও, ম্যাও, করিতেছে আর তার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া

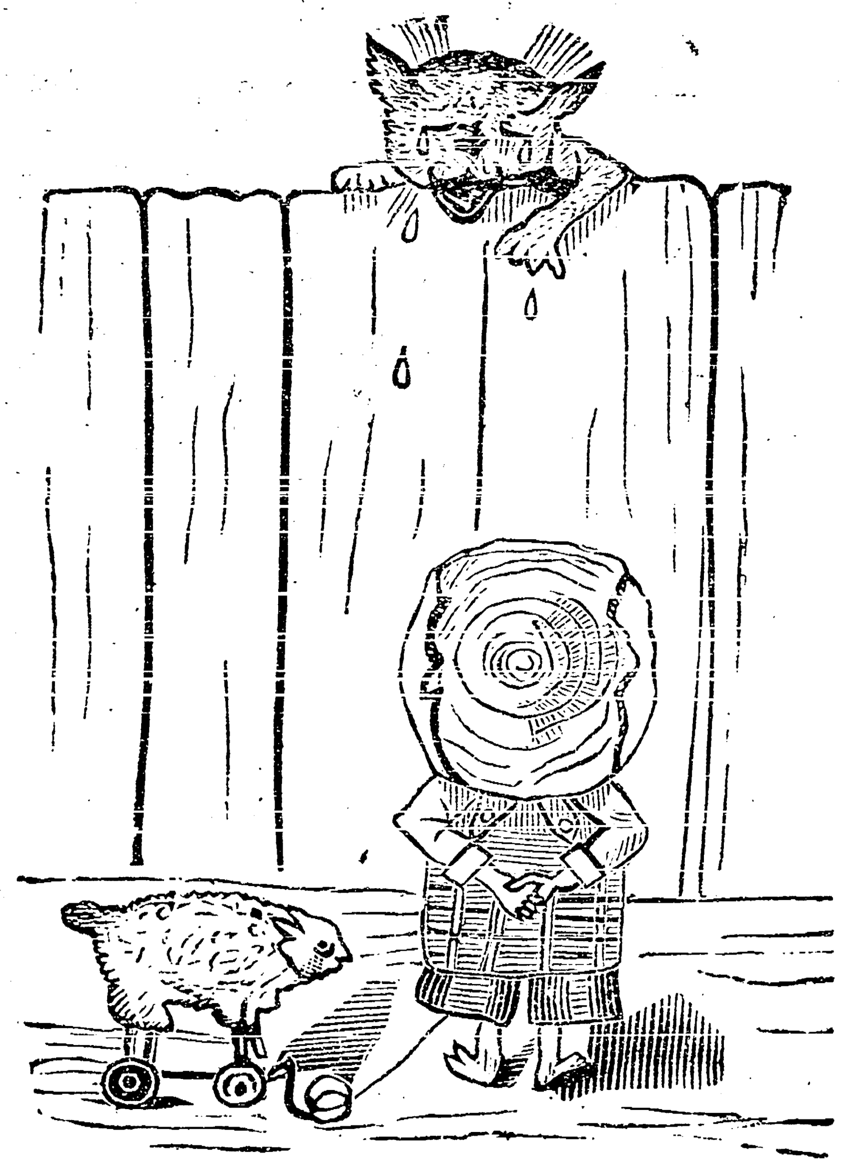

জল পড়িতেছে। বিড়ালটী ভুলু বাবুর নিজের। সেই বিড়ালের সঙ্গে তার বড় ভাব। যেমন লোক তার তেমনি বন্ধু। বিড়ালটীও ঠিক ভুলু বাবুর মত। বিড়াল দুধ মাছ চুরি করিয়া খায়। হাজার বার মার তবুও তার স্বভাব যায় না। খাইতে বসিলে পাতে মুখ দিতে আইসে, মারিয়া তাড়াইয়া দাও তবুও আসিবে। যেন জিদ্। আর যা খাবে একবার মনে করিয়াছে, তা সে না লইয়া ছাড়িবে না। আসে পাশে ঘুরিতে থাকে কত উপায় ফন্দি খোঁজে, সুবিধা পাইলেই লইয়া পলায়। ভুলু বাবু আজ কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছেন না বিড়ালটা কেন এত দুঃখিত! বিড়ালের কান্না দেখে ভুলুর কান্না আসিল, এমন কি সেই কাপড়ের ভেড়াটারও চোখ দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। অনেকক্ষণ পরে ভুলু বাবু বেড়ার ও পাশে গিয়া দেখিতে পাইলেন বিড়ালটা আজ কেন এত দুঃখিত। তখন তার কল্যকার ঘটনা

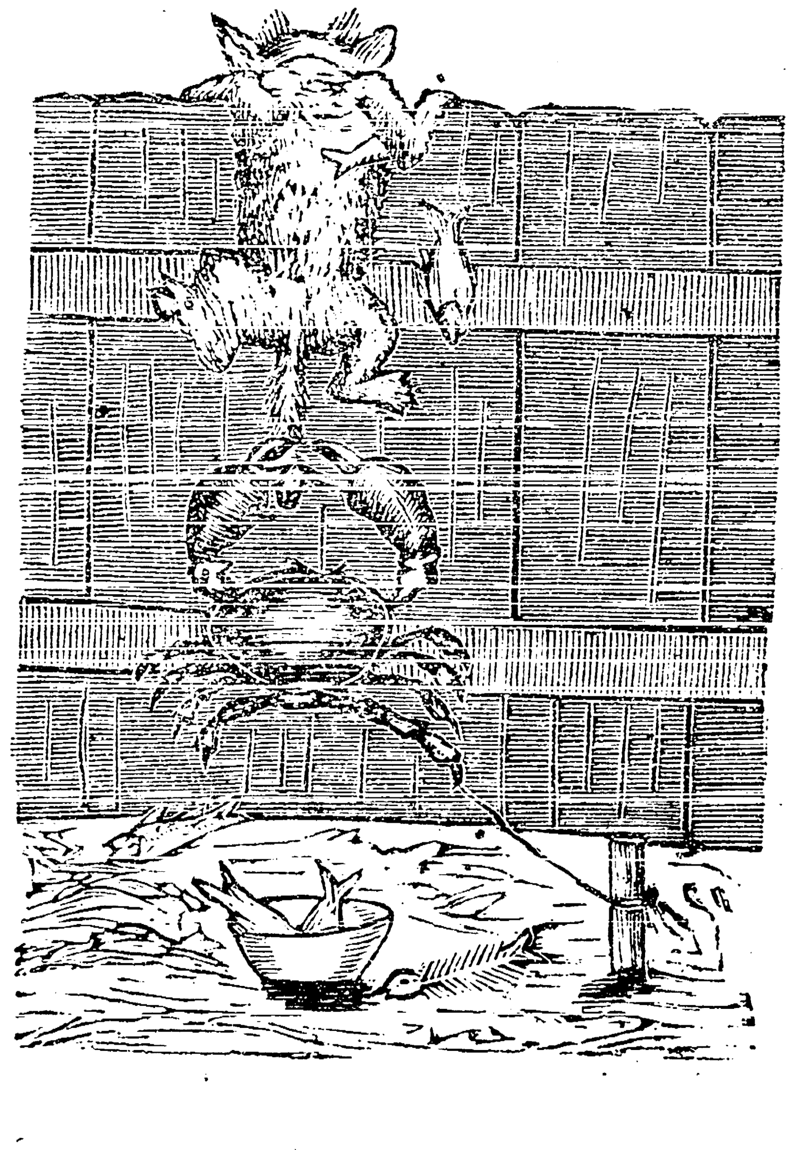

মনে পড়িল। আমি গিয়া দেখি তিনি আর তাঁর বিড়াল কি পরামর্শ করিতেছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গোপনীয় পরামর্শ চলিতেছিল। কি পরামর্শ হইতেছিল আমি তাহার কিছুই শুনিতে পাই নাই, তোমরা তাহা জানিবার জন্য অত উৎসুক হইও না। আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না।

আজ অনেক দিন পরে তার মার কাছে শুনিলাম ভুলুর বিড়াল সেই দিন হইতে আর কিছুই চুরি করিয়া খায় না, পাতেও মুখ দিতে আইসে না। আরও শুনিলাম, ভুলুর দিদিমা বলিলেন ভুলু সেই দিন হইতে বড় শান্ত হইয়াছে। এখন আর কোন উপদ্রব করে না, দিদিমার পূজার কলা সন্দেশ চুরি করে না, কাহারও নিকট হইতে না চাহিয়া লইয়া কিছু খায় না। তাহার জিদ্ এখন মোটেই নাই।

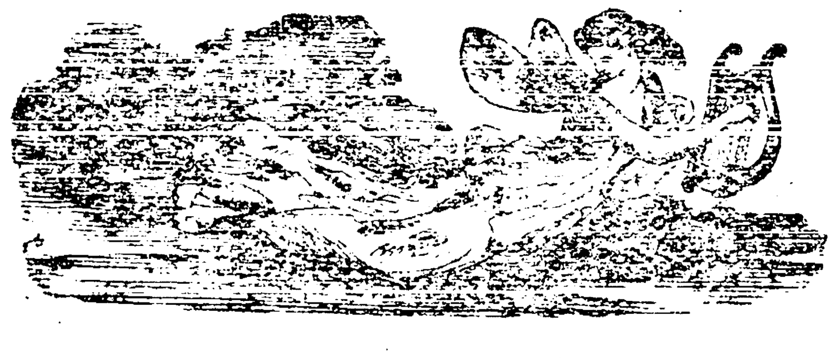

কোথায় গেল মা ?

কোথায় গেল মা ?
এই যে আকুল হ'রে
স্নেহ ভরে ছিল চেয়ে,
কখন সে আঁখি জ্যোতি কেমনে নিভিল,
অকস্মাৎ আঁখি মার কেন নিমিলিল ;
সেই যে মা চেয়ে ছিল
আর ত চাহিল না !
— কোথায় গেল মা ?

এই যে হাতটি ধ'রে
স্নেহভরে কাছে ডেকে,
মুখ খানি ধ'রে ধীরে কত কি বলিল মা,
সেই কথা কয়েছিল
আর ত কহিল না !
—কোথায় গেল মা ?

আকুল নয়নে তাঁর
দেখিলাম অশ্রুধার,
স্নেহ-মাখা মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া ;
কি ব্যথা হৃদয়ে আছে
শুধাইতে গেনু কাছে
শুধানও হল না !
—কোথায় গেল মা ?

এত স্নেহ এত মায়া
আজি সব শূন্য—ছায়া,
অনন্ত অজানা কোন দেশে চলে গেল,
কেন যে মা চলে গেল
তাও ব'লে গেল না !
—কোথায় গেল মা ?

বড় যে অনাথ হয়ে
ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
এত স্নেহ এত মায়া, সব কি ভুলেছে মা !
অনাথের অশ্রু হেরে
মা কি চাহিবেনা ফিরে,
আর কি মা আসিবে না !
—কোথায় গেল মা ?

কাছে ডেকে অতি ধীরে
স্নেহভরে বুকে করে
আকুল নয়নে, মুখ পানে চেয়েছিল ;
চেয়ে চেয়ে অবশেষে
বলিল—যাই মা !
—আর ত এল না !
মা আমার—মা আমার
আর কি আসিবে না ?
—কোথায় গেল মা ?

ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল।

(৫৫ পৃষ্ঠার পর।)

স্কুটারীর হাঁসপাতালের অবস্থা দিন দিন কি প্রকার ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল আমরা গত পূর্ব্ববারে তাহার কতক উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে হাঁসপাতালের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিরও অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠিল। রোগীদিগকে রীতিমত পথ্য পর্য্যন্ত দিবার উপায় ছিল না, এতভিন্ন বস্ত্রাদি এবং বিশেষতঃ সেবা শুশ্রূষার অভাবে শত শত রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। টাইমস্ নামক বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সংবাদদাতা লিখিলেন যে, এই শত শত আহত এবং রোগগ্রস্ত সৈনিকদিগকে যে ভাবে তাহাদিগের সঙ্গীগণ হাঁসপাতালে রাখিয়া যাইত, সেই ভাবেই তাহারা ভূমিতে পড়িয়া থাকিত ; ভূমিতল হইতে শয্যার উঠাইয়া রাখিবে এমন একখানি শয্যা ছিল না। ইহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন "the sick appear to be tended by the sick and the dynig by the dying." অর্থাৎ রোগীর সেবা রোগী করিতেছে এবং যে মৃতপ্রায় আর একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তি তাহার সেবা করিতেছে। বাস্তবিক এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

স্কন্ধহীন, পদহীন এবং নানাপ্রকারে আহত এবং রোগগ্রস্ত শত শত রোগীর আর্ত্তনাদে হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; সে যন্ত্রণার সেবা করিবার কেহ নাই ; তৃষ্ণায় একবিন্দু জল দিবে এমন কেহ নাই। যেমন একদিকে বস্ত্রাদি এবং ঔষধ পথ্যের অভাব, অন্যদিকে তেমনি শুশ্রূষার অভাব। অশেষ যাতনা পাইয়া শত শত ইংরাজ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা—এই নিদারুণ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর এই নিদারুণ সংবাদে ইংলণ্ডের লোক একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ; কি প্রকারে এই অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অসহায় সৈনিকদিগের রক্ষা হইবে, সকলেই তাহার জন্য আকুল, সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহারা রক্ষা পাইবে, তাহার একটা সৎপরামর্শ কেহই দিতে পারিলেন না।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হার্লিষ্ট্রীটের স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য চিন্তা ও দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নাইটীঙ্গেলের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজ সৈন্যের এই নিদারুণ দুর্দ্দশার সংবাদ নাইটীঙ্গেল এই সময় শুনিতে পাইলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ডে যে ভীষণ আন্দোলন উঠিয়াছিল, নাইটীঙ্গেলের শান্তিময় গৃহেও তাহা পৌঁছিল। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও এই নিদারুণ সংবাদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নাইটীঙ্গেল তাহা হন নাই। সমস্ত ইংলণ্ড যে সংবাদে আকুল হইয়াছিল, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল তাহাতে ধীর, স্থির, অবিচলিত ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া কি উপায়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নাইটীঙ্গেল দেখিলেন, তিনি নিজে অগ্রসর না হইলে, নিজে প্রাণ সমর্পণ না করিলে কিছুই হইবে না; তখন তিনি তাহার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। অন্যের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, শত শত আহত রোগগ্রস্থ সৈনিকের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে, তিনি কেমন করিয়া স্থির থাকিবেন? নাইটীঙ্গেল তখনকার সমর-সচিবের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি এই শত শত দুর্দ্দশাগ্রস্থ সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে দিন সমর-সচিবের নিকটে নাইটীঙ্গেল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই দিন সমর-সচিবও নাইটীঙ্গেলের নিকট তাঁহার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই এই সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, এ শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে অসহায় সৈনিকদিগের রক্ষা করিতে পারে, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল ভিন্ন ইংলণ্ডে তদুপযুক্ত লোক আর কেহ নাই। নাইটীঙ্গেলকে শত শত বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও লিখিলেন যে, ফ্লোরেন্স নাইটীঙ্গেল এই কার্য্যের জন্য যখন যাহা আদেশ করিবেন, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিতে প্রস্তুত আছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাক্তার যে কয়েকজন প্রয়োজন হইবে তিনি তাহাও পাইবেন। এবং তিনি যখন যে আদেশ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করা হইবে। পরোপকারব্রত-পরায়ণ ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন; এবং আর কাল বিলম্ব না করিয়া কার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সে সময়ও কার্য্যাধ্যক্ষ শুশ্রূষা-কারিণী মহিলাগণের সংখ্যা অধিক ছিল না; কিন্তু নাইটীঙ্গেল অনেক চেষ্টা করিয়া চৌত্রিশ জন সহচরী সংগ্রহ করিলেন, এবং শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্থ শত শত বৃটীশ সৈন্যের জীবন রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন।

শত সহস্র স্কন্ধহীন, হস্তপদ বিহীন এবং নানা-প্রকারের আহত ও রোগগ্রস্থ সৈনিকদিগের আর্ত্তনাদ যেখানে অবিশ্রান্ত আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে, যেখানে মুমূর্ষুকে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই, চারিদিক কেবল হাহাকারে পরিপূর্ণ, সেই ভীষণ দৃশ্যময় স্কুটারীর হাঁসপাতালে, পরোপকারব্রত-পরায়ণ ফ্লোরেন্স্, তাঁহার সহৃদয়া সহচরীদিগের সহিত ৫ই নবেম্বর উপস্থিত হইলেন। নাইটীঙ্গেল দেখিলেন অভাব অত্যন্ত অধিক, কিন্তু কার্য্য করিবার লোক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত অধ্যবসায়, এবং প্রাণের ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে, বিঘ্ন বাধা মুহূর্ত্তে দূরে চলিয়া যায়। যে কঠিন ব্রতে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, প্রাণ সমর্পণ না করিলে সে ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না নাইটীঙ্গেল তাঁহার সহচরীদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন; এবং নিজের দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপ দিবারাত্র অক্লান্ত ভাবে তাঁহারা আহত ও রোগগ্রস্থদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রোগীর সেবা ভিন্ন নাইটীঙ্গেলের আরও অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হইত। হাঁসপাতালের সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে ছিল। হাঁসপাতাল সম্বন্ধে যে যে কার্য্য সমস্তই তাঁহার দেখিতে হইত; সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে হইত। অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় এবং প্রাণগত চেষ্টার গুণে, অল্পদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, অশান্তির মধ্যে শান্তি আনয়ন করিলেন; সহস্র সহস্র আহত ও রোগগ্রস্থদিগের আর্ত্তনাদে যে স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, সে স্থান করুণার জ্যোতিতে শান্তিময় হইয়া উঠিল। বাস্তবিক যে স্থানে ফোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের সেই সুন্দর স্নেহময়ী, করুণাময়ী, শান্ত মূর্ত্তি উপস্থিত হইত, সেই খানেই শান্তি ও করুণা বিস্তার হইত। তাঁহার করুণ, স্নেহমাখা সম্ভাষণে তাঁহার কোমল স্নেহমাখা কর স্পর্শে রোগী অসহ্য রোগ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইত। তাঁহার ধর্ম্মের সান্ত্বনা বাক্যে মুমূর্ষু ইহলোক শান্তিতে পরিত্যাগ করিত। রাত্রি নাই, দিন নাই, নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি নাই, রমণী পুলকিত মনে, অক্লান্ত দেহে বুকভরা আসা ও উৎসাহের সহিত, রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষার গুণে প্রাণ পাইল। সেবা শুশ্রূষার যেখানে অধিক প্রয়োজন, রোগ যেখানে কঠিন, রোগীর আর্ত্তনাদ যেখানে অধিক, মৃত্যু যেখানে আসন্ন, সেইখানেই নাইটীঙ্গেলের করুণাময়ী মূর্ত্তি। মুমূর্ষুও তাঁহাকে দেখিলে যেন প্রাণ পাইত। নাইটীঙ্গেল যখন রোগীদিগের শয্যাপার্শ্ব দিয়া যাইতেন, তখন তাহাদের রোগ-শীর্ণ-মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, তাঁহার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিত। চিকিৎসকগণ এবং অন্যান্য সকলে যখন নিদ্রিত, গভীর রাত্রির সেই গম্ভীর অন্ধকারের মধ্যে করুণার প্রতিমূর্ত্তি ফ্লোরেন্স্-নাইটীঙ্গেল একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ হস্তে, রোগীদিগকে দেখিয়া বেড়াইতেন। একজন আহত সৈনিক হাঁসপাতাল হইতে এক পত্রে লিখিয়াছিল, "তিনি (নাইটীঙ্গেল) এই সহস্র সহস্র রোগীদিগের সকলের সহিত সকল সময় কথা বলিতে পারিতেন না, যাহার সহিত কথা বলিতে না পারিতেন তাহাদিগের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বা অন্য প্রকারে সম্ভাষণ করিতেন। অনেক সময় তাহাও যখন না পারিতেন, আমরা তাঁহার ছায়া চুম্বন করিয়াই তখন তৃপ্ত হইয়া পুনরায় নিদ্রা যাইতাম।" স্কুটারীর হাঁসপাতালে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার অক্লান্ত দেহে, প্রফুল্ল মনে এবং প্রাণের একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া নাইটীঙ্গেল ব্যালাক্লাভার হাঁসপাতালে গেলেন। দেখিলেন ব্যালাক্লাভার হাঁসপাতালের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম তাঁহার কোমল দেহে সহিল না; তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন, সকলে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বার তিনি রক্ষা পাইলেন। অবশেষে ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানে নাইটীঙ্গেল স্বদেশে ফিরিলেন; সমস্ত ইংলণ্ডের লোক তাহাদের জাতীয় গৌরব, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য মহা আয়োজন করিল। কিন্তু নাইটীঙ্গেল এমনি গোপনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন যে, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। লোকের প্রশংসা লইয়া তিনি কি করিবেন? ধন, ঐশ্বর্য্য, জীবন, যৌবন যে ব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার সাধনেই তাঁহার অতুল সুখ।

নাইটীঙ্গেল ক্রিমিয়ায় যে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য জন্মের মত হারাইয়াছিলেন; এই সময় হইতে তিনি আর বড় বাড়ীর বাহির হন নাই; প্রকাশ্য স্থানে আর বড় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার দেহ ভগ্ন হইলেও হৃদয় ভগ্ন হয় নাই; হৃদয়ের সেই উৎসাহ, সেই আশা, সেই অধ্যবসায়, পরোপকারের জন্য, সৎকার্য্যের

জন্য সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তেমনি ছিল। পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষার জন্য রেড ক্রস্ সোসাইটী নামে একটি সভা স্থাপিত হইল, নাইটীঙ্গেল তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহার কত প্রতিপত্তি, কত সম্মান ছিল; আমেরিকায় যখন যুদ্ধ হয়, তখন কি প্রকারে আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার নিকট সে বিষয়ে পরামর্শ লওয়া হয়। ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে জর্ম্মাণদিগের হাঁসপাতালে সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন। লিস্‌বন নগরে বালক বালিকাদিগের জন্য যে হাঁসপাতাল আছে, তাহা তাঁহার পরামর্শ মতই নির্ম্মিত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া এবং আমাদের ভারতবর্ষের হাঁসপাতাল গুলিও তাঁহার নিকটে অনেক ঋণী। রোগীদের সেবা শুশ্রূষা এবং হাঁসপাতালের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। গত ২৫ বৎসরে ইংলণ্ডে যে সকল হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই তাঁহার পরামর্শ মত।

ইংলণ্ড ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল; তিনি তাঁহার কীর্ত্তিক্ষেত্র ক্রিমিয়া হইতে গৃহে ফিরিলে, ইংলণ্ড তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উপহার দিল। কিন্তু তিনি নিজে তাহা গ্রহণ করিলেন না; অবশেষে সেই অর্থে আমরা পূর্ব্বে যে "নাইটীঙ্গেল আশ্রম" এর কথা উল্লেখ করিয়াছি, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, সেই "নাইটীঙ্গেল আশ্রম" স্থাপিত হইল। রোগীর সেবা শুশ্রূষা কি প্রকারে করিতে হয় প্রতিদিন শত শত রমণী এখানে সেই শিক্ষা পাইতেছেন; এবং দেশে বিদেশের হাঁসপাতালে যাইয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষায় জীবন সমর্পণ করিয়া নাইটীঙ্গেলের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।

পরহিত-ব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশ বিদেশ জানেন না। যেখানে দুঃখীর আর্ত্তনাদ, সেই দিকেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ-হৃদয় ধাবিত হয়। এদেশে বেহার অঞ্চলের কৃষকদিগের শোচনীয় দরিদ্রতার কথা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছিল, যখন কোমল হৃদয়া রমণী নাইটীঙ্গেল শুনিলেন যে, বেহারের প্রজাগণ কখনও বা অনাহারে কখনও বা অর্দ্ধাহারে আবার কখনও বা গাছের পাতা বা ফল মূল খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে; তখন তিনি এবিষয় লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এদেশে আসিয়া ভারতীয় প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহাদের ক্লেশ দূর করিবেন; কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি এখন একান্তই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর সেবায় তাঁহার দেহ এমনিই ভগ্ন হইয়াছে, যে স্বদেশ পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব।

নাইটীঙ্গেলের বয়স এখন ৬৮ বৎসর হইয়াছে। তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত—ইহাতে কে না চিন্তিত হইবেন? ইহাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ড একটী রত্ন হারাইবেন। আমরা নাইটীঙ্গেলের জীবনী শেষ করিলাম। করুণার প্রতিমূর্ত্তি আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, পরোপকার-ব্রতপরায়ণা ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের জীবনী পড়িয়া পাঠক পাঠিকাদিগের মনে কি কোন আশা—কোন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে?

ভাই বোন্।

২য় পরিচ্ছেদ।

বসু বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী শয়ন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার হ্রাস হইল না। ছেলে মেয়েরা এখন ঘুমাইয়াছে সুতারাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে ভাবী বিপদের বিষয়ে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারে যেন সংসারের সকল সম্বন্ধ ডুবিয়া গিয়াছে। বাহিরের কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দ শুনা যাইতেছে। বসু বাবু এবং তাঁহার গৃহিণী সেই অন্ধকারপূর্ণ পৃথিবীতে নিঃসহায় হইয়া কি ভাবিতেছেন? সেখানে তাঁহাদের বিশেষ আত্মীয় কেহ নাই। বিদেশে কাহারাই বা থাকে? কর্ম্মোপলক্ষে দশ স্থানের দশ জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে মাত্র। আজ এই বিপদের দিনে সকলেই আপন আপন পুত্র পরিবার লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই ঘোর বিপদের সময়েও বসু বাবু অধীর হন্ নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন "আমাদের নিকটে যদি একখানা নৌকা থাকিত তবে অনেককে বাঁচাইতে পারিতাম"। "আমাদের ছাদের উপর উঠিয়া অনেকে বাঁচিতে পারিত।" ইত্যাদি। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে জল ছাদের চাইতে বেশী উচু হইবে না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রথমেই নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ, আজ আর রক্ষা নাই। সমুদায়ই জলে ভাসিয়া যাইবে। ছাদের উপর উঠিলেও নিস্তার নাই; তবু আমাদের যাহা সাধ্য প্রাণপণে ছেলে মেয়েদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। আমি খোকাকে লইয়া ভাসিব। তুমি কি কুসুম ও ননীকে দেখিতে পারিবে না? কিন্তু তাহা অসম্ভব। জলের স্রোতে কে কোথায় যাইবে স্থিরতা কি? আমি মরিয়া যদি তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিতাম। ঈশ্বর কি তাহা করিবেন?—

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। সস্নেহে একবার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সে হৃদয়ের আবেগকে রোধ করিতে পারে? মাতার স্নেহের নিকট রমণীর ধৈর্য্য পরাজিত হইল। দরবিগলিত ধারে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ক্ষুদ্র শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন—

"চল, সময় থাকিতে আমরা ছাদে উঠি। বাহিরে ঐ জলের শব্দ শুনা যাইতেছে।"

বসু বাবু—"ও বাতাসের শব্দ; জলের শব্দ নয়। তুমি স্থির হও; বিপদে একমাত্র ঈশ্বরই ভরসা। তিনিই আমাদিগকে রক্ষা—

সহসা ননী ঘুমের মধ্যে "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পিতা মাতা শশব্যস্তে নিকটে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ননী বলিল "আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম যেন আমি ও দিদি জলে ভাসিয়া যাইতেছি।" বসুবাবু ছেলেকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—

"তোমরা স্থির হ'য়ে থাক, আমি দেখিতেছি বাহিরে জল হইয়াছে কি না।" এই বলিয়া ঘরের দোর খুলিয়া লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার পা আর অগ্রসর হইল না। ফিরিয়া ঘরে এসে বলিলেন "প্রস্তুত হও এখনই আমরা ছাদের উপরে উঠিব। ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু খাবার লয়ে উঠা উচিত।

কে জানে কতক্ষণ এইভাবে থাকিতে হইবে? আর কিছু সঙ্গে লইবার আবশ্যক নাই যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন তবে সকলি থাকিবে।"

একথা শুনিয়া মাতা বুঝিলেন বাহিরে জল আসিয়াছে এবং জলের শব্দে বাতাসের শব্দ মিশিয়া এত সোঁ সোঁ করিতেছে। মুহূর্ত্ত কাল নিশ্চেষ্ট প্রায় থাকিয়া কুসুমকে উঠাইলেন এবং সস্নেহে সজল চক্ষে সন্তানদিগকে চুম্বন করিলেন। মনে হইল "এজন্মে আর এমন সুখ ঘটিবে না।"

বসু বাবুর আদেশ মত খাদ্য দ্রব্য এবং লণ্ঠনে বাতি জ্বালাইয়া সকলে ঘরের বাহির হইলেন। তখন উঠানে জল আসিয়াছে। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সকলে ছাদের উপর উঠিল। প্রদীপ অনেকক্ষণ রহিল না। বাতাসের অনুগ্রহে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইল। তখন আবার সেই অন্ধকার। নীচে ধবলাকৃতি জল তর তর শব্দে চলিতেছে। সে জল যেন সমুদ্রের দূত স্বরূপ হইয়া সকলকে বলিতেছে "তোমরা সকলেই সেই অতল সমুদ্রের গর্ভে যাইবে। তবে কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? ছাদের উপর যাও, গাছের উপর যাও, কোথায়ও নিস্তার নাই। প্রবল পরাক্রান্ত সমুদ্রের বেগ কে রোধ করিবে? আজ সকলে সমান; ধনী দরিদ্রের বিভিন্নতা নাই; উচ্চ নীচের তফাৎ নাই। আজ সকলেরই এক দশা এক গতি।"

ক্রমশঃ।

সাজি।

মানুষই কি রাক্ষস?— মানুষের কিছুতেই তৃপ্তি নাই; 'যত পাই তত খাই।' এক ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে সে দুটী জিনিষ খায় না। একটী, স্থলচরের মধ্যে—ঘুড়ী, আর একটী জলচরের মধ্যে—নৌকা। চিনেরা আরসুলা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে। ফরাসী, ইংরাজ এবং কোন কোন বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে, ভেকের 'কট্‌লেটের' বড় আদর; সংবাদ পত্রে দেখিলাম ফরাসীর দেশে সম্প্রতি একটী ভেক ৭০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, ভেক মহাশয়ের দেহের আয়তন দুই হস্ত এবং ওজন ৩০।৩৫ সের। এই বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে গুগ্‌লির আদর কম নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায়ই এই প্রকার একটী না একটী ঘৃণিত পদার্থ এক একটী জাতির প্রিয় খাদ্য। এই যখন সভ্য জাতিদের কথা, অসভ্য জাতির কথা বলিবার অত্য আবশ্যক নাই; তাহারা কিছুই বাদ দেয় না। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পর্য্যন্ত ইহারা আহার করে। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে মানুষকে রাক্ষস বলিয়া মনে হয়; বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট পতঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ জন্তু, এ সকলেই মানুষের উদর জ্বালা নিবারণ এবং রসনা পরিতৃপ্ত করে, সৃষ্টির কিছুই ইহাদের কাছে বন্ধ যায় না। প্যারিসে সম্প্রতি ঘোড়ার মাংসের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। ধনীরা বলেন কেবল গরীব লোকেই ঘোড়ার মাংস খায়; কিন্তু দুষ্ট লোকেরা

বলে যে অনুসন্ধান করিলে ধনীদের রন্ধনশালা হইতেও প্রচুর ঘোড়ার মাংস বাহির হইতে পারে। এক প্যারিসেই দেড়শত ঘোড়ার কসাই আছে। দশবৎসরে ঘোড়া খাওয়া কত বাড়িয়াছে দেখ; ১৮৮৬ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬২টী ঘোড়া বধ করা হয়; কিন্তু ১৮৮৭ সালে ১৫০০০ পোনের হাজার ঘোড়ার আবশ্যক হইয়াছিল। ছেলেবেলা যখন রাক্ষসের গল্প শুনিতাম, তখন মনে করিতাম, রাক্ষস যেন কি এক প্রকার কিম্ভূত কিমাকার প্রকাণ্ড জীব, দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে সে ভ্রম দূর হইতেছে!

* * * * * *

প্রকৃতির বায়ুমাণ যন্ত্র—লজ্জাবতী লতা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ? লতাটী ছুঁইলেই সরমে লজ্জায় একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ভিয়েনা নগরে যে পুষ্প-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ধরণের একটী উদ্ভিদ্ প্রদর্শিত হইয়াছে; তফাৎ এই যে মানুষের স্পর্শেই যে কেবল ইহার লজ্জার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতেও ইহার লজ্জা প্রকাশ পায়। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটিবার ৪৮ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার পাতাগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি কখন হইবে, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ব্বেই জানা যায়। মানুষ বুদ্ধি চালনা করিয়া ব্যারমেটার নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে; তাহা দ্বারা ঝড় বৃষ্টির সময় অনেকটা ঠিক জানিতে পারা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেও যন্ত্রের অভাব নাই। আমাদিগের চক্ষু নাই, তাই সকল সময় দেখিতে পাই না।

* * * * * *

বিষতরু—যবদ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষটী দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু ইহার কাছে যে যায় সেই মরে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে নয় দশ মাইলের মধ্যে কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, পুকুরে মাছ থাকিতে পারে না, কোন জীব নিকটে যাইতে পারে না, গেলে মুহূর্ত্তে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হয়। এই বৃক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত এক প্রকার বিষ নির্গত হইয়া, চারিদিকের বায়ু বিষাক্ত করিতেছে। এই বিষাক্ত বায়ু যে স্থান দিয়া চলে, সে স্থানের সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। পাখীর শরীরে এই বিষাক্ত বায়ু লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃত্যু হয়। এই বৃক্ষের চারিদিক মানুষের অস্থিতে পরিপূর্ণ। এই বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড, পঞ্চাশ হাতেরও অধিক উচ্চ, বৃক্ষের পরিধি পঁচিশ হাতের কম নহে। ইহার ছাল সাদা; এই ছালে আঘাৎ করিলে এক প্রকার সাদা রস নির্গত হয়, তাহা সাপের বিষ হইতেও ভয়ঙ্কর। এই বিষে কেবল যে জীবের প্রাণ নাশ হয় তাহা নহে, ইহাতে অনেক উৎকট পীড়াও আরোগ্য হইতে পারে;—বিষে বিষক্ষয়।

* * * * * *

আশ্চর্য্য জীবনরক্ষা— আমির আলী তিনজন সঙ্গী লইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছিল। আমির আলীর বাড়ী চট্টগ্রাম অঞ্চলে; এই অঞ্চলের অনেক জেলেরা, খুলনা জেলার দক্ষিণে সুন্দর বনে মাছ ধরিতে আসিয়া থাকে। আমির আলী জাল প্রভৃতি লইয়া সঙ্গীদের সহিত নৌকা ছাড়িয়া দিল; তখন ঝড় বৃষ্টির কোন চিহ্ন ছিল না। তাহারা ধীরে ধীরে নিশ্চিন্তমনে সমুদ্রতীর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ জোরে বাতাস উঠিল, এবং বাতাসের জোরে তাহাদের নৌকাও ক্রমে গভীর সমুদ্রের দিকে চলিল। তাহারা চারিজনে প্রাণপণে নৌকা ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি এবং তার পর দিন দুইপ্রহর পর্য্যন্ত

অবিশ্রান্ত দাঁড় টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। তখন তাহারা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল, নৌকাও যে দিক ইচ্ছা চলিতে লাগিল। ইহাদের সহিত কোন খাবার জিনিষ ছিল না, ভাবিয়াছিল নিকটেই মাছ ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতেই খাবার চালাইবে; এ বিপদ যে হইবে তাহারা ত আগে বুঝে নাই! ক্ষুধায় এবং পীপাসায় একে একে আমির আলীর সঙ্গীরা মরিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বাড়ী হইতে বাহির হইবার ১৬ দিন পরে আণ্ডামান দ্বীপের নিকটে ইহাদের নৌকাখানা, এক খানা জাহাজের সম্মুখে পড়ে। জাহাজের লোকেরা দেখিল যে নৌকার একটা লোক মৃতপ্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, আর তিন জনের দেহ পচিয়া ভুষ হইয়াছে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর আমির আলী এখন বাঁচিয়াছে, সে বলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত সে সজ্ঞানে ছিল, তার পর সে জ্ঞান শূন্য হয়। যে ১৫ দিন সজ্ঞানে ছিল, সমুদ্রের লোণা জল ভিন্ন সে ১৫ দিন সে আর কিছুই খায় নাই। তিনটী মৃত শব কোলে করিয়া ১৫ দিন পর্য্যন্ত অকুল সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। আমির আলী মৃত্যুর হাত হইতে এইরূপে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়া এখন গৃহে ফিরিয়াছে। তাহার গৃহে আজ কত আনন্দ!

* * * * *

বিজ্ঞানের কথা— তারে যে সংবাদ পাঠান যায় তাহার দিন দিনই উন্নতি হইতেছে। ইহার এক প্রকার সংকেত আছে, তাহা দ্বারাই কথা বুঝা যায়। কিন্তু সম্প্রতি রয়াল সোসাইটী নামক বিজ্ঞান সভার রবার্টসন নামক একজন সাহেব, টেলিগ্রাফ দ্বারা এক স্থান হইতে আর একস্থানে, হাতের লেখা পর্য্যন্ত পাঠাইবার উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহা যতদূরে ইচ্ছা পাঠান যাইতে পারে; এবং যে প্রকার হাতের লেখা, অবিকল তাহাই হইবে। বড়ই সুবিধা; টেলিফোনের সাহায্যে দূরে থাকিয়াও আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জনের সহিত কথা বলা যায়; আবার এই নূতন রীতিতে টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইলে, দূরদেশে বসিয়াও, মুহূর্ত্তে আত্মীয় স্বজনের হাতের লেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের দিন দিন কতই উন্নতি হইতেছে! এক রকম যন্ত্র হইয়াছে; তাহাতে মানুষের কথা জীবিত রাখা যায়। অর্থাৎ আমি এখন যে কথা বলিতেছি, যদি সেই যন্ত্রে এই কথাগুলি কেহ ধরিয়া রাখে; তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর এমন—কি সহস্র বৎসর পরেও, সেই যন্ত্রের সাহায্যে আমার কথা শুনা যাইতে পারে। ইহাতে গলার স্বর অবিকল থাকিয়া যায়। গান পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা রক্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি লক্ষ্ণৌ বসিয়া যে গান গাহিতেছে, তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে গান শুনিতে পার।

পত্র প্রেরকদের প্রতি।

শ্রীহীরালাল ঘোষ, বোয়ালীয়া। চিম্নী ব্যতীত কেরোশীন ল্যাম্প ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। ইহার ধোঁয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে রোগ জন্মাইতে পারে; এই জন্য ডোম এবং চিম্নিওয়ালা ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। কেরোশীন ল্যাম্পের আলো বড় উগ্র, চোখের সাম্নে রাখিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি কমিয়া যায়।

ডাক্তার সণ্ডার্স্ সাহেব বলিয়াছেন যে ডোমওয়ালা ডবল উইক্ ল্যাম্প পেছন দিক রাখিয়া সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিলে চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে না।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। সপ্তম সংখ্যা।
জুলাই, ১৮৮৮।

উদারতা।

বহুকাল পূর্ব্বে চীনদেশে নাথান নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনপতি বাস করিতেন। তিনি অতি উদারচেতা ছিলেন। যাহাতে আপন আলয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগকে ভদ্রজনোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে পারেন তজ্জন্য এমন সুবৃহত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, সেরূপ প্রাসাদ তখন পৃথিবীতে কুত্রাপিও দৃষ্ট হইত না। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ ছিল। তাঁহার গৃহ দিবারাত্র আগন্তুক ব্যক্তিদিগের অতিথিসৎকারের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার যশোসৌরভে পূর্ব্ব পশ্চিম পরিপূর্ণ ছিল।

যখন তিনি বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন অথচ তাঁহার বদান্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন নিকটস্থ প্রদেশের কোন ভদ্র যুবকের কর্ণে তাঁহার যশের কথা প্রবেশ করে। অপনাকে নাথানের সমতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করিয়া নাথানের যশ ও সদ্গুণের প্রতি যুবকের হিংসা জন্মে এবং অধিকতর বদান্যতায় তাঁহাকে অতিক্রম করিতে মনস্থ করে। নাথানের প্রাসাদের অনুরূপ আপন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, এবং প্রত্যেকের প্রতি এমন সৌজন্য ও দয়া প্রকাশ করে যে শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যুবক একদা আপনি প্রাসাদপ্রাঙ্গনে বসিয়া আছে এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা প্রাসাদের একদ্বারে ভিক্ষার্থে আসিয়া সেখানে ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয়দ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করে। সেখানে ভিক্ষা লইয়া তৃতীয়দ্বারে যায়। এইরূপে দ্বাদশদ্বারে ভিক্ষা লইয়া যখন ত্রয়োদশদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে তখন যুবক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তুমি বড় ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছ"; তথাপি বৃদ্ধা ভিক্ষা পাইতে বঞ্চিত হইল না।

বৃদ্ধা বলিল "আহা! নাথানের কি অপরিসীম বদান্যতা, তাঁহার দয়া কি প্রশংসনীয়, তাঁহার প্রাসাদে যে বত্রিশটী দ্বার আছে আমি সকল দ্বারেই ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছি এবং কোন দ্বারেই আমার যাচ্ঞা বৃথা হয় নাই। এখানে আমি কেবল ত্রয়োদশবার আসিয়াছি এবং ইহাতেই আমি তিরস্কৃত হইলাম"! এই বলিয়া বৃদ্ধা সেখান হইতে প্রস্থান করিল, আর কখনও তথায় যায় নাই।

যুবক মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইল। নাথানের কোন প্রশংসা তাহার নিকট স্বীয় যশের হানী বলিয়া বোধ হইত। যুবক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে "যখন আমি সামান্য সামান্য বিষয়েই নাথান অপেক্ষা অনেক গুণে নিকৃষ্ট তখন

তাহাকে সদাশয়ে পরাভব করা দূরে থাক্, মহত্তর বিষয়ে কিরূপে তাহার সমকক্ষ হইব? যদি সংসার হইতে তাহাকে অপসৃত না করি আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইবে। বার্দ্ধক্য যখন তাহাকে মৃত্যু মুখে আনয়ন করিতে পরিতেছে না, আমি এখন স্বীয় হস্তে তাহা করিব"। আপনার এই মনোভাব কাহাকেও ব্যক্ত না করিয়া, সঙ্গে কতিপয় অনুচর লইয়া অশ্বারোহণ করিয়া নাথানের গৃহাভিমুখে গমন করিল। তৃতীয় দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া, ভৃত্যদিগকে তাহাদের বাসস্থান অন্বেষণ করিয়া লইয়া তাহার আদেশ না প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিতে বলিল।

সন্ধ্যার সময়ে যুবক একাকী অশ্বারোহণে নাথানের গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে নাথানকে অতি সামান্য বেশে অনতিদূরে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে নাথানের কোন ভৃত্য মনে করিয়া নাথানের গৃহ দেখাইয়া দিতে বলিল।

নাথান উত্তর করিলেন "মহাশয় আমার সহিত আগমন করুন, আমি নাথানের গৃহে লইয়া যাইব। যুবক বলিল, "আমি বড় বাধিত হইলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে নাথান আমাকে দেখিতে না পান এবং আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহাও না জানিতে পারেন"। "এইরূপ যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহার উপায়ও আমি করিতে পারি''। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে দুইজনে হৃষ্টমনে আলাপাদি করিতে করিতে নাথানের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নাথান আপনার একজন ভৃত্যকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন তিনি যে নাথান তাহা ঐ গৃহের কাহারও নিকট হইতে যুবক যেন জানিতে না পারে। নাথান যুবককে এক বৃহৎ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় তাহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া মিষ্ট আলাপাদি করিয়া যুবকের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যুবক নাথানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেল "মহাশয় আমি নাথানের একজন নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী। ইহাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গেলাম, তথাপি ইহাপেক্ষা উচ্চতর পদে অদ্যাপি আমার উন্নতি হইল না। সকলেই আমার প্রভুর গুণকীর্ত্তন করে, কিন্তু আমি তাঁহার প্রশংসার কিছুই দেখি না"। এই কথা শুনিয়া যুবক ভাবিতে লাগিল যে, এই কর্ম্মচারীদ্বারা আমার দুষ্ট ইচ্ছা সহজেই সাধিত হইতে পারিবে। নাথান যুবককে সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আবশ্যক হইলে সাধ্যানুসারে সৎপরামর্শ ও অন্যান্য উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। যুবক তাহার আগমনের অতিশয় গোপনীয় উদ্দেশ্য এবং তাহা যেন কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয় ইত্যাদি বলিয়া অনেক ইতস্ততের পর মনোভাব পরিব্যক্ত করিল।

যুবকের এই ঘৃণাকর মনস্থ শ্রবণ করিয়া নাথান মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন বটে কিন্তু বাহিক লক্ষণে কিছুমাত্র অন্তরের ভাব প্রকাশ না করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন—

"আপনার পিতা অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, আপনি সকল লোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছেন, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। আপনার কথা অতি গোপনে রাখিব। দেখুন এখান হইতে উত্তরদিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী বন আছে, সেই বনে প্রত্যহ প্রাতে নাথান একাকী ভ্রমণ করিতে যান। সেইখানে যদি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন তবে অন্যপথে আপন আলয়ে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবেন"।

যুবক এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে তথা হইতে চলিয়া আসিয়া আপন ভৃত্যদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে নাথান আপন মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে সেই বনাভিমুখে গমন করিলেন। বনে উপস্থিত হইবামাত্র যুবক তরবারি হস্তে করিয়া নাথানের ঘাড় ধরিয়া বলিল "রে নীচাশয় আজ তোর মরণ নিশ্চয়"—নাথান উত্তর করিলেন "তবে আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত''। যুবক তাঁহার স্বর শুনিয়া মুখের দিকে অবলোকন করিয়া দেখেন যে, যিনি তাঁহাকে এত যত্ন করিয়া তাঁহার আলয়ে স্থান দিয়াছেন এত মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছেন ইনি সেই ব্যক্তি। তখন লজ্জায় ও দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তৎপরে সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলঃ—"পিতঃ আপনার উদরতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি, আমার ন্যায় পাষণ্ড আর জগতে নাই। আমি পশু হইতেও অধম। আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন।" নাথান বলিলেন বৎস কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না; তুমিত সদ্গুণে আমা অপেক্ষা বড় হইতে অভিলাষ করিয়াছিলে, আমার প্রতি অনর্থক ঘৃণা বশতঃ এরূপ কর নাই। তোমার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। যুবক অধিকতর অনুতপ্ত হইল। নাথান বলিলেন "অদ্য আমার কি শুভদিন ছিল অদ্যাবধি এমন কেহ আমার নিকট আইসে নাই যাহাকে আমি সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়াছি। আমার প্রাণ লইতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাছে তুমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাও এই ভয়ে আমি জীবন দিতে আসিয়াছি। বহুকাল সুখভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি আর অতি অল্পকালই জীবিত থাকিব, তুমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হও, তোমা অপেক্ষা আর উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাইব।" যুবক লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপে অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল; নাথান তাহাকে অনেক স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। যুবক বুঝিতে পারিলেন তিনি কখনও নাথানের তুল্য হইতে পারিবেন না। এবং নাথানের পদধূলি মস্তকে লইয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

আলোক-বিজ্ঞান।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তোমরাও বেশ জান যে, জল, কাচ, অভ্র প্রভৃতি অনেকগুলি জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়া সব দেখা যায়। অর্থাৎ তাদের ভিতর দিয়া আলো সহজে গমনাগমন করিতে পারে। ইহারা স্বচ্ছ পদাথ। আমরা বলিয়াছিলাম আলোর পথে বাধা পড়িলেই আলো অন্য পথে যায়। অনচ্ছ পদার্থ আলোর পথে যেমন বাধা দেয় স্বচ্ছ পদার্থ ততদূর না হউক কিয়ৎ পরিমাণে বাধা দেয়। কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর যখন আলোকরশ্মি ঠিক সোজা বা খাড়া হ'য়ে (জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে) না পড়ে

যদি হেলে বা কাৎ হয়ে এসে পড়ে, তবে যে দিকে যাইতেছিল ঠিক সেই দিকে না গিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া সরিয়া অন্যদিকে যায়। ইহাকে আলোর গতির দিক্-পরিবর্ত্তন বা বক্র-গতি বলে। যখন একই পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক গমন করে তখন সরল পথে যায়। কিন্তু যখন এক পদার্থের ভিতর হইতে অন্য প্রকার পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে যায় তখনই অন্য দিকে বাঁকিয়া যায়।

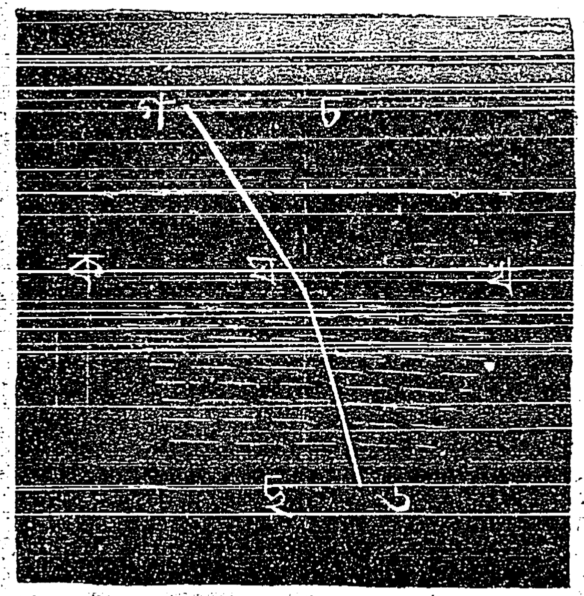

উপরের চিত্র দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। ক ঘ খ জলের উপরিভাগ; গ ঘ আলোক-রশ্মি বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতর যাইতেছে। ঘ-র নিকট আসিয়া যে দিকে যাইতেছিল সেদিকে যাইতে না পারিয়া ঘ ড-র দিকে বাঁকিয়া গেল। ঠিক যেন বোধ হইতেছে গ ড-ঘর নিকট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গ-র নিকট হইতে আলো আসিয়া ঘ-এ পড়িলে যেমন ঙ-র দিকে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ চছ লম্বর দিকে আসে, কম কাত্ হয় বা খাড়া হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ ড-র দিক হইতে আলো আসিয়া যদি ঘ-এ পড়ে তবে তাহা গ-র দিকে বাঁকিয়া যাইবে অর্থাৎ চ ছ লম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায় বা অধিকতর হেলিয়া পড়ে। এখন এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, জলের ভিতর হইতে বাতাসের ভিতর বা এক পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা কম ঘন কোন পদার্থের ভিতরে যাইবার সময়ে অধিকতর কাত হইয়া যায়। আর বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতরে বা এক পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা অধিকতর ঘন কোন পদার্থের ভিতর যাইবার সময়ে কম কাত হইয়া যায়। (কিন্তু তার্পিণ তেলের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তার্পিণ তৈল অপেক্ষা জল যদিও বেশী ঘন তথাপি জলের ভিতর হইতে তার্পিণ তেলের ভিতর আলো গমন কালে কম কাত্ হইয়া যায়।) সকল স্বচ্ছ পদার্থে আলোক সমান বাঁকে না। জলে যতটা বাঁকে কাঁচে তদপেক্ষা অধিক বাঁকে, হীরকে আরও অধিক বাঁকে, তেলে কম বাঁকে। এইগুণে কাচ ও হীরক বিলক্ষণ প্রভেদ করা যায়। কিন্তু একই পদার্থে বাঁকের পরিমাণ সমান থাকে।

এই আলোকের গতির-দিক পরিবর্ত্তন অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। (১) একটী বড় বাটী লও; প্রদীপের নিকট এমন ভাবে বাটীটি রাখ যেন বাটীর পার্শ্বের ছায়া বাটীর ভিতরে তলায় ঠিক মাঝখানে পড়ে; এখন সেই বাটী জল পূর্ণ কর। দেখিবে পূর্ব্বে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল এখন সেখানে নাই, পার্শ্বের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। (২) একটা বড় কাঁসার বা পাথরের বাটীতে একটা পয়সা বা সিকি রাখিয়া দাও। বাটীটি সরাইয়া সম্মুখে এমন স্থানে রাখ যেন পয়সা বা সিকিটী ঠিক বাটির কাঁনার আড়ালে পড়ে। এখন কাহাকেও বাটীতে জল পূরিতে বল। জলে বাটী পূর্ণ হইলে দেখিবে যে, বাটীর তলদেশ অনেক উপরে উঠিয়াছে এবং পয়সা বা সিকি দেখা যাইতেছে। (৩) জলের ভিতর যদি এক গাছা লাঠী ডুবাইয়া ধর দেখিতে পাইবে, বোধ হইতেছে যেন নিমগ্ন অংশটী জলের উপরিভাগ হইতে ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে আর ভাঙ্গা দিক্‌টা উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই বক্রগতির জন্য আমরা অনেক সময়ে ভুল দেখি। পুষ্করিণী ও নদী যতটা গভীর আমরা তদপেক্ষা কম গভীর দেখি। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র বাস্তবিক যেখানে থাকে (ঠিক মাথার উপর ছাড়া) ঠিক সেখানে দেখি না। চন্দ্র সূর্য্য বাস্তবিক অস্ত যাওয়ার পরও আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। আবার বাস্তবিক উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেও আমরা সূর্য্যোদয় দেখি। আমরা যখন জানালা বা দরজার কাচের ভিতর ভিতর দিয়া দেখি তখন বোধ হয় দূরের জিনিষ গুলি ঠিক স্থানেই দেখিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। যাহারা চসমা চখে দেয় তাহারা কোন বস্তু স্বস্থানে দেখে না।

তোমাদের একটা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আলোক রশ্মি অধিকতর ঘন পদার্থ হইতে কম ঘন পদার্থের ভিতরে আসিবার সময়ে যদি বড় বেশী কাত্ হইয়া আসে তবে আর কম ঘন পদার্থে প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ঘন পদার্থের শেষ ভাগে আসিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায় অর্থাৎ সেই রশ্মি পরাবর্ত্তিত হয়। এ বিষয় বারান্তরে বলিব।

পয়সার মত গোল এক খণ্ড কাঁচ যদি চেপ্‌টা না হইয়া কচুরীর মত হয় তবে তার ভিতর দিয়া যখন আলো যায় তখন অনেক মজার মজার ঘটনা হয়। এই রকম কাচকে তোমরা বোধ হয় আতুসী কাচ বলিয়া থাক। এই কাচ সহজেই পাইতে পার। এইরূপ একখানি কাচ যদি কোথাও খুজিয়া না পাও তবে বুড়োদের (পণ্ডিত মহাশয়ের বা গুরুমহাশয়ের বা ঠাকুরদাদার) চসমা জোড়া চাহিয়া লইবে। এই চসমার একটা কাচ যদি সূর্য্যের দিকে ধর, আর তার নীচে একটু দূরে যদি একখণ্ড কাগজ ধর, তবে দেখিবে সেই কাগজে ছোট গোল আলো পড়িয়াছে। কাগজ খানি যদি কাচের নিকট হইতে ক্রমে ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক, এমন এক স্থান আসিবে যেখানে গোল আলোটী খুব উজ্জ্বল এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। সেই আলোক-বিন্দু যদি কাগজের উপর কিয়ৎকাল ধর তবে কাগজের সেই স্থান পুড়িয়া যাইবে। ঐ বিন্দুতে যদি হাত দাও তবে আগুনের মত গরম লাগিবে। এই রকম কাচে টীকে ধরান যায়।

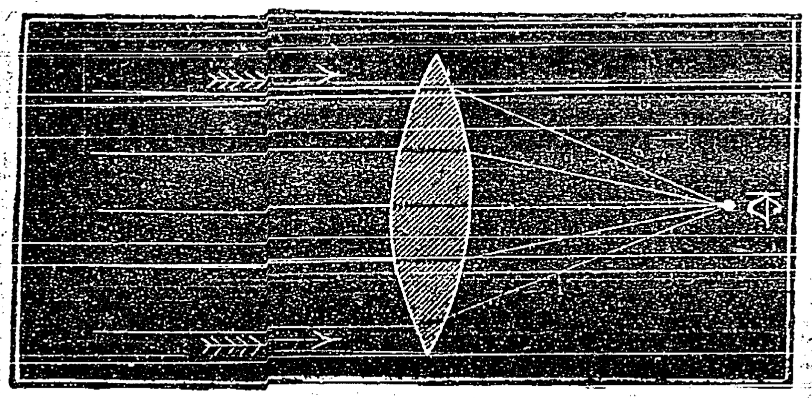

উপরের চিত্র দেখ, একখানি চারিপাশ সরু মাঝখানটা মোটা একটা কাচ সূর্য্যের কিরণে ধরা হইয়াছে। কাচের উপর যত কিরণ পড়িয়াছে সব বাঁকিয়া গিয়া এক বিন্দুতে জড় হইয়াছে। এই বিন্দুকে অধিশ্রয়ণ বিন্দু বা কিরণ-সমাহার বিন্দু বলে। রাত্রে দেয়ালের নিকট যদি এই কাচ ধর তবে দেয়ালে সম্মুখের প্রদীপের একটী সুন্দর উল্টা ছবি পড়িবে আবার কাচ খানি প্রদীপের খুব কাছে আনিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক দেখিবে সম্মুখের দেয়ালে একটা খুব বড় উল্টা প্রদীপের ছবি পড়িয়াছে। দেখ ওরকম কাচ যদি নিতান্তই না পাও তবে একটা গোল কাচের বোতল লইয়া জলপূর্ণ কর তাহা হইলেও এই সব পরীক্ষা করিতে পারিবে। অপর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ কেমন একটা গোল বোতলে জল পূরিয়া প্রদীপের কাছে

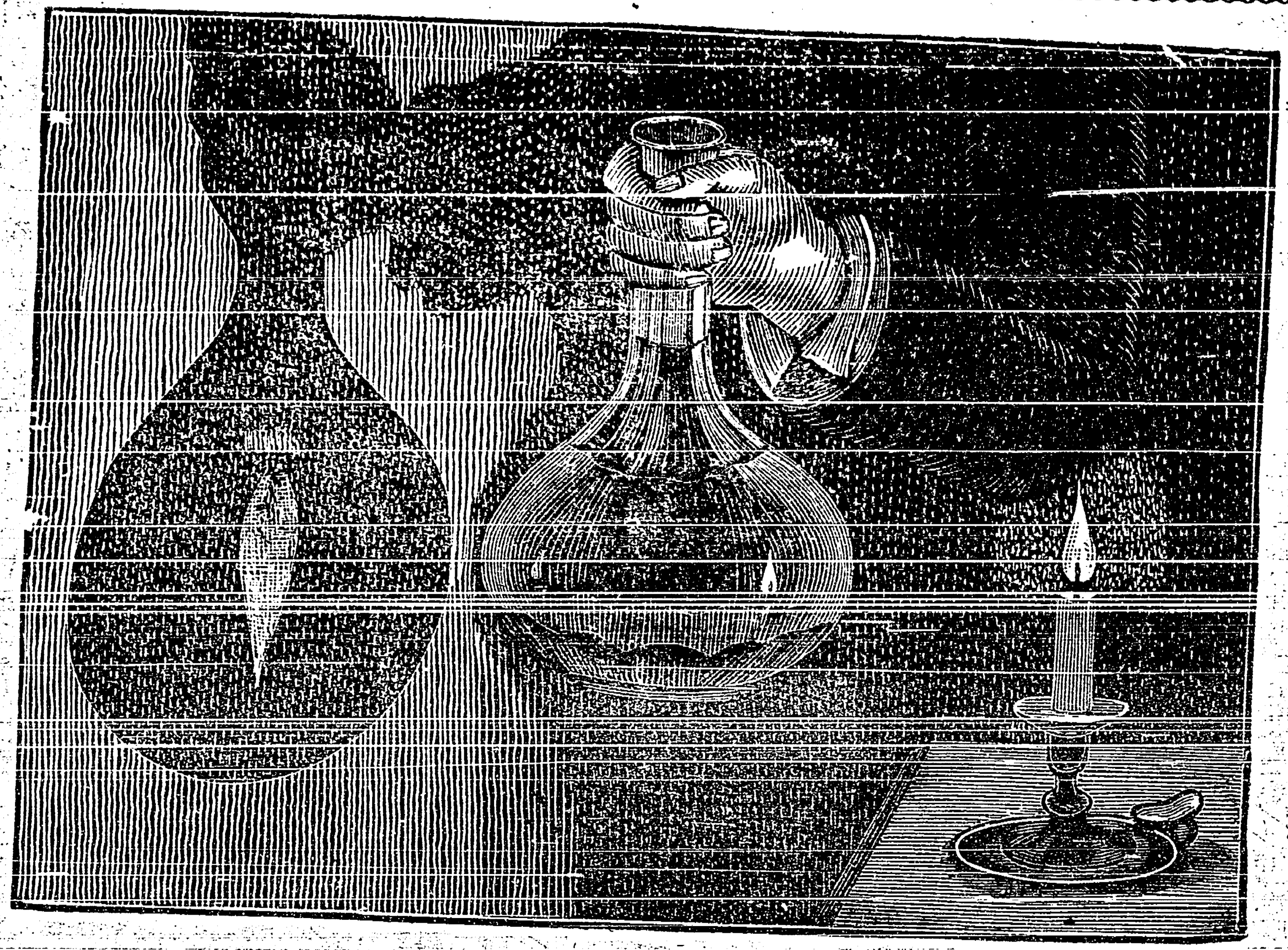

ধরা হইয়াছে আর দেয়ালে কেমন বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে।

কোন ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে একটা দরজা বা জানালায় যদি ছোট একটী ছিদ্র করিয়া লও আর সেই ছিদ্রে যদি ঐ রকম একখানি চসমার কাচ কোন রকমে বসাইয়া দাও, আর ঘরের ভিতর কাচের সামনে যদি একখানি কাগজ ধর তবে বাহিরের সমুদয় বস্তুর কেমন যথাযথ ছবি পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে। ছবিগুলি কিন্তু উল্টা হইয়া পড়িবে। দিনের বেলায় যদি ঘরের বারান্দায় কিম্বা ঘরের ভিতরেই দরজা বা জানালার নিকট আসিয়া একখানি সাদা কাগজের নিকট যদি বুড়োদের চসমা ধর তবে সম্মুখে দূরের সকল বস্তুরই ছোট উল্টা ছবি কাগজখানির উপর পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে।

ঐ রকম একখানি কাঁচ চোখের কাছে যদি ধর আর কাঁচের ওপাশে যদি তোমার বইখানি ধর তবে বই এবং অক্ষরগুলি খুব বড় বড় দেখিতে পাইবে। একটী গোল বোতলে জল পূরিয়া বোতলের ওপাশে যদি হাত দাও তবে এপাশ হইতে হাতের আঙ্গুলগুলি খুব মোটা মোটা দেখিতে পাইবে। এইরূপ কাঁচে অণুবীক্ষণ তৈয়ার হয়। এই কাঁচের সাহায্যে ফোটোগ্রাফও তৈয়ার হয়।

আদর্শ-শিক্ষা।

(৮৫ পৃষ্ঠার পর।)

ক। (বেড়াইতে বেড়াইতে) পণ্ডিত মহাশয়, ঐ প্রকাণ্ড গাছটা কি গাছ?

অ। নিমগাছ।

ক। নিমগাছ অত বড়! কখনই নয়।

অ। দেখ দেখি, ওর নিমপাতার মত পাতা নয় কি?

প। অত বিবাদে কায কি, পড়েই দেখ না, ঐত গাছে টিকিট লাগান আছে।

অ, ক। Swie-Swiete-nia ma-he-goni.

ক। (পড়া সমাপ্ত না হইতেই) পণ্ডিত মহাশয় এই কি মেহগনি গাছ? যার কাঠে সিন্দুক বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

প। হাঁ, এই মেহগনি গাছ; অমল যাহা পড়িতেছে মনোযোগ দিয়ে শুন, তার পরে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহা করিও।

অ। Swie tenia mahagoni. Hab, West Indies, Mexico. N. O. Cedrelacecæ.

ক। পণ্ডিত মহাশয়, Hab. West Indies Mexico. ইহার মানে কি।

প। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস এবং মেক্সিকো হইতে আনা হইয়াছে।

অ। তার অর্থ কি? আর কোন স্থানে কি এ গাছ জন্মে না? এই ত এই বাগানে জন্মাইয়াছে।

প। আজকাল যদিও এদেশের অনেক স্থানে মেহগনি গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অনেক পূর্ব্বে এ গাছ এদেশে পাওয়া যাইত না, প্রথমে মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আনা হয়।

ক। এ বাগানে আর কোন গাছ আছে কি যাহা মেহগনির মত অন্যদেশে হইতে আনা হইয়াছে?

প। আছে বই কি, এরূপ অনেক গাছ আছে, যাহা এদেশে পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এই গাছটি ম্যাডাগাসকার থেকে এসেছে, এই দেখুন লেখা আছে :— Po-Pain-ci-a-na. Re-ai-a Madagascar.

ক। সে কি! এগাছ ত এখানে যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কেল্লার ময়দানে রাস্তার ধারে ধারে এই রকমের গাছ কত আছে।

প। তা সত্য, কিন্তু অনেক পূর্ব্বে এদেশে এ গাছ পাওয়া যাইত না, তোমরা আজকাল এই গাছ যত দেখিতে পাও আমরা যখন বালক ছিলাম তখন এত দেখিতে পাইতাম না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাডাগাসকার হইতে,কেমন ক'রে আনা হল, আর কেই বা আনিল?

প। প্রথমে ছোট ছোট চারা গাছ কিম্বা বীজ আনা হয়,পরে ঐ সকল চারাগাছ এবং বীজ হইতে বড় বড় গাছ হয়, তাহাদের বীজ হইতে আবার চারা এবং গাছ জন্মে; এইরূপে এই জাতীয় গাছের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এই বটানিকাল গার্ডেন যে কেবল লোকের বেড়াইবার নিমিত্ত হইয়াছে তাহা নয়। এদেশের যে সকল লতা, গুল্ম এবং বৃক্ষ ইত্যাদি জন্মে না অন্য দেশ হইতে তাহা এদেশে আনা, এবং এদেশের গাছ, পালা অন্যান্য দেশে পাঠান এই বাগানের একটি প্রধান কায। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ এই সকল ভিন্ন দেশীয় গাছ কেমন করিয়া আনা হয় এবং কেইবা আনে।

ক। পণ্ডিত মহাশয় ওকগাছ (Oak) দেখান না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় চেরি ফলের গাছ (Cherry) দেখান না।

প। ও সকল যে শীতপ্রধান দেশের গাছ, এখানে জন্মায় না, এবং যত্ন করিয়া রোপণ করিলেও অধিক দিন বাঁচে না।

অ, ক। এই না আপনি বল্লেন যে, এ দেশে যে সকল গাছ পাওয়া যায় না অন্যান্য দেশ হইতে সে সকল গাছ পালা এ দেশে আনান হয় এবং অন্যান্য দেশে এখান হইতে গাছ পালা পাঠান হয়।

প। সে কথা সত্য, আর মেহগনি এবং বড় কৃষ্ণ চূড়ার গাছ Poinciana Regia ঐ কথায় সত্যতাও প্রমাণ করিতেছে, তবে বিদেশীয় সেই সকল গাছ পালা এ দেশে বাঁচে এবং ক্রমে সংখ্যায় বেশী হয় যাহাদের পক্ষে এদেশের জল বায়ু অনুকূল। এমন অনেক বিদেশীয় গাছ আছে যাহা এদেশে বাঁচে না।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, কেমন সুন্দর সুপারী গাছ দেখুন।

প। ভাল ক'রে দেখ দেখি?

অ। কেন পণ্ডিত মহাশয়?

ক। কেন পণ্ডিত মহাশয় বলুন না?

প। এ গাছগুলি কি বল দেখি?

অ। সুপারী গাছ।

প। এ গাছগুলি যদি সুপারী গাছ হয় তাহা হইলে যে গাছটিকে সুপারী গাছ বলিয়া আমাকে দেখাইতেছিলে সেটি সুপারী গাছ নয়।

অ,ক। কেন পণ্ডিত মহাশয় দেখ্‌তে ত একি রকম।

প। এই জন্যেই বলিতেছিলাম ভাল করে দেখ।

ক। এই যে এ গাছের টিকিট আছে পড়ে দেখি না।

প। সেত বড় সহজ কথা, কিন্তু আমি যা বল্লেম তার কি? পড়ে দেখার আগে এই গাছগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ দেখি কোন প্রভেদ দেখিতে পাও কি না।

অ,ক। (অনেকক্ষণ দেখার পর) হাঁ পণ্ডিত মহাশয় পাই।

প। কি প্রভেদ বল দেখি।

ক। অমল, যে গাছটিকে সুপারী গাছ বলিয়া দেখাইতেছিল সেটি যদিও ঐ প্রকৃত সুপারী গাছগুলির সমান উচু কিন্তু উহার কাণ্ড অপেক্ষাকৃত মোটা, আর সুপারী গাছের কাণ্ড যেমন কাটা কাটা উহার তাহা নয়, বেশ মসৃণ।

অ। পণ্ডিত মহাশয় আমি বলি।

প। আচ্ছা বল।

অ। আমি যেটীকে সুপারী গাছ বলিয়া দেখাইয়াছিলাম সে গাছের পাতা প্রকৃত সুপারীর পাতার মত নয়। উহার পাতা কতকটা নারিকেলের পাতার মত, তবে অত বড় বড় নয়, কিন্তু দেখ্‌তে বড় সুন্দর। যদিও ভাল ক'রে বল্‌তে পার্‌ছিনে কিন্তু প্রভেদ বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

প। বড় সন্তুষ্ট হ'লেম। তোমরা এতক্ষণ কেবল উপর উপর দেখিয়াই আপন আপন মত প্রকাশ করিতেছিলে। চোখে দেখিতেছিলে বটে কিন্তু মনে দেখিতেছিলে না।

অ। পণ্ডিতমহাশয় মনে দেখা কি? চোখ দিয়েই ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মন দিয়ে ত দেখা যায় না!

প। প্রথমে যখন ঐ গাছটি দেখেছিলে তখন কি চোখ দিয়ে দেখনি?

অ। আজ্ঞা হাঁ পণ্ডিতমহাশয় দেখ্‌ছিলেম।

প। কিন্তু ভাল করে ত দেখ্‌তে পাও নি।

অ। ততটা মনোযোগ দিই নি।

প। মনোযোগ দাও নি বলেইত ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাও নি। এখন বুঝিতে পারিলে যে ভাল ক'রে কিছু দেখ্‌তে হ'লে চোখের সঙ্গে মনের যোগ চাই।

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয় বেশ বুঝেছি, এরি নাম "মনে দেখা"।

প। আচ্ছা, এখন টিকিটখানা পড়িয়া দেখ।

অ,ক। Se-a-fo-r-thi-a-ch-e-gans. Hab. Tropical Australia. N.O. Palmaceæ.

ক। পণ্ডিত মহাশয়, এ গাছ কি অষ্ট্রেলিয়া দেশের?

প। দেখ্‌লেত তাই লেখা আছে।

অ। অষ্ট্রেলিয়া দেশেও গাছ পালা আছে।

প। বড় আশ্চর্য্য হ'লে না কি?

ক। পণ্ডিত মহাশয়, পৃথিবীর সকল স্থানেই কি গাছ পালা আছে?

প। হাঁ, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই গাছ পালা আছে, তবে কোন স্থানে কম কোন স্থানে বেশি। উষ্ণ প্রধান দেশ সকলে গাছ পালা বেশি জন্মে এবং খুব বড় বড় হয়, আর শীতপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত কিছু কম। শীত প্রধান দেশেও কোন কোন স্থানে খুব বড় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক কথা, যদিও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায় কিন্তু কোন দুই দেশের গাছ পালা ঠিক এক রূপ নয়।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি দুই বারই বলিলেন "পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায়" তবে কি এমন কোন স্থান আছে যেখানে গাছপালা পাওয়া যায় না?

প। যে সকল স্থানে নিয়ত বরফ জমিয়া থাকে সেখানে গাছ পালা জন্মে না, আর মরুভূমিতেও কোন প্রকার উদ্ভিদ্‌ জন্মে না।

ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয়, আফ্রিকা দেশের সাহারা মরুভূমিতে গাছ পালা নাই।

অ। গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও উদ্ভিদাদি জন্মে না।

প। আমি যখন বলিয়াছিলাম "পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায়" তখন কি একথা মনে হয় নি।

অ,ক। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) মনে হয় নি।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, N. O. Palmaceæ, ইহার অর্থ কি?

প। গাছটী তালজাতীয়, কিন্তু উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা না পড়িলে ভাল করিয়া এবিষয় বুঝিতে পারিবে না। এই দেখ কত প্রকারের গাছ পালা তোমরা দেখিতেছ, কত রকম পাতা, কত রকম ফুল; যেখানে আমরা এখন দাঁড়াইয়া আছি ইহার চতুর্দ্দিকেই কত বিভিন্ন প্রকারের গাছ পালা; কতকগুলি সুপারীর মত, কতকগুলি তাল গাছের মত, আবার কতকগুলি কলাগাছের মত। কোন কোন গাছের পাতা খুব লম্বা লম্বা, আবার ঐ বড় গাছটি দেখ (তেঁতুল জাতীয় গাছ) উহার পাতা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা এই সকল উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। সুপারী, নারিকেল, খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছ এক জাতীয়, কারণ এই সকল গাছের আকারে অনেক পার্থক্য থাকিলেও স্থূল স্থূল বিষয়ে ইহারা একরূপ। তেঁতুল, বকফুল, শিমুগাছ, সোনা'ল, বাবলা প্রভৃতি এক জাতীয়, কারণ এই সকল গাছের ফুল এক লক্ষণাক্রান্ত।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আমার পাতাগুলি শুকিয়ে উঠেছে।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, আমার পাতাগুলিও শুকিয়েছে।

(সখার পাঠক পাঠিকা! ভরসা করি তোমাদের মনে আছে যে, শিক্ষক মহাশয় কতকগুলি

পাতা অমল ও কমলের হাতে দিয়েছিলেন, এ সেই পাতা।)

প। বল দেখি পাতাগুলি কেন শুকাইল।

অ। রৌদ্রে।

ক। রৌদ্রে আর সকল পাতা শুকায় না কেন?

অ। ও সকল পাতা কেন শুকাবে, ও সব যে গাছে লেগে আছে।

ক। কেন আমার হাতে যে পাতাগুলি আছে তার অনেকগুলির ত ছোট ছোট ডাল আছে, তারাও কেন শুকিয়েছে।

প। ডাল থাকিলেই যে শুকাবে না তার কোন অর্থ নাই।

অ। শুকাবার কারণ কি বলুন না।

প। সেই রঙ্গনের চারা কেটে ফেলার কথা মনে আছে?

অ, ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয়, আছে।

প। কি বল দেখি।

অ। স্কুলের ছোট বাগানটিতে কতকগুলি জঙ্গলি গাছ হয়, সেইগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে মালি একটা রঙ্গনের চারা কেটে ফেলে। মালির অবশ্য কোন দোষ ছিল না, বর্ষাকালে সুন্দর লাল লাল ফুল হইত বলিয়া রঙ্গনের চারাটি আমাদের বড় প্রিয় ছিল। আমরা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর এক স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই চারাটি শুকাইয়া যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঐ চারা শুকাইবার কারণ বুঝাইয়া দিবার সময় বলিয়াছেন যে, মূল দ্বারা গাছ পালা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করে, এবং সেই রস দ্বারা উদ্ভিদ সকল জীবিত থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়।

প। ভাল। তার সঙ্গে এই পাতা এবং ডালগুলি শুকাইবার কি সম্বন্ধ?

অ। বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে; এই পাতা এবং ডালগুলির পুষ্টির জন্য আহারের আবশ্যক, কিন্তু ইহারা ত এখন আহার পাইতেছে না।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, যদি এই ছোট ডালগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখা যায় তা হইলে কি ইহারা সতেজ থাকে না।

প। রঙ্গন গাছত মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলে।

অ। আমার মনে আছে আপনি বলেছিলেন যে, প্রত্যেক উদ্ভিদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাব আছে।

ক। মূলের কাজ মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করা।

প। তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, এই ছোট ছোট ডালগুলিকে পুতিয়া রাখিলে ইহারা সতেজ থাকে কি না?

ক। (কিঞ্চিত লজ্জিত হইয়া) পণ্ডিত মহাশয় মূল নাই বলিয়া ইহারা রস আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, কাযেই ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে।

বড়বানল।

আমরা একবার বাদাবন দিয়া নৌকায় যাইতেছিলাম। মাঝিরা নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, আমরা নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিয়াছি; তখন রাত্রিকাল, ছাদের উপর বসিয়া

আকাশের দিক চাহিয়া রহিয়াছি, আকাশের নীল বক্ষে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া রহিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার, তারাগুলি অযুত হীরক খণ্ডের ন্যায় জল্ জল্ করিয়া জলিতেছে, আমরা অনন্যমনে তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ রাত্রিকালের সেই নিস্তব্ধ নদীর দিকে দৃষ্টি পড়িল; দেখিলাম আকাশের ন্যায় নদীও জলিতেছে। মাঝিরা দাঁড় ফেলিতেছে, আর তাহাতে নদীর জল আন্দোলিত হইয়া আকাশের অসংখ্য তারকার ন্যায় জ্বলিতেছে। আমাদের একটু কৌতূহল হইল, আমরা একগাছা লাঠি লইয়া রাত্রিকালে সেই স্থির, নিস্তব্ধ নদীর বক্ষস্থল আলোড়িত করিতে লাগিলাম, এবং সেই অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তখন আমাদের বয়স অল্প. জলে আগুন জলিতেছে দেখিয়া একটু আনন্দিত এবং তার সঙ্গে একটু আশ্চর্য্যও হইলাম; কিন্তু ব্যাপারটা কি তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। জল লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বালকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল। তারপর অনেক দিন পরে কতক বুঝিয়াছি, জলে এ আগুন কেন জলে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলি।

আমাদের দেশে এ আগুনকে বাড়বাগ্নি বা বাড়বানল বলিয়া থাকে। মহাভারতে ইহার উৎপত্তির যে গল্প আছে তাহা তোমরা অবশ্য পড়িয়া থাকিবে; গল্পটা সংক্ষেপে বলি। কৃতবীর্য্যের বংশের রাজারা একসময় ভৃগু-বংশের রাজাদের কাছে কোন কার্য্য বশতঃ কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন, ভৃগু-বংশের রাজারা সে প্রার্থনা পূর্ণ না করায়, কৃতবীর্য্যের বংশীয় রাজারা অপমানিত হইয়া ভৃগু-বংশীয়দিগকে নিহত করেন; কিন্তু তাঁহাদের বংশের মহিলাগণ হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। এই স্থানে ইহাঁদের ঔর্ব্ব নামে এক পুত্র জন্মে। ঔর্ব্ব কৃতবীর্য্যের বংশধরদের অত্যাচার এবং নিজ পিতৃকুলের বিনাশের সংবাদ অবগত হইয়া, সৃষ্টি ধ্বংশের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। কিন্তু পিতৃলোক এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলাতে, ঔর্ব্ব তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে, তাঁহার ক্রোধরূপ যে অগ্নি তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে হঠাৎ একটা ভয়ানক অশ্বের মস্তক উৎপন্ন হয়, এবং সেই অশ্বের মুখ হইতে ঔর্ব্বের ক্রোধ-অগ্নি নির্গত হইতেথাকে। এই জন্য ইহাকে বাড়বানল বা বাড়বাগ্নি বলা হয়। বাড়বা অর্থে ঘোটকী। এই ত গেল পুরাণের কল্পনা।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেক মত আছে; সে সকল মতামত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কেহ বলেন সমুদ্র জলে ফস্ফরস্ নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাহাতে বায়ুর যোগ হইলেই জলিয়া উঠে; কেহ বা বলেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির তাড়িৎবিশিষ্ট মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যেমন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়; ইহাতেও তেমনি বিভিন্ন প্রকৃতির তাড়িৎবিশিষ্ট সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে এই উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার আরও অনেক মত আছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকেরা ইহার অন্য আর এক কারণ স্থির করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন এক প্রকার সামুদ্রিক কীটই এই বাড়বানলের মূল। একজন ইহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্রে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের শরীর পচিলে তাহা হইতে বাড়বানলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবন্ত প্রাণীর দেহ হইতে যে এই আলোক উৎপন্ন হয়, তাহার একটী বিবরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল। ডাক্তার বুকানন জাহাজে চড়িয়া ভারত মহাসাগরের উত্তর ভাগ দিয়া যাইতেছিলেন, একদিন দেখিলেন, সন্ধ্যার পর হইতেই সমুদ্রজল ক্রমে সাদা হইয়া উঠিতেছে, রাত্রি আটটার পর

দেখিলেন যে, আকাশে ছায়াপথ যেমন উজ্জ্বল, সমুদ্র জলও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াপথে যেমন অযুত উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়, সমুদ্র জলেও তেমনি অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা জ্বলিতেছে। রাত্রি দুই প্রহরের পর এই উজ্জ্বলতা ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে আর উজ্জ্বলতা একেবারেই দেখা গেল না। ডাক্তার বুকানন বিস্মিত হইয়া সেই স্থানের খানিকটা সমুদ্র জল তুলিয়া লইলেন এবং সেই জল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ্তিশীল কীটাণু রহিয়াছে। এই কীটাণুগুলির শরীর হইতে এই আলোক নির্গত হইতেছে।

আর একজন সাহেব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, এক প্রকার মৎস্য হইতে এই আলোক নির্গত হয়। এই মৎস্যের আকার গোল, ইহারা ইহাদিগের পক্ষ কম্পিত করিলেই তাহা হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে। এ ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার মৎস্য হইতে আলোক নির্গত হয়, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ ইস্পাতের মত, শরীরের নীচের দিকে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, ইহারা যখন সন্তরণ করে, তখন এই গর্ত্ত হইতে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইতে থাকে। যখন ইহারা অধিক উত্তেজিত হয়, তখন গর্ত্ত হইতে আলোক নির্গত না হইয়া মস্তক শরীর হইতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকে। বাড়বানল সকল সময় সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় না। ইহা কখনও বা ক্ষীণ আলোকের ন্যায়, কখনও বা অতিশয় উজ্জ্বল, কখনও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, কখনও স্থির দৃষ্ট হয়। সমুদ্রেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়, যদি ইচ্ছা হয় পাঠক পাঠিকাগণ চক্ষে দেখিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারেন।

মামথ।

মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সেবারে মামথ সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলি নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় যুগে মামথের সৃষ্টি হয়। এখন আর মামথ পৃথিবীতে নাই, পৃথিবীর এখনকার অবস্থা মামথের জীবন ধারণের উপযোগী নয়, এইজন্য মামথ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। মামথের স্থান এক্ষণ হস্তিদ্বারা কতক পূরণ হইয়াছে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম মামথের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। লেনা নদীর তীরে একদিন একজন ধীবর মামথদন্তের অন্বেষণ করিতে করিতে, কতক দূর গিয়া একটী দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। সে দেখিল বরফরাশীর মধ্যে একটা অতি প্রকাণ্ড জীব আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ সে ভয়ে তাহার নিকটেও গেল না; কিন্তু কয়েক বৎসর গত হইলে পর একদিন সে সাহস করিয়া এই প্রকাণ্ড জীবের দিকে অগ্রসর হইল। নিকটস্থ হইয়া দেখিল যে, সে যে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এমন কোন ভাবই প্রকাশ করিতেছে না। তখন তাহার সাহস একটু বাড়িল; তখন আরও অগ্রসর হইল, দেখিল যাহার নিকট সে এতদিন ভয়ে অগ্রসর হয় নাই সে জীবিত নহে, মৃত। তখন মহানন্দে এই প্রকাণ্ড জীবের প্রকাণ্ড দন্ত দুইটী সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল; শরীরের অবশিষ্টাংশ শ্যাল শকুনী প্রভৃতির অনুগ্রহে অচিরেই অদৃশ্য হইয়া গেল। দুইবৎসর পরে একজন বৈজ্ঞানিক সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার

এই বিলম্বটুকু হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার অদৃষ্টে কেবলমাত্র ইহার অস্থিপঞ্জরই ছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একজন রুসীয় কর্ম্মচারী উত্তর সাইবেরিয়াতে জরিপ করিতে গিয়া একটী প্রকাণ্ড মামথ প্রাপ্ত হন। মামথটী যে অবস্থায় পাওয়াগিয়াছিল তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, মামথটী কর্দ্দমময় জলাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে, হঠাৎ সেই কর্দ্দমে তাহার পা বসিয়া যায়। সেই কর্দ্দম হইতে উঠিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছে, ততই কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; এবং সেই অবস্থায়ই তাহার জীবন লীলা শেষ হইয়াছে। ক্রমে তাহার মৃতদেহের উপরে মৃত্তিকা প্রভৃতি স্তরে স্তরে জমিয়া গিয়াছে। এইরূপে কত সহস্র বৎসরের মৃত্তিকা এবং অন্যান্য পদার্থ শরীরের উপর জমিয়া গিয়াছিল কে বলিতে পারে? যেস্থানে এই প্রকাণ্ড জীবটী মৃত্তিকা মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল, একটা বন্যায় সেইস্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, ইহার প্রকাণ্ড দেহ বাহির হইয়া পড়িল। রুসীয়-কর্ম্মচারী এই সময় সেইস্থানে উপস্থিত হন এবং ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেন। ইহার সে সময় দেহে কেবল জীবন ছিল না; নতুবা আর সমস্তই অটুট ছিল, কিছুই নষ্ট হয় নাই।

মামথ হস্তির ন্যায় অনেকটা দেখিতে; কিন্তু হস্তি যেমন কদাকার, মামথ তেমন কদাকার নহে; আরবদেশীয় ঘোড়া যেমন ঘোড়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী, মামথও তেমনি হস্তিজাতীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। হস্তিঅপেক্ষা মামথ অনেক বড়। যে মামথটীর কথা উল্লিখিত হইল, তাহার উচ্চতা তের ফিট্, পোনের ফিট লম্বা, দন্তগুলি আট ফিট লম্বা, ছয় ফিট লম্বা শুণ্ড, এবং দেড় ফিট চওড়া অতি বৃহৎ চারিখানি পা। ইহাদের সর্ব্বশরীর ঘন সুন্দর কেশে আবৃত।

উদ্ভিদের আহার।

যদি খাওয়ার দরকার না থাকিত, তবে পৃথিবীর এত উন্নতি হইত না। পেটের জ্বালা আছে বলিয়াই মানুষ এত খাটে, এত পরিশ্রম করে। না থাকিলে এত শিল্প, এত বিজ্ঞান, এত উন্নতি আমরা দেখিতাম না; মানবজাতি নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা ও অলসতায় দিন যাপন করিত। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা এমনি একটী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রায় দিন কাটাইলে মানুষের চলেনা, নিশ্চিন্ত মনে অলসতায় গা ঢালিয়া দিয়া মানুষের থাকিবার উপায় নাই। খাইতে হইবেই, না খাইলে জীবনরক্ষা হইবেই না।

যেমন আমরা জীবনরক্ষার জন্য আহার করি, সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই তেমমি কিছু না কিছু আহার করে; না খাইলে কাহারও রক্ষা নাই। আজ উদ্ভিদের আহারের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব। সচরাচর উদ্ভিদেরা কি খায়, তাহা আজ বলিব না; উদ্ভিদের আহার সম্বন্ধে যে দু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা গিয়াছে তাহাই বলিব।

সচরাচর উদ্ভিদেরা নিরামিষাশী; সূর্য্যের আলোক এবং মৃত্তিকার রসই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন নিরামিষাশী ও মাংসাশী দুই আছে; কতক লোকের নিরামিষ আহারে তৃপ্তি হয়, অপর কতক লোকের মৎস্য মাংস না হইলে তৃপ্তি হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যেও এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ

দেখিতে পাওয়া পায়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ নিরামিষ আহারেই তৃপ্ত থাকে, সূর্য্যের আলোক প্রভৃতি ব্যতীত তাহারা আর কিছু খায় না। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাহাদের মৎস্য মাংস না হইলে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সংখ্যা অতি অল্প। কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা নিম্নে সংগৃহীত হইল।

Sun-dew অর্থাৎ "সূর্য্য-শিশির" নামক এক প্রকার ফুলের গাছ আছে, ইহাদিগের এমনি আশ্চর্য্য প্রকৃতি, ইহারা কীট পতঙ্গ আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করে। ইহার পাতা আদ্ইঞ্চি পরিমাণ এবং গোলাকার। পাতাগুলির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘোর লাল রংএর কেশের মত আছে। প্রত্যেক কেশের মাথায় একটী অতি ক্ষুদ্র থলির মত দেখা যায়, এই থলির মধ্যে একটু রস থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য তেজ যত অধিক হয়, এই থলিগুলি ততই রসে পূর্ণ হইতে থাকে। যদি কোন ক্ষুদ্র কীট বা মাছি এই পাতার উপর আসিয়া বসে, তবে আর রক্ষা থাকে না। বেচারি যত পলাইতে চেষ্টা করে, থলির মধ্যের রস ততই তাহার গায়ে লাগিতে থাকে, এবং সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ জালে সে একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অল্পকাল পরেই দেখা যায় যে, ইহাদিগের শরীরের সারাংশ অদৃশ্য হইয়াছে; "সূর্য্য-শিশির" এই কীট বা পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছেন, কীট পতঙ্গই "সূর্য্য-শিশিরের" প্রধান আহার।

আর একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, তাহাদিগকে Fly catch অর্থাৎ "মাছি-ধরা" বলে। আফিংখোরেরা ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে মাছি ধরে এ তাহা নহে। ইহারা সত্য সত্যই মাছি ধরিয়া খায়। ইহাদিগের প্রত্যেক পাথার উভয়দিকে শুয়া পোকার কাঁটার মত কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতার উপরের দিকে একপ্রকার মিষ্ট রস জন্মে; মাছিগুলি এই রসের লোভে পাতার উপর বসিবা মাত্র, পাতাটী মুদিত হইয়া যায়। এবং যে পর্য্যন্ত ভিতরে আবদ্ধ কীট জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ আর উহা পুনরায় প্রস্ফুটিত হয় না।

Venus' fly-trap, "ভিনসের মাছি-ধরা" নামক একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, এই গাছের পাতাগুলির অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী ক্ষুদ্র পাতার ন্যায় হয়। এই দুইটী ক্ষুদ্র পাতার উপর কয়েকটা লম্বা কাঁটা থাকে; কোন কীট বা পতঙ্গ ঐ কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র পাতা দুইটীর কোনটীর উপর বসিলে, তৎক্ষণাৎ পাতা দুইটী বুজিয়া যায়। মধ্যে আবদ্ধ কীটের কি দশা তখন হয়—সহজেই বুঝিতে পার।

এইত গেল কীট পতঙ্গ ভক্ষক উদ্ভিদের কথা। মৎস্য, মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষক উদ্ভিদের কথা এখন বলি। এই জাতীয় উদ্ভিদ ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা পুকুরে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের অর্দ্ধেক জলের উপরে এবং অর্দ্ধেক জলের মধ্যে থাকে। জলের উপরে যে ভাগ থাকে, তাহার মাথায় পেয়ারার ন্যায় আকারের একটা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা জলে পূর্ণ। ইহার যে দিকটা সরু, সেই দিকে একটা মুখ আছে; এই মুখের চারিদিকে শুয়াপোকার কাঁটার মত কাঁটা আছে, ইহার মুখের পশ্চাদ্ভাগে একটী স্বচ্ছ কপাট আছে, বাহির হইতে অল্প ঠেলিলেই তাহা খুলিয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কোনমতেই খোলে না। এই কপাট খুব পাত্লা এবং স্বচ্ছ, এইজন্য ভিতরে জল থাকাতে অতি উজ্জ্বল দেখায়। এই উজ্জ্বলতায় কীট, পতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যান্য মাংসাশী এক প্রকার রসের দ্বারা কীট-পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া

থাকে; কিন্তু ইহারা তাহা করে না। ভিতরে যে জীব প্রবেশ করে সে গুলি না পচিলে ইহারা তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। জীবগুলি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না, সুতরাং মরিয়া যায়। তার পর যখন পচে তখন ইহারা সেগুলিকে জীর্ণ করিয়া নিজ শরীর পরিপুষ্ট করে।

তার পর মাংসাশী উদ্ভিদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথা শেষ করিব। এ গল্পটা তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া পুরাতন কথাটাও বলিতে হইল। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আফ্রিকা ভ্রমণ কালে এই ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন ইনি একটী কাফ্রী বালক ভৃত্যের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছেন, এমন সময় একটী হরিণ দেখিতে পাইলেন। হরিণটা তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের দিকে দৌড়িল; কিছু কাল পরে হরিণটাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সেই কাফ্রী বালকও হরিণের পশ্চাতে দৌড়িয়াছিল, বালক বৃক্ষের নিকট যাইবামাত্র বৃক্ষটা তাহার শাখাগুলি প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বালক বৃক্ষশাখার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেব ভৃত্যের চীৎকার শুনিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখেন যে ইহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে, খুব ঝড়ের সময় যেমন গাছের ডাল পালা সঞ্চালিত হয়, তিনি নিকটে গেলে ইহার শাখাগুলিও তেমনি আন্দোলিত হইতে লাগিল, যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে। বাস্তবিকই তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য ইহার শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত হইতেছিল। সাহেব উদ্ভিদের এই প্রকার ভয়ঙ্কর মাংস-স্পৃহা দেখিয়া চমকিত হইলেন। আমরা হইলে হয়ত ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম। কিন্তু সাহেব দূর হইতে ক্রমাগত বৃক্ষের উপর গুলি করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ইহার শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এবং এক প্রকার অতি দুর্গন্ধ রসে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। বৃক্ষটা গুলির আঘাতে ক্রমে শাখাশূন্য হইলে সাহেব একখানা কুঠার লইয়া বৃক্ষটাকে ভূমিসাৎ করিলেন। পরে সেই বৃক্ষের ডালপালার ভিতর সেই হরিণটা এবং সেই কাফ্রী বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন; বৃক্ষের পাতা বালকের শরীরে এমন ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে যে, তাহা আর কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না; সেই ভাবেই তাহাকে গোর দেওয়া হইল। সৃষ্টির মধ্যে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে কে বলিতে পারে?

"স্বভাব যায় না ম'লে
আর
ময়লা যায় না ধুলে।"

কথিত আছে বিখ্যাত কবি দান্তের একটী বিড়াল ছিল। বিড়ালটি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত, আহার এবং শয়ন করিবার সময় ত নিকটেই থাকিত কিন্তু তাহা ভিন্ন কবি রাত্রে যতক্ষণ বসিয়া লেখা পড়া করিতেন বিড়ালটি ততক্ষণ

দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ নিরামিষ আহারেই তৃপ্ত থাকে, সূর্য্যের আলোক প্রভৃতি ব্যতীত তাহারা আর কিছু খায় না। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাহাদের মৎস্য মাংস না হইলে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সংখ্যা অতি অল্প। কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা নিম্নে সংগৃহীত হইল।

Sun-dew অর্থাৎ "সূর্য্য-শিশির" নামক এক প্রকার ফুলের গাছ আছে, ইহাদিগের এমনি আশ্চর্য্য প্রকৃতি, ইহারা কীট পতঙ্গ আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করে। ইহার পাতা আদ্‌ইঞ্চি পরিমাণ এবং গোলাকার। পাতাগুলির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘোর লাল রংএর কেশের মত আছে। প্রত্যেক কেশের মাথায় একটী অতি ক্ষুদ্র থলির মত দেখা যায়, এই থলির মধ্যে একটু রস থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য তেজ যত অধিক হয়, এই থলিগুলি ততই রসে পূর্ণ হইতে থাকে। যদি কোন ক্ষুদ্র কীট বা মাছি এই পাতার উপর আসিয়া বসে, তবে আর রক্ষা থাকে না। বেচারি যত পলাইতে চেষ্টা করে, থলির মধ্যের রস ততই তাহার গায়ে লাগিতে থাকে, এবং সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ জালে সে একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অল্পকাল পরেই দেখা যায় যে, ইহাদিগের শরীরের সারাংশ অদৃশ্য হইয়াছে; "সূর্য্য-শিশির" এই কীট বা পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছেন, কীট পতঙ্গই "সূর্য্য-শিশিরের" প্রধান আহার।

আর একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, তাহাদিগকে Fly catch অর্থাৎ "মাছি-ধরা" বলে। আফিংখোরেরা ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে মাছি ধরে এ তাহা নহে। ইহারা সত্য সত্যই মাছি ধরিয়া খায়। ইহাদিগের প্রত্যেক পাথার উভয়দিকে শুয়া পোকার কাঁটার মত কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতার উপরের দিকে একপ্রকার মিষ্ট রস জন্মে; মাছিগুলি এই রসের লোভে পাতার উপর বসিবা মাত্র, পাতাটী মুদিত হইয়া যায়। এবং যে পর্য্যন্ত ভিতরে আবদ্ধ কীট জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ আর উহা পুনরায় প্রস্ফুটিত হয় না।

Venus' fly-trap, "ভিনসের মাছি-ধরা" নামক একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, এই গাছের পাতাগুলির অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী ক্ষুদ্র পাতার ন্যায় হয়। এই দুইটী ক্ষুদ্র পাতার উপর কয়েকটা লম্বা কাঁটা থাকে; কোন কীট বা পতঙ্গ ঐ কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র পাতা দুইটীর কোনটীর উপর বসিলে, তৎক্ষণাৎ পাতা দুইটী বুজিয়া যায়। মধ্যে আবদ্ধ কীটের কি দশা তখন হয়—সহজেই বুঝিতে পার।

এইত গেল কীট পতঙ্গ ভক্ষক উদ্ভিদের কথা। মৎস্য, মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষক উদ্ভিদের কথা এখন বলি। এই জাতীয় উদ্ভিদ ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা পুকুরে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের অর্দ্ধেক জলের উপরে এবং অর্দ্ধেক জলের মধ্যে থাকে। জলের উপরে যে ভাগ থাকে, তাহার মাথায় পেয়ারার ন্যায় আকারের একটা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা জলে পূর্ণ। ইহার যে দিকটা সরু, সেই দিকে একটা মুখ আছে; এই মুখের চারিদিকে শুয়াপোকার কাঁটার মত কাঁটা আছে, ইহার মুখের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী স্বচ্ছ কপাট আছে, বাহির হইতে অল্প ঠেলিলেই তাহা খুলিয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কোনমতেই খোলে না। এই কপাট খুব পাত্‌লা এবং স্বচ্ছ, এইজন্য ভিতরে জল থাকাতে অতি উজ্জ্বল দেখায়। এই উজ্জ্বলতায় কীট, পতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যান্য মাংসাশী এক প্রকার রসের দ্বারা কীট-পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া

থাকে; কিন্তু ইহারা তাহা করে না। ভিতরে যে জীব প্রবেশ করে সে গুলি না পচিলে ইহারা তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। জীবগুলি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না, সুতরাং মরিয়া যায়। তার পর যখন পচে তখন ইহারা সেগুলিকে জীর্ণ করিয়া নিজ শরীর পরিপুষ্ট করে।

তার পর মাংসাশী উদ্ভিদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথা শেষ করিব। এ গল্পটা তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া পুরাতন কথাটাও বলিতে হইল। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আফ্রিকা ভ্রমণ কালে এই ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন ইনি একটী কাফ্‌রী বালক ভৃত্যের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছেন, এমন সময় একটী হরিণ দেখিতে পাইলেন। হরিণটা তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের দিকে দৌড়িল; কিছু কাল পরে হরিণটাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সেই কাফ্‌রী বালকও হরিণের পশ্চাতে দৌড়িয়াছিল, বালক বৃক্ষের নিকট যাইবামাত্র বৃক্ষটা তাহার শাখাগুলি প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বালক বৃক্ষশাখার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেব ভৃত্যের চীৎকার শুনিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখেন যে ইহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে, খুব ঝড়ের সময় যেমন গাছের ডাল পালা সঞ্চালিত হয়, তিনি নিকটে গেলে ইহার শাখাগুলিও তেমনি আন্দোলিত হইতে লাগিল, যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে। বাস্তবিকই তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য ইহার শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত হইতেছিল। সাহেব উদ্ভিদের এই প্রকার ভয়ঙ্কর মাংস-স্পৃহা দেখিয়া চমকিত হইলেন। আমরা হইলে হয়ত ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম। কিন্তু সাহেব দূর হইতে ক্রমাগত বৃক্ষের উপর গুলি করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ইহার শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এবং এক প্রকার অতি দুর্গন্ধ রসে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। বৃক্ষটা গুলির আঘাতে ক্রমে শাখাশূন্য হইলে সাহেব একখানা কুঠার লইয়া বৃক্ষটাকে ভূমিসাৎ করিলেন। পরে সেই বৃক্ষের ডালপালার ভিতর সেই হরিণটা এবং সেই কাফ্‌রী বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন; বৃক্ষের পাতা বালকের শরীরে এমন ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে যে, তাহা আর কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না; সেই ভাবেই তাহাকে গোর দেওয়া হইল। সৃষ্টির মধ্যে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে কে বলিতে পারে?

"স্বভাব যায় না ম'লে
আর
ময়লা যায় না ধুলে।"

কথিত আছে বিখ্যাত কবি দান্তের একটী বিড়াল ছিল। বিড়ালটি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত, আহার এবং শয়ন করিবার সময় ত নিকটেই থাকিত কিন্তু তাহা ভিন্ন কবি রাত্রে যতক্ষণ বসিয়া লেখা পড়া করিতেন বিড়ালটি ততক্ষণ

গুলি তৈয়ারি হইয়া যখন বেশ শুষ্ক হয় তখন কারিকরেরা তাহাদের উপর কোন একটি জলীয় রং মাথাইয়া প্রথমে "জমি" প্রস্তুত করে। তাহার পর ঐ জমির উপর অপরাপর নানা বর্ণের রঙ্গে তুলি দ্বারা ঠিক শালের নমুনায় কল্কা, ফুল, পাতা প্রভৃতি সুন্দর ভাবে চিত্র করিয়া জিনিসগুলিকে সাজান হয় ও অবশেষে বার্ণিস মাথাইয়া ঐ সমস্ত রংকে ঢাকিয়া স্থায়ী করা হয়। এক টাকা হইতে পঞ্চাশ যাইট টাকা পর্য্যন্ত এক একটি জিনিস তৈয়ার হইয়া থাকে!! ইহার শোভা ও কারু-কার্য্য দেখিলে বাস্তবিকই মনে বড় সুখ হয়।

কাশ্মীরের দেখা দেখি পঞ্জাবের মধ্যে অমৃতসর ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে বিজনৌর ও জৌনপুরেও এইরূপ অনেক জিনিস তৈয়ারি হইয়া থাকে। অমৃতসরের দ্রব্যগুলি অনেকটা কাশ্মীরের নমুনাতেই তৈয়ারি হয়, কিন্তু তত ভাল হয় না। উত্তর-পশ্চিমের দ্রব্যগুলির কারু-কার্য্য কাশ্মীরের কারু-কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কখন শুদ্ধ ঘোর সবুজ বর্ণের জমির উপর সোনালী ফুল কাটা, কখনও বা অপর পাঁচ রঙ্গের নানা প্রকার যে সকল চিত্র কার্য্য দেখা যায় সেগুলি কাশ্মীরের শালের নমুনার মত তত সুন্দর ও সূক্ষ্ম নয়, এজন্য জিনিসগুলির মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। জৌনপুরের কলেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে গবর্ণমেণ্ট একটি (Papier-mâche factory) কাগজ নির্ম্মিত দ্রব্যের কারখানা খুলিয়াছেন। তথায় কোন একটী কাশ্মীরী চিত্রকরের তিনটি বালক শিষ্য-কার্য্য করিয়া থাকে। বিজনৌর জেলার মধ্যে মান্দাবার নামক গ্রামই এই কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

উপহার।

গত ৯ই মার্চ্চ জর্ম্মানীর সম্রাট প্রথম উইলিয়াম ৯২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সমগ্র জর্ম্মানী রাজ্যে একতা স্থাপন করিয়াছেন এবং কি বিদ্যানুশীলনে কি যুদ্ধ বিগ্রহে জর্ম্মানীকে আদর্শভূমি করিয়া গিয়াছেন। ইনিই জর্ম্মানীর প্রথম সম্রাট। ইনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী আজ ইহাঁর শোকে সন্তপ্ত। মৃত সম্রাটের জীবনের অনেকগুলি উপদেশপূর্ণ গল্প আছে আজ তাহার কয়েকটী উপহার দিব।

এক দিন সম্রাট বার্লিন সহরের একটী রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র স্কুলে ঢুকিলেন এবং মনোযোগ পূর্ব্বক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়া শুনিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পীয়ন আসিয়া সেই স্কুলের শিক্ষকের হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিল—টেলিগ্রামে শিক্ষকটীর মাতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা ছিল। শিক্ষক মহাশয় বড় চিন্তিত হইলেন—কিন্তু কেমন করিয়া স্কুল ফেলিয়া যাইবেন। সম্রাট শিক্ষকের মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া তাহাকে টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া শিক্ষককে বিদায় দিলেন। এবং নিজে স্কুলের ভার লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষকতা করিলেন। পরে একজন স্কুল পরিদর্শক আসিলে তাহাকে স্কুলের ভার দিলেন এবং যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষক ফিরিয়া না আসিয়াছিল সে

পর্য্যন্ত প্রায়ই খবর লইতেন। এই গল্পটীতে বেশ বুঝা যায় যে, সম্রাটের খুব মহৎ অন্তঃকরণ ছিল।

প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই মান্য ব্যক্তির নিকট কোটের বোতাম খুলিয়া থাকা অসভ্যতার চিহ্ন। সম্রাটের অভ্যাস ছিল, যখনি রাজবাড়ীর প্রহরীদের বদলী হইত তখনী জানালায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেন। এক দিন এক জন প্রহরীর কোটের একটী বোতাম খোলা ছিল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া খুব ধমকাইলেন এবং বলিলেন "একটী খোলা বোতাম কোটই সমস্ত সৈন্যের সর্ব্বনাশের কারণ।" একথাটী কেমন উপদেশ পূর্ণ--অনেক সময় আমরা প্রথম হইতে কোন বিষয়ের লক্ষ্য করি না—কিন্তু শেষে বিপদে পড়িতে হয়। প্রথম হইতে কোন বিষয়ের লক্ষ্য থাকিলে অনেক সময়ে আমাদিগের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এই উপদেশ বাক্যটী সকলেরই মনে রাখা উচিত।

সদোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট ও তাঁহার প্রিয় সৈন্যদল সর্ব্বাগ্রে ছিলেন। এদিকে চারিদিক হইতে গোলা গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী বিস্মার্ক সম্রাটের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। সম্রাট বলিলেন "আমার সৈন্যেরা কামানের মুখে আছে, আমি কেমন করিয়া সরিয়া যাইব আমার ইহাদের মধ্যে থাকাই উচিত।" অবশেষে বিস্মার্ক অত্যন্ত বিপদ দেখিয়া বলিলেন "আমি আপনার মন্ত্রী, আপনার জীবন এরূপ বিপদাপন্ন দেখিতে পারি না"—এই বলিয়া সম্রাটের অশ্বকে এক লাথি মারিলেন—অমনি অশ্ব সম্রাটকে লইয়া সরিয়া গেল।

সম্রাট বড় মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি ভৃত্যদিগের উপর কখন কর্কশ ব্যবহার করিতেন না—"তোমার এটী করা ভাল হয় নাই" ইহা অপেক্ষা কর্কশ কথা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। আমাদের ভারতেশ্বরী ২০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাটকে একটী বহুমূল্য বাটী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সম্রাট প্রত্যহ এই বাটীটি ব্যবহার করিতেন। এক দিন হঠাৎ বাটীটি ভাঙ্গিয়া গেল। যে ভৃত্য দুইটীর নিকট বাটীটি ছিল তাহারা সম্রাটকে সমস্ত বলিল। সম্রাট শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা বেশ, আমার কাছেও উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিত।"

সম্রাট বড় কৌতুক-প্রিয় ছিলেন। এক দিন কয়েক জন শীকারী লইয়া হরিণ শীকার করিতে গিয়াছিলেন—শীকার শেষ হইলে পর কে কয়টী হরিণ মারিয়াছে গুণিতে আরম্ভ করিলেন। শীকারীরা সম্রাটকে খোসামোদের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল আপনি ২৮ টী মারিয়াছেন। সম্রাট ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমি মোটে ২৫ টী গুলি আনিয়াছিলাম—আর ২৮ টী মারিলাম এত মন্দ নয়—এ একরকম অলৌকিক ঘটনা বিশেষ।—

গত ১৮ই মার্চ্চ সম্রাটের সমাধিক্রিয়া মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান নৃপতিরা উপস্থিত ছিলেন। বার্লিন সহর লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। এত লোকে পূর্ব্বে কখন কোন ঘটনায় একত্র হয় নাই।

মৃত সম্রাট ছয় জন পোপ; ৮ জন সম্রাট; ৫২ জন রাজা; ৬ জন সুলতান ও ২১ জন প্রেসিডেণ্ট দেখিয়াছিলেন।

(প্রাপ্ত)

অধ্যবসায়।

(বালকের রচনা।)

পৃথিবীতে উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই অধ্যবসায়ের আবশ্যক। একবার কোন কার্য্যে বিফল প্রযত্ন হইলে "হা'ল" ছাড়িয়া দেওয়া কথনও কর্ত্তব্য নয়। প্রায়ই দেখা যায় যদি কেহ একবার কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন, তবে দ্বিতীয়বার তাহার জন্য আর কোন চেষ্টা করেন না, ইহা কথনও ন্যায়সঙ্গত নয়। উৎসাহ ও অধ্য-বসায় থাকিলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহৎ কার্য্যই সম্পাদনে সমর্থ হওয়া যায়। অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, আমি ইহা "পারি না"; যদি পৃথিবীতে বড় লোক হইতে চাও তবে "পারি না" কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন "অন্যে যাহা করিয়াছে প্রত্যেকেই তাহা করিতে পারে।" সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রথম দৃঢ় ইচ্ছা চাই— ইচ্ছা থাকিলেই তাহার পথ আছে—যদি ইচ্ছা থাকে তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, এই কথাটি সম্পূর্ণ যথার্থ। এই যে এক্ষণ বিজ্ঞানের উন্নতিতে রেল, তার প্রভৃতি দেখিতেছ ইহা এক দিনের পরিশ্রমে সম্পন্ন হয় নাই, ইহাতে অনেক অধ্যবসায় ও অনেক পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছে।

যদি মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখে সচ্ছন্দে গৃহে বসিয়া থাকিলে হইবে না। এক জন পণ্ডিত বলেন "ঘুড়ী বাতাসের বিপরীত দিকেই উড়ে, কিন্তু যে দিক্ হইতে বায়ু বহে সে দিকে উড়ে না, সেই প্রকার পৃথিবীতে বড় লোক হইতে হইলে সুখে সচ্ছন্দে বসিয়া থাকিলে হইবে না।" অধ্যবসায় চাই, পরিশ্রম চাই, যত্ন চাই।

এই যে আজকাল রেলের গাড়ী দেখিতেছ— যাহাতে ৭ দিনের পথ একদিনে যাইতেছ;—— ইহার উৎপত্তি কিসে জান? জেমস্ ওয়াট্ কটাহে চা জাল দিবার সময় দেখিলেন যে, কটাহের উপরস্থ আবরণ (ঢাকনী) একবার বাষ্পের বেগে উপরে উঠিতেছে আবার পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তাহার মনে প্রথম উদিত হইল যে, বাষ্পের জোর আছে, তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াও আর অধিক কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে জর্জ ষ্টিফেন্সন অনেক পরিশ্রম অনেক অধ্যবসায়ের পর রেলের গাড়ীর প্রথম সৃষ্টি করিলেন। ইহা চালাই-বার ৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে কত চিন্তা করিয়াছিলেন, কতবার বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। অনেক পরিশ্রম অনেক অধ্যবসায়ের পর শেষে কৃতকার্য্য হন। কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়!

একটি ইংরাজী প্রবাদ আছে যে "রোম এক-দিনে নির্ম্মিত হয় নাই" ইহার ভাবার্থ এই যে কোন মহৎ কার্য্যই এক দিনের পরিশ্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না, অনেক ধৈর্য্য, অনেক অধ্যব-সায়ের দরকার।

তোমরা কি স্কটলণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের নাম শুন নাই? তিনি যথন বার বার ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন, যথন তাঁহার হৃদ-য়ের সমস্ত আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল, তথন তিনি একদিন নিরাশ হৃদয়ে একটি পর্ব্বস্থ গুহায় বসিয়া-ছিলেন, তাঁহার চিত্ত চিন্তায় অস্থির, তিনি ভাবি-লেন আর যুদ্ধ করিব না, এমন সময়ে দেখিতে

পাইলেন যে, একটী মাকড়সা তাহার জালে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে আবার পড়িয়া যাইতেছে, এক-বার, দুইবার করিয়া ছয়বার পড়িয়া গেল তথাপিও চেষ্টা করিতে লাগিল অবশেষে ৭ম বারে উঠিতে সক্ষম হইল। ইহা দেখিয়া ব্রুসের মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল, তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল, তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি-লেন, যে প্রকারে হউক স্কট্লণ্ড স্বাধীন করিব। তিনি নবীন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এমন না হইলে কি সংসারে বড় হইতে পারে, যদি বড় হইতে চাও তবে ব্রুসের ন্যায় অধ্যবসায়ী হও। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে, ডাক্তার আর্ণল্ড বলেন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দেখা যায় একটী বালক অন্যটি হইতে ভাল, তাহার কারণ যে কেবল অন্যটির মেধা বেশী তাহা নহে, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই তাহার প্রধান কারণ। যদি পৃথিবীতে গণ্য মান্য হইতে চাও তবে অধ্যবসায়ী হও। তোমরা কি ব্রুহামকে জান? তিনি ৬০ বৎসর কাল আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া অবশেষে রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। তিনি এতদূর অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, লোকে বলিত যদি তিনি চর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তথাপিও তাহাতে সমস্ত ইংলণ্ডে প্রথম না হইয়া ছাড়িতেন না।

যত্নের সহিত অধ্যবসায় থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মিয়াছিলেন সকলই "অসম্ভব" কথাটিকে বড় ঘৃণা করিতেন। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান বলিতেন যে "অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদের অভিধানে পাওয়া যায়"। কেরী সাহেবের নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। তাঁহার বাল্যকালের একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি যে ভাবী জীবনে অধ্যবসায়ী ও বড় হইতে পারিবেন তাহা এই গল্পে স্পষ্ট বুঝা যাইত। একদা তিনি একটি বৃক্ষে আরোহণ করিতে-ছিলেন হঠাৎ তিনি পা পিছলাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এমন কি পা ভগ্ন হইয়া যায়, ইহাতে তিনি কতক দিন শয্যাগত ছিলেন, যথন তিনি পুনর্ব্বার আরোগ্য লাভ করি-লেন, তখন তিনি প্রথমে সেই বৃক্ষে চড়িলেন, তবে ছাড়িলেন। দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়!

কেরী যে ভাবী জীবনে বড় হইতে পারিয়া-ছিলেন এই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব ভ্রাতা ভগ্নীগণ! যদি পৃথিবীতে বড় হইতে চাও মানব সমাজে গণ্য হইতে চাও, তবে অধ্যবসায়ী হও। নদীতে ঝড় দেখিয়া কূলেই "হা'ল" ছাড়িয়া দিও না।

জগন্নাথ।

ন ঋষি তাঁহার শিষ্যের নিকট অনেক তীর্থ স্থানের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়া-ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকল প্রদেশ সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যা হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দেশেই যাঁহাদের বাস তাঁহাদের কপালে স্বর্গভোগ নিশ্চয়ই। যাঁহারা একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, ইহার পবিত্র নদীতে একবার মাত্র অবগাহন করিয়াছেন তাঁহাদের পাপের বোঝা পাহাড়ের মত ভারি হইলেও সকল দোষ হইতে মুক্ত হইবেন। স্বয়ং দেবতারা এই স্থানে থাকিতে ভাল বাসেন। হিন্দুদের এইরূপ বিশ্বাস।

উড়িষ্যা চারিটী বৃহৎ তীর্থক্ষেত্রে বিভক্ত। তীর্থযাত্রী বৈতরণী নদী পার হইয়া যখন কটকের বিশ ক্রোশ উত্তরে প্রশস্ত পথে উপস্থিত হন তখনই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন। তখন যাত্রীর মনের ভাব কি? পশ্চাতে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা, চিন্তা ক্লেশ, তুচ্ছ আমোদ আহ্লাদ সমস্ত ফেলিয়া আসিয়াছে—সম্মুখে স্বর্গের পথ, এতদিনের আশা সফল হইল, স্বয়ং ভগবানকে দেখিতে পাইবে সকলই সুখ ও শান্তিময়। বৈতরণী নদী তীরেই যমালয়। 'যমালয়ে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'। হিন্দুর মরণ কালে ঐ কথাগুলি তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ করিতে হয়। তীর্থ যাত্রীর নদী পার হইবার সময়েও ঐ কথা শুনিতে হয়।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্র ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নর নারী এইখানে তীর্থ করিতে আইসেন। এইখানে জগন্নাথ দেবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। আমরা এবার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কেমন বড় ও সুন্দর ছবি দিলাম। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের স্থান প্রস্তরের বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই বেষ্টিত আয়তনের ভিতর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরটী ১২৬ হাত উচ্চ, কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা দেড় গুণ উচ্চ। মন্দিরটী আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য্যে খোদিত। ইহাতে যেরূপ শিল্প নৈপুণ্য দেখা যায় তাহাতে আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের কারিকরেরা নিজ নিজ ব্যবসায়ে যে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরটী পর পর চারি ভাগে বিভক্ত। বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী অতি উচ্চ স্তম্ভ আছে। তৎপরে প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিস্তৃত প্রাঙ্গন, এইখানে তীর্থযাত্রীরা দল বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠ—সেটী ভোগ গৃহ; তার পর বড় বড় থাম যুক্ত প্রকাণ্ড হল—এটী নাট মন্দির, এইখানে নর্ত্তকীরা নৃত্য ও গায়ক গায়িকারা গান করিতে থাকে। তৎপরে দেবতা দর্শনের নিমিত্ত যাত্রীদিগের দাঁড়াইবার স্থান—এই গৃহের নাম জগমোহন। তৎপরেই আসল দেবালয়। এইখানে বেদীর উপর জগন্নাথ দেব তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রার সহিত উপবিষ্ট আছেন। সকলেই রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মূর্ত্তিগুলি কাষ্ঠের। রূঢ়ভাবে মনুষ্যাকৃতিতে খোদিত। বিগ্রহগুলি হস্তপদাদি বিহীন। মহোৎসবের সময়ে পুরোহিতেরা সোণার হাত পা পরাইয়া দেয়। দেবতার হাত পা নাই কেন? যিনি বিশ্বের পতি তাঁহার ক্ষমতা অসীম। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত সামান্য মানবের ন্যায় হস্ত পদের আবশ্যক হয় না। ঈশ্বর যে নিরাকার এ ভাব ব্যক্ত করিবার এটী অতি সহজ উপায়।

দেবতার নিকট উপহার দিতে হয়। দেবতা ছাগ মহিষ চাহেন না। ইনি কোন জীবের রক্তপাত দেখিতে পারেন না। রক্তপাতে সমস্ত মন্দির অপবিত্র হইয়া যায়। দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, অন্ন, ব্যঞ্জন, ফল মূলাদিতেই দেবতা সন্তুষ্ট। মন্দিরে অপমৃত্যু ঘটিলে সমস্ত মন্দির অপবিত্র হয়। দেবতা ক্রোধ

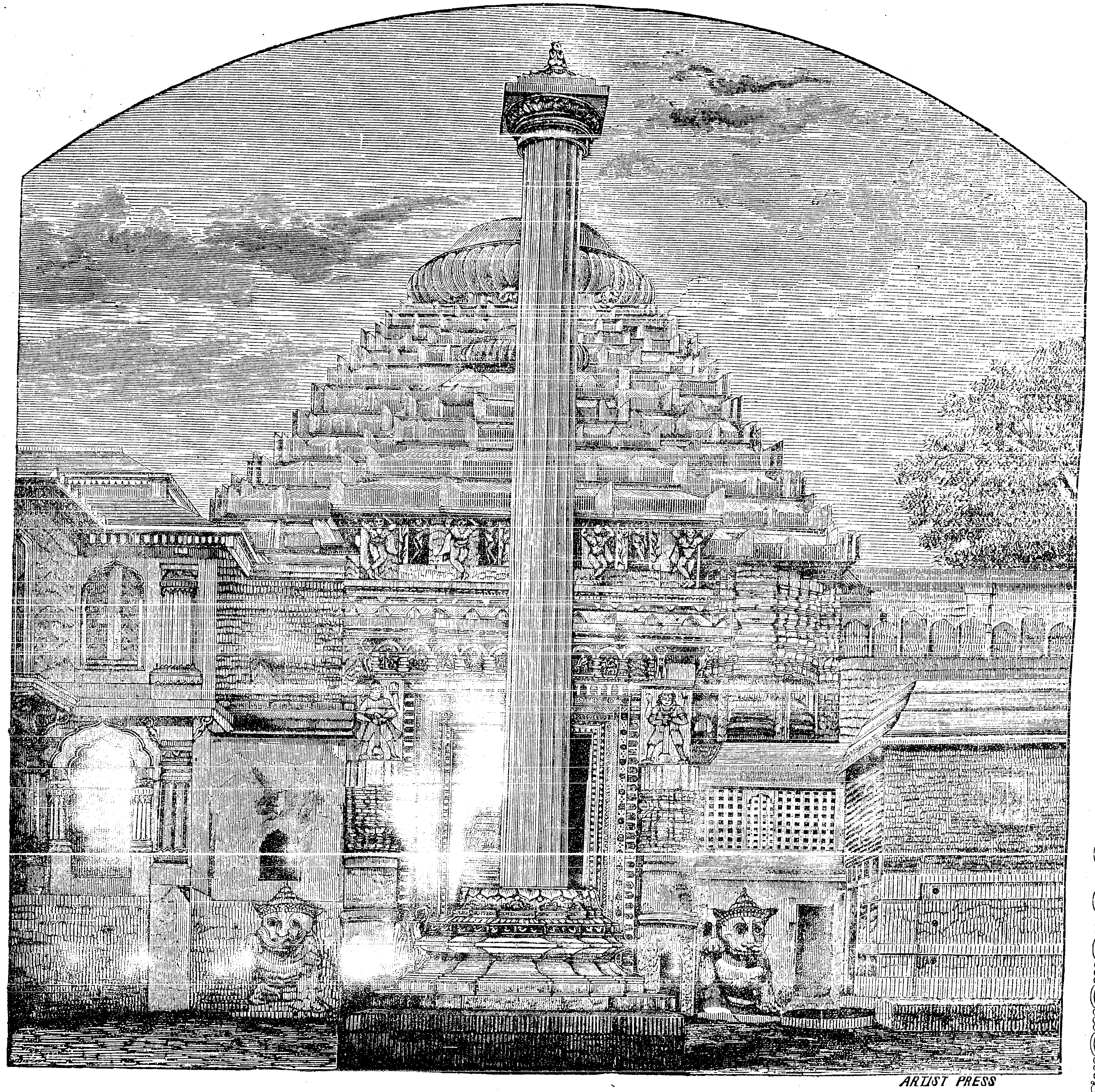

শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির।

ফল ফুল লইয়া প্রাতে কোথায় যায়এবং সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্মণের ইহা জানিবার বড় কৌতূহল জন্মে। তাঁহার স্ত্রী এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া জগন্নাথের পূজার কথা তাঁহাকে বলিল এবং পিতার নিকট যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয়ের পর জামাতাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইল। বসু অনেক ইতস্ততের পর ব্রাহ্মণের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া লইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এক থলিয়া তিল দেন তিনি সেই তিল বুনিতে বুনিতে চলিয়া যান। বসু যদি পথ না বলিয়া দেয় তবে ঐ তিলের চারা হইলে সেই চারাগুলি লক্ষ্য করিয়া বাড়ী আসিতে পারিবেন। অনেক দূর গিয়া বসু তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ দেখেন অক্ষয় বটতলে একখণ্ড নীল প্রস্তর রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে রাখিয়া শবর কিছু দূরে গেল। ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা করিলেন। শবর ফিরিয়া আসিয়া দেবতা দেখিতে পাইল না। দৈববানী হইল "আর আমি জঙ্গলে থাকিতে পারি না, রাঁধা ভাত খাইতে চাই, এখন হইতে আমার নাম জগন্নাথ হইবে।" বসু জামাতাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। ব্রাহ্মণ তৎপরে মালোয়াতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে খবর দিলেন। রাজা সৈন্য সামন্ত লইয়া জঙ্গল কাটাইয়া দেবতা বাহির করিলেন। কিন্তু আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিলেন আমার কি সৌভাগ্য আমি জগন্নাথ বাহির করিয়াছি। দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'তুমি আমার মূর্ত্তি গড়িবে কিন্তু আমায় দেখিতে পাইবে না।' ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু জগন্নাথ নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইলেন না, ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় ব্যস্ত;—রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তপস্যাত আমাদের মত নয়, ব্রহ্মার তপস্যা কত শত বৎসর লাগে। ইতি মধ্যে তাঁহার সিংহাসনে কত রাজা রাজত্ব করিয়া লয় পাইলেন, মন্দিরটীও ক্রমে মাটিতে পুতিয়া যায়, চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। সেই সময়ের রাজা সেই পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, মন্দিরের চুড়া ঘোড়ার পায়ে বাধে। রাজা ভূমি খনন করিয়া মন্দির বাহির করিয়া নিজের বলিয়া দখল করেন। এই সময়ে ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইলেন। দুই জনেই মন্দির আপনার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। মন্দির কাহার—ব্রহ্মা বিষম বিপদে পড়িলেন। সম্মুখে অক্ষয় বটবৃক্ষে ভূষণ্ডী কাক ছিল, ব্রহ্মা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কাকের নিকট জিজ্ঞাসা করায় কাক বলিল ইন্দ্রদ্যুম্নই যথার্থ অধিকারী। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। জগন্নাথকে পাইবার জন্য রাজা তপস্যা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ কিন্তু কাষ্ঠ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। যেখানে পড়িয়াছিলেন সেই স্থান স্বপ্নে রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। এই কাষ্ঠরূপী দেবতার নাম দারুব্রহ্ম। রাজা ৫০০ হাতী ও অনেক লোকজন লইয়া গেলেন, কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া টানাটানি হইল, কাঠ এক চুলও নড়িল না। তখন বসুকে ডাকিবার জন্য দেবতার আদেশ হইল। বসু আসিয়া ধরিবা মাত্র কাষ্ঠ উঠিয়া চলিল। সেই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি গড়িবার জন্য রাজা নানা দেশ হইতে ছুতার আনিলেন। সেই কাঠ যে কাটিতে যায় তাহারই অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে স্বয়ং বিষ্ণু বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশে রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন ২১ দিনের মধ্যে আমি মন্দিরে বসিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া দিব কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বার খুলিতে পারিবে না। রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন। বৃদ্ধ রুদ্ধদ্বারে মূর্ত্তি গড়িতে লাগিলেন। রাণীর ইতিমধ্যে জগন্নাথ

দেখিবার বড় ইচ্ছা হয়। রাজা ও রাণীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা দ্বার খুলিলেন। দেখিতে পাইলেন জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রার তিনটী মূর্ত্তি কোমর পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুভদ্রার হাত একবারেই নাই, জগন্নাথের ও বলভদ্রের হাতের কুনুই পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই প্রবাদের কতটা গল্প কতটা সত্য বলা যায় না।

ইতিহাসে ৩১৮ খৃঃ অঃ জগন্নাথের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে স্বত্তিপুর বা ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রক্তবাহু উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আইসেন। উড়িষ্যার রাজা জগন্নাথদেবকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লয়েন, কেহ কেহ বলেন জগন্নাথকে লইয়াই অরণ্যে পলায়ন করেন। অরণ্যে দেবতা ১৫০ বৎসর ছিলেন। বসু এই মূর্ত্তি পূজা করিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মিত করেন। পুরীতে এখন যে মন্দির বিদ্যমান তাহা ১১৮৪ খৃঃ অঃ উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম দেব গজপতি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে চৌদ্দ বৎসর লাগে, ১১৯৮ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই মন্দির নির্ম্মাণে ও বিগ্রহের রত্নালঙ্কারাদিতে প্রায় ৫ কোটী টাকা ব্যয় হয়। ১৫৫৮ খৃঃ মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া জগন্নাথকে লইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে চিতা রচনা করিয়া দাহ করে। লোকে বলে কালাপাহাড় হাত পা খসিয়া মরিয়া যায়। এক ব্রাহ্মণ সেই অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। গঙ্গা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যান, পরে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরে স্থাপন করে।

জগন্নাথের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, জগন্নাথ বৌদ্ধ দেবতা ও তাঁহার মন্দির বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া বোধ হয়। কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ মিশ্রিত এক দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। জগন্নাথ বা বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার।

গতি ও মতি।

শ্রাবণ মাসের দিন – দেখে লাগে ত্রাস।
পাহাড়ের মত মেঘ ছেয়েছে আকাশ॥
সকাল হইতে পড়ে ঝিমি ঝিমি জল।
পথ ঘাট ভিজে গিয়ে হ'য়েছে পিছল॥
মধু বিধু রাম শ্যাম গতি মতি হরি।
চাদরে জড়ায়ে বই ছাতি হাতে ধরি॥
এ কথা সে কথা ক'য়ে অতি সাবধানে।
গুটি গুটি যেতেছিল পাঠশালা পানে॥
এমন সময় হরি আছাড় খাইয়া।
প'ড়ে গেল, ছাতি বই গেল গড়াইয়া॥
গতি সে সবার বড় তাই না দেখিয়া।
আনন্দে উঠিল হেসে করতালি দিয়া॥
"কি মজা হইল দেখ আহা মরি মরি।
হরি প'ড়ে গেল—সবে বল হরি হরি॥"
মধু বিধু রাম শ্যাম ছিল যারা পাশে।
হরিবোল হাততালি দিয়া সবে হাসে॥
কেবল দেখিয়া তাহা হাসিল না মতি।
হরিরে তুলিতে ছুটে গেল দ্রুতগতি॥

হাতে ধরি' সযতনে তারে উঠাইল।
ছাতি আর বইগুলি আপনি লইল॥
"বেলা বেশি হয় নাই, চল সাথে গিয়ে।
তোমাদের বাড়ী তোমা আগে আসি দিয়ে॥"
এই বলি' হরি সনে হরিদের ঘরে।
সুদুঃখিত মন মতি গেল বরাবর॥
হরিরে দেখিয়া মাতা কাছে এসে তার।
শুনিলেন তারি মুখে সব সমাচার॥
কাদা জল ধুয়ে মুছে দিলেন হরির।
সমাদরে চুম্বিলেন বদন মতির॥
সঙ্গে দিয়ে লোক তার তখনি তাহায়।
দিলেন পাঠিয়ে পাঠশালে পুনরায়॥
মতিরে দেখিয়া কন শিক্ষক তখন।
"আজি কিছু দেরি তব হ'ল কি কারণ?"
মতির সহিত যেই গিয়াছিল তথা।
শিক্ষকেরে নিবেদিল সমুদয় কথা॥
শুনিয়া মতির কাজ গুরু মহাশয়।
মধুর বচনে তারে দিলেন অভয়॥
সবার সম্মুখে হ'য়ে আনন্দে অধীর।
করিলেন বহুতর প্রশংসা মতির॥
মধু বিধু রাম শ্যাম গতির আচার।
শুনে তিনি করিলেন বড় তিরস্কার॥
কহিলেন—"বয়সের বড় বড় নয়।
হৃদয় যাহার বড়, বড় সেই হয়॥
মতি বটে ছোট তোমা সবাকার চেয়ে।
তবু সে সবার বড় ভাল মন পেয়ে॥
আর গতিনাথ বটে বড় সবাকার।
বড় হ'য়ে বড় নন কাজে আপনার॥
প'ড়ে গেল হরি, দেহে পাইল সে ব্যথা।
বল দেখি, কোথা এর আনন্দের কথা?
নীতি পায় পরাজয় যে মনের কাছে।
বনের পশুতে তায় প্রভেদ কি আছে?"
তিরস্কারে তাহাদের মাথা হ'ল নত।
বুঝিল হ'য়েছে কাজ অতি অসঙ্গত॥
মনে মনে কষ্ট কত পাইল তখন।
কষ্ট আরো কত, পরে শুনিল যখন॥
হরির হ'য়েছে জ্বর গায়ের ব্যথায়।
ছট্ ফট্ করিতেছে প'ড়ে বিছানায়॥
একটু হাসিতে আর একটি কথায়!
দেখ শেষে অনুতাপ আনে কত হায়!
আর এক সৎকাজের কিবা পুরস্কার।
অন্তরে বাহিরে ঢালে আনন্দ অপার॥
তার কত দিন পরে হ'য়ে রোগ হীন।
এসেছিল হরি ফের ইস্কুলে যেদিন।
বসেছিল আগে গিয়ে মতির নিকটে।
কত কথা ক'য়েছিল তায় অকপটে॥
মতিও তাহারে দেখি সুখী সুস্থকায়।
হাসিয়া কতই কথা ব'লেছিল তায়॥
এইরূপ তাহাদের আনন্দের হাসি।
দেখিয়া শিক্ষক সবে কহিলেন আসি॥—
"দেখ দেখি আজি এই মতির হাসিতে।
পারে কি না পারে মনে আনন্দ আনিতে!
না বুঝে পশুর হাসি—হাসি সেত নয়।
হাসিতে জানিলে হাসি তবে মিষ্ট হয়॥"

আমরা!

আজ পৃথিবী মানুষে পরিপূর্ণ। এমন কি এক এক স্থানে ক্রমে লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, সে স্থানের সকল লোকে পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। মানুষ এত বাড়িয়াছে যে, কৃষিদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকলের কুলায় না। কিন্তু এমনও একদিন ছিল, যখন খাদ্য দ্রব্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আহার করিবার লোক ছিল না,—এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া একটা জীব ছিলই না।

মানুষের তবে কবে জন্ম হইয়াছে, কি প্রকারে জন্ম হইয়াছে, কি প্রকারে মানুষ সৃষ্টির যাবতীয় জীবজন্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এবং ইহার পরই বা মানুষের কি হইবে?—তাহা জানিবার জন্য একটা কৌতূহল জন্মে। আমরা মানুষ, সুতরাং আমাদের গত জীবনের কথা এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, সে প্রশ্ন মনে আপনা আপনিই উঠে—জানিবার জন্য স্বভাবতঃই একটা কৌতূহল জন্মে। অথচ এ প্রশ্ন এত কঠিন যে সহজে ইহা বুঝিবার যো নাই, সহজে এবং সংক্ষেপে বুঝানও যায় না। বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরাই ইহার একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই,—ইহাঁদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক সে সকল বিষয় লইয়া আমাদের কোন আলোচনার দরকার নাই। "আমাদের" সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

মানুষের কত বয়স তাহা ঠিক বলা দুঃসাধ্য, পণ্ডিতেরা এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, পৃথিবীর যে চারিটী যুগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল যুগের স্তর পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাতন কালের পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা অনেকে বলেন যে মামথ যে যুগের সৃষ্টি, মানুষের চিহ্ন সেই যুগে প্রথম দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তর এবং পর্ব্বতগুহার মধ্যে মানুষের দাঁত এবং অন্যান্য স্থানের অস্থি এবং প্রস্তরের ও লোহ প্রভৃতি নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় ছিল তখন কাঠ বা প্রস্তর প্রভৃতিদ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত; তারপর ক্রমে জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে লোহ, প্রভৃতিদ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিল। পৃথিবীর স্তরে এই সকল মানুষের চিহ্ন পাইয়াই পণ্ডিতেরা মানুষের কোন্ সময় জন্ম হইয়াছে, তাহা ঠিক না বলিতে পারিলেও, কতকটা স্থির করিতে পারিয়াছেন। মানুষের কত বয়স তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু, আমাদের বয়স লক্ষ লক্ষ বৎসরের কম নহে, ইহা একপ্রকার স্থির।

কবে মানুষ জন্মিয়াছে, তাহা যদি কতক জানিলাম, এখন কিপ্রকারে জন্মিয়াছে, তাহাই জানিবার জন্য কৌতূহল হইবে। এ প্রশ্ন আরও কঠিন। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে ক্রমোন্নতি একটা নিয়ম; অর্থাৎ সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই ক্রমে উন্নতির দিকে যাইতেছে! কাল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই, আজ যাহা আছে, কাল আর তাহা আসিবে না, প্রতিদিন পরিবর্ত্তন হইতেছে; প্রত্যেক পদার্থই প্রতিদিন উন্নতির দিকে যাইতেছে। এই নিয়মে নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে একেবারেই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে? এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহা তর্ক চলিতেছে, ইহার

মীমাংসা করা আমাদের কার্য্য নহে। তবে ক্রমোন্নতিতেই মানুষের জন্ম হইয়াছে অনেকেই এই মত সঙ্গত মনে করেন।

এখন মানুষের স্থষ্টি হইলে, মানুষ তখন কি ভাবে দীন যাপন করিত তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। আজ মানুষের যে উন্নত অবস্থা দেখিতেছ, জন্মের সময় মানুষের কিছু এমন অবস্থা ছিল না। অসভ্য বানরবৎ অবস্থা হইতে এখনকার উন্নতি এবং সভ্যতায় আসিতে মানুষের কত বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ মানুষ জীবজগতের রাজা। কিন্তু সেই আদিম উলঙ্গ অবস্থায় কি কষ্টে মানুষকে জীবন রক্ষা করিতে হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তখন গৃহ ছিল না, শীত নিবারণ করিবার জন্য বস্ত্র ছিল না; এখনকার সুখ সচ্ছন্দতা কিছুই ছিল না। তখন অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর হিংস্র বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইত। কিন্তু এ কষ্টের দিনেও ক্রমে শেষ হইল। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া, একত্র সমাজ স্থাপন করিয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নত হইয়া অবশেষে এখন জীবজগতের রাজা হইয়া বসিয়াছে।

এখন মনে উঠিতে পারে, মানুষের ভবিষ্যৎ কি? জীবজগতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতিতে ক্রমে কি করিয়া মানুষ স্থষ্ট হইল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া চারিটী যুগের বিষয় এবং সেই চারি যুগের প্রধান জীবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সেই প্রথম যুগের মৎস্য হইতে কিপ্রকারে ক্রমে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দ্বারা মানুষের স্থষ্টি হইল ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। এখন মনে হয় মানুষ কি উন্নতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, অথবা যে ক্রমোন্নতির নিয়ম স্থষ্টির মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তাহা চিরকালই চলিবে; স্থতরাং উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন এবং উন্নতিতে যে জীবজন্তুর স্থষ্টি এবং জীবজন্তুর পরিবর্ত্তন ও উন্নতিতে যে মানুষের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হইবে? আজ মানুষ জীবজগতের রাজা, ঈশ্বরের স্থষ্টির প্রধান জীব। কিন্তু যে ক্রমোন্নতির নিয়মে জগতে কার্য্য করিতেছে, হয়ত তাহাতে মানুষেরও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইবে, এবং একপ্রকার নূতন ও উন্নতজীব স্থষ্টির প্রধান জীব হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি তাহা কে বলিবে?

ফুলের সাজি।*

নবম অধ্যায়।

নির্ব্বাসিতের গৃহলাভ।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তথাপিও বৃদ্ধ দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমার গমনের বিরাম নাই। তাহারা কত নগর, কত গ্রাম, কত বন ও নদী অতিক্রম করিল এবং কত প্রকার লোকের সঙ্গে তাহারা পরিচিত হইল,

* প্রবন্ধ লেখকের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গত বর্ষে ইহা শেষ হয় নাই। এবারে শীঘ্রই শেষ করিয়া দেওয়া যাইবে।

অবশেষে ১৫ দিন চলিয়া তাহারা প্রসাদপুর হইতে অন্যূন ৮০ ক্রোশ দূরে একটী স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। পথে আসিতে তাহারা কোথায়ও আপনাদের বাস করিবার জন্য এমন স্থান দেখিতে পাইল না যথায় তাহারা সহজে উদারন্ন করিয়া লইতে পারে। এতদিন ভ্রমণ করিতে তাহাদের দ্বারিকানাথ প্রদত্ত যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহাও শেষ হইয়া গেল। দীননাথ কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, কেবলমাত্র ভরসা ঈশ্বর। ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরাণ করা যদিও তাহাদের পক্ষে বড় কষ্টকর, তথাপি অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহাও করিতে হইল। কেহ কেহ কটুবাক্যের সহিত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বা সামান্য মুষ্টি ভিক্ষামাত্র দিত তাহাতে উভয়ের কোনরূপে একবেলা আহার হইত। হায় হায়! ধনী না হইলেও যাহারা এক সময়ে কত সুখে দিনযাপন করিয়াছে তাহাদের আজ দশা দেখিলে কোন্ কঠোর প্রাণ না ফাটিয়া যায়! দুঃখে মনোরমা ও দীননাথের সে বর্ণ ও কান্তি রহিল না, পরিচিত কেহ তাহাদিগকে এ অবস্থায় হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ।

একদিন তাহারা যাইতে যাইতে এক বনের মধ্যে পড়িল, সেখানে কোন গ্রাম বা মানবের চিহ্ন মাত্র নাই। বৃদ্ধ দীননাথ এতদিনের পথশ্রম, অনাহার প্রভৃতি ক্লেশে তথায় পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও বন্ধ হইয়া গেল। সে চলিতে চলিতে শেষে একটি আম্র বৃক্ষের তলে মূর্চ্ছিতের ন্যায় শুইয়া পড়িল, মনোরমার মনের তখন যে অবস্থা হইল তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকা সহজে অনুভব করিতে পারিতেছেন। নিকটে একটু জলপর্য্যন্ত নাই যে, মনোরমা তাহা পিতার মুখে দিয়া তাহাকে কতক সুস্থ করে। জলের জন্য তাহার চারিদিকে অন্বেষণ বৃথা হইল, সাহায্যের জন্য উচ্চ চীৎকার করাও মিথ্যা হইল। মনোরমা তখন অনেক ক্লেশে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিল কিছু দূরে একটী কৃষকের বাড়ী রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে নামিয়া যে দিকে কৃষকের বাড়ী দেখিয়াছিল সেই দিকে দৌড়িয়া অতি শীঘ্র সে বাটীতে গিয়া সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিল। ঐ বাটীর সকলে মনোরমার সজল নয়ন দেখিয়া ও শোকপূর্ণ ভগ্নস্বর শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। এক বৃদ্ধ কৃষক সেই গৃহের গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী এবং সে বড় সৎ ও দয়ালু। কৃষকপত্নী স্বামীকে একখানি গাড়ীতে দুটা ভাল বলদ যুড়িতে বলিয়া কহিল এস আমরা যত শীঘ্র পারি পীড়িত লোকটীকে আমাদের বাড়ী আনি। কৃষক তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত করিল, কৃষকপত্নীও এককুঁজো ঠাণ্ডা জল, একটী ঘটীতে করিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ এবং একটী বিছানা যোগার করিয়া লইল। বৃদ্ধ কৃষক মনোরমা ও আপন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে যেখানে বৃদ্ধ দীননাথ ছিল তথায় উপস্থিত হইল, তাহারা তথায় পৌঁছিয়া দেখিল দীননাথ উঠিয়া কতক সুস্থ হইয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনোরমাকে না দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এক্ষণে পুনরায় তাহাকে এবং তাহার সহিত বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার বনিতাকে দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিল। সে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া একটু সবল হইলে, মনোরমা গাড়ির উপর শয্যা পাতিল এবং তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া কৃষকের পর্ণশালায় উপস্থিত হইল।

কৃষকের বাড়ীর পশ্চাতে তাহার একখানি পরিষ্কার ঝর ঝরে কুটীর ছিল, ঝুটুম্বাদি আসিলে

তাহারা ঐ গৃহে থাকিত। কৃষক তাহার সেই ঘরখানি দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিল, সেই ঘরের পেছনে যে চাল দেওয়া রক ছিল তাহাতে তাহারা আপনাদের রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া লইল। ঘরখানি যদিও ছোট তবুও তাহার মেজে ও দেয়াল বেশ খট্ খটে শুক্‌না, এবং তাহাতে দুটী জানালা থাকায় ঘরটা তাহাদের বাসের উপযুক্ত হইল।

কৃষকপত্নী বৃদ্ধের শয়ন করিবার জন্য একখানি পুরাতন তক্তপোষ ও পিতা ও কন্যার শয়নের দুটী স্বতন্ত্র শয্যা দিল। মনোরমা ঘরের একপাশে মেজেতে আপনার বিছানা এবং অপরদিকে তক্তপোষের উপর পিতার শয্যা পাতিল, পিতা সুখে থাকিলে মনোরমা নিজের যতই কষ্ট হউক অকাতরে সহ্য করিতে পারে। ঘোর পথশ্রম, তাহার উপর অনাহারই দীননাথের অসুখের কারণ। দয়াবতী কৃষকপত্নী বৃদ্ধ দীননাথকে সুস্থ করিবার জন্য তাহাদের যতটুকু ক্ষমতা সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার ঘরে যখন যাহা থাকিত সে সমস্তই বৃদ্ধকে অর্পণ করিত।

দেখিতে দেখিতে শীতকাল অতীত হইয়া বসন্তের আরম্ভ হইল। আর রৌদ্র তত মিষ্ট লাগে না—প্রভাতে পাখীরা মিষ্ট গান করিয়া এখন সকলের শ্রবণকে আনন্দ দিতে লাগিল, যে সকল বৃক্ষের শীতকালে পত্র ঝরিয়া গিয়াছিল তাহাদের শাখা প্রশাখা এখন সতেজ পত্র ও মুকুলদ্বারা ঢাকিয়া গেল, আম্রের মুকুলের সৌরভে দিক্ সকল পূর্ণ হইল, ভ্রমরেরা মধু লোভে আম্র-বৃক্ষ শাখার চারিদিকে গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া উড়িতে লাগিল। যে দিকে দেখ সেইদিকেই সজীবতা, সেইদিকেই যেন কি এক অপূর্ব্ব শ্রী রাজত্ব করিতেছে।

যে গ্রামে মনোরমা ও তাহার পিতা আশ্রয় পাইয়াছিল তাহার একক্রোশ উত্তরে মাঠের মধ্যে একটী বাগান ও পুষ্করিণী আছে। বাগানটী বেশ বিস্তৃত, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামের কৃষকগণ সপরিবারে তথায় আসিয়া মিলিত হইত। তথায় তাহারা নৃত্য গীত ও ভোজন করিত। এই সমস্ত ব্যয়ের জন্য যাহার যাহা সাধ্য সে তাহা প্রদান করিত। সেই বৎসর আমাদের পূর্ব্বকথিত কৃষক ও তাহার স্ত্রী পরামর্শ করিয়া মেলায় যাওয়া বন্ধ করিল। তাহারা মেলার জন্য যে টাকা খরচ করিত তাহা বৃদ্ধের পথ্যের জন্য ব্যয় করিল। মনোরমা সর্ব্বদাই কৃষক ও তাহার পত্নীর নিকট তাহাদের এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত এবং নির্জ্জনে গিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিত,—বলিত "দয়াময়, আমরা এই যে অযাচিত সাহায্য পাইতেছি ইহা আমাদের প্রতি তোমার অপার কৃপা ও স্নেহের ফল"। দীননাথ যখন যাহা বলিত তাহা সম্পন্ন করিয়াও মনোরমা আশ্রয়দাত্রী কৃষক পত্নীর অনেক গৃহ কর্ম্মের সহায়তা করিত। তাহার পরিষ্কার ও সুরুচি-পূণ কর্ম্মে গৃহস্বামিনী তাহার প্রতি দিন দিন অধিক তুষ্ট হইতে লাগিল। মনোরমা কখনও বসিয়া থাকিত না যখনই দেখ সে একটী না একটী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে।

মনোরমার শুশ্রূষায় ও কৃষকের সাহায্যে বৃদ্ধ দীননাথ আবার সুস্থ ও সবল হইল। দীননাথও অলস হইয়া থাকিবার লোক নহে; সবল হইলে সে সাজি ও চুপড়ি তৈয়ার করিবার জন্য মনোরমাকে বন হইতে লতা কাটিয়া আনিতে বলিল। সর্ব্বাগ্রে সে একটী সুন্দর কায়েমী ঝুড়ি বুনিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দয়াবতী কৃষক বণিতাকে উপহার প্রদান করিল। ঝুড়িটী এমন সুচারু

রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, যে তাহা দেখিল সেই কারীকরের প্রশংসা করিল। দীননাথ লতাগুলি কিছুদিন জলে পচাইয়া তাহাদের ছাল তুলিয়া প্রথমে সাদা করিয়া ফেলিল, পরে লতাগুলিকে নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া তাহা দ্বারা ঝুড়ি বুনিল এবং তাহার একটা মনোহর ঢাকনী করিয়া তদুপরি সাহায্য দাতা কৃষকের নাম লিখিয়া দিল, ঝুড়ির গায় কৃষকের বাড়ীরও একটী ছবি আঁকিয়া দিয়াছিল।

একদিন দীননাথ কৃষককে কহিল, "ভাই এত দিন ধরিয়া আমরা তোমার যে কত কষ্টের কারণ হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে অবস্থা তাহাতে তোমার উপর আমরা গুরুতর ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই বলি এখন ত আমি সবল হইয়াছি, আমায় বিদায় দাও, আমি স্থানান্তরে যাই।"

দীননাথের কথায় কৃষক মনে কিছু ক্লেশ পাইল এবং আপন হস্ত দ্বারা দীননাথের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "ভাই দীননাথ, কেন কি হইয়াছে যে, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আমি কি তোমার মনে কোন আঘাৎ করিয়াছি? তুমি ত অজ্ঞান নহ, তোমার মুখে বালোকোচিত এরূপ কথা শোভা পায় না।"

কোমল হৃদয় কৃষক বনিতা সজল নয়নে দীননাথকে বলিল "তুমি এখন এই স্থান পরিত্যাগ করিও না। তোমার ন্যায় বৃদ্ধের এ সময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া বিধেয় নহে। দেখিতেছ না কি সম্মুখে প্রখর গ্রীষ্মকাল আসিতেছে এ সময়ে পথে বাহির হইয়া তুমি কি আবার সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত হইতে ইচ্ছা কর?"

দীননাথ তাহাদের এইরূপ বদান্যতা ও আগ্রহ দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল আমরা পাছে তোমাদের গৃহে থাকিয়া তোমাদের কষ্টের কারণ হই এইজন্য ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম।

কৃষক উত্তর করিল সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না—তোমরা আমাদের ভারগ্রস্ত হইবে কেন? তোমরা অনায়াসে তোমাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পার।

কৃষক পত্নী কহিল—মনোরমা যেরূপ সেলাই জানে তাহাতে সে একাই দুইজনের ভরণপোষণযোগ্য টাকা উপায় করিতে পারে, তাহার উপর তুমি যদি সাজি ও ঝুড়ি বুনিতে পার তাহা হইলে তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে। তুমি আমায় যে ঝুড়ি দিয়াছিলে তাহা দেখিয়া অনেকে সুখ্যাতি করিয়াছে এবং তাহারা এইরূপ ঝুড়ি পাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তুমি যদি ঝুড়ি তৈয়ার কর আমি খরিদার জোগাড় করিয়া দিব। তখন দীননাথ ও মনোরমা যাহাদের নিকট এত উপকার পাইয়াছে এবং যাহারা তাহাদিগকে এত যত্ন করিতেছে তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করিতে পারিল না। কৃষকও তাহার স্ত্রী তাহাদিগকে স্বীকৃত হইতে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল।

আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্ক।

সখার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর গল্প পাঠ করিয়াছেন বা শুনিয়াছেন। এই গল্পটী নিতান্ত অমূলক নহে। সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকই একজন লোক বহুকাল ধরিয়া একাকী এক জনশূন্য দ্বীপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সেই লোকটীর নাম আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক। তাঁহার নির্জ্জন বাসের বিবরণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যে সাহস ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারে সেই বিপদ্‌কে জয় করিতে পারে। 'যাহার আত্মনির্ভর আছে ঈশ্বর তাহার সাহায্য করেন' এই ইংরাজী-প্রবাদ বাক্যটীর সার্থকতা আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্কের জীবনে পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই দক্ষিণ মহাসাগরে স্পানিয়ার্ডদিগের জাহাজ লুটপাট করিবার জন্য ব্রিষ্টল নগরের কয়েকজন ব্যবসায়ী দুই খানি পোত প্রেরণ করেন। এই জাহাজ দুই খানির নাম ডিউক ও ডচেস্‌। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ৫৬টী কামান ও ৩৩৩ জন লোক লইয়া জাহাজ দুইখানি ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ সাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ব্রাজিলের উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিল। তাহার পর উহারা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণস্থ হরণ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ্‌ দ্বীপের নিকট উপনীত হইল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ দ্বীপের উপর একটী আলোক জ্বলিতে দেখিয়া ডিউক নামক জাহাজের কাপ্তেন রজার্স অনুমান করিলেন যে,কয়েকখানি ফরাসীদেশীয় জাহাজ ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়া আছে এবং তাহা হইতেই আলোক আসিতেছে; এবং এই অনুমানই সত্য স্থির করিয়া আপনার অধীনস্থ নাবিকদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইবামাত্র ডিউক ও ডচেস্‌ নামক জাহাজদ্বয়কে জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ দ্বীপের আরও নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু ফরাসি পোতের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না। আরও ভাল করিয়া এ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একখানি নৌকা পাঠান হইল। নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল একজন লোক তীর হইতে একটী শাদা নিশান দেখাইতেছে। নৌকা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় নাবিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নৌকা তীরে লাগাইবার উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিল। লোমযুক্ত ছাগচর্ম্ম পরিধান থাকায় এই ব্যক্তিকে নিতান্ত বন্য রকমের দেখাইতেছিল। এই ব্যক্তির নামই আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক এবং ইহাঁর নির্জ্জন-বাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া ডানিয়েল ডিফো নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার বিখ্যাত রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। নবম সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮।

ফুলের সাজি।

দশম অধ্যায়।

অঙ্গুরীয়-পুনপ্রাপ্তি।

পাঠক পাঠিকা! আসুন আমরা একবার প্রসাদপুরে কি হইতেছে দেখিয়া আসি। মনোরমা ও দীননাথ নির্ব্বাসিত হইয়া গমন করিলে কিছুদিন অতীত হইয়া গেল, দীননাথের প্রতিবেশী এবং গ্রামস্থ অনেকেই তাহাদের জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছিল। তাহাদের বিষয় লইয়া গ্রামে বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে আন্দোলন কমিয়া গেল। মনোরমা যে রাজমহিষীর অঙ্গুরীয় চুরি করিয়াছে তাহা অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করিল না। গ্রীষ্মকাল পড়িলে এক দিবস প্রবল ঝড় ও জল হইল। সেই ঝড়ে প্রসাদপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ঘর ও বৃক্ষ পড়িয়া গেল। প্রসাদপুরস্থ রাজ উদ্যানে রাজার বৈঠকখানা বাটীর অনতিদূরে একটী পুরাতন দেবদারু বৃক্ষ ছিল। ঐ দেবদারু গাছের কোটরে কাকেরা বাসা করিয়া থাকিত। ঝড় লাগিয়া গাছটীর মধ্যখান ভাঙ্গিয়া গেল। রাজা সেই সময়ে উদ্যানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার লোকদিগকে গাছটী কাটিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। পাছে গাছ পড়িয়া অন্য বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায় সেই জন্য তাহারা বৃক্ষের ভগ্ন অংশে একটা দড়ি বাঁধিয়া অন্য বৃক্ষ সকলকে রক্ষা করিল। রাজা, মহিষী, রাজকুমারী হেমলতা এবং দুটী অল্প বয়স্ক রাজকুমার সেই সময়ে তথায় দাঁড়াইয়া বৃক্ষ ছেদন করা দর্শন করিতেছিলেন।

যখন গাছটী মড় মড় শব্দ করিয়া ধরাশায়ী হইল, তখন রাজকুমারেরা বৃক্ষের অগ্রভাগে কোন ডালে একটী পাখীর বাসা দেখিয়া তাহা লইবার জন্য সেই স্থানে ছুটিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দেবেন্দ্র যেমন বাসাটী লইতে যাইবে, অমনি কি একটী পদার্থ তন্মধ্যে চক্‌ চক্‌ করিতেছে দেখিতে পাইল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দেবেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কনিষ্ঠকে কহিল ভাই সুরেন দেখ দেখ কি একটা বাসার ভিতর চক্‌ চক্‌ করিতেছে, সুরেন্দ্র হাত দিয়া সেইটী লইয়া বলিল "ও দাদা এ যে একটা আংটী"। রাজকন্যার পরিচারিকা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মায়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল সে তাহাদের কুতূহল দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং আংটী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল "এই সেই আংটী"। তাহার মুখ মলিন ও বিবর্ণ হইল। কুমারেরা তখন এক দৌড়ে তাহাদের মার নিকট গিয়া মহা আনন্দের সহিত তাঁহার হাতে সেই আংটীটী উপহার দিয়া

কহিল "মা, কাকের বাসায় আমরা এই আংটী পাইয়াছি"। রাজমহিষী—অঙ্গুরীয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তাই ত, এ যে আমার সেই হারান আংটী। দুর্ভাগ্য মনোরমা, সাধু দীননাথ আমরা তোমাদের প্রতি কি অবিচারই করিয়াছি। অঙ্গুরীয় পাইয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আবার যদি মনোরমা ও বৃদ্ধ দীননাথকে দেখিতে পাই তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা শত গুণে সন্তোষ লাভ করি। তাহাদিগকে দেখা পাইলে তাহাদের সমুদায় সম্পত্তির সহিত এই আংটী এখনই তাহাদিগকে উপহার প্রদান করি"। রাজা, রাজকুমারী হেমলতা এবং নিকটস্থ সকলেই আংটী দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিষণ্ন হইল। মহামূল্য আংটী পুনরায় মিলিয়াছে—এইটী যেমন আনন্দের কারণ, নির্দ্দোষী ও সাধু দীননাথ ও তাহার কন্যা অকারণে দেশান্তরিত হইয়াছে ইহা সেইরূপ কষ্টের কারণ হইয়াছিল।

হেমলতা বলিল "ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আংটী গাছের উচ্চ ডালে কাকের বাসার মধ্যে পাওয়া গেল! আংটী গাছের উপর কিরূপে যাইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" যাহারা গাছ কাটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজকুমারীকে প্রণাম করিয়া কহিল "রাজকুমারি! এ কথার জবাব যদি আমার নিকট শুনেন তাহা আমি বলিতে পারি। হেমলতা কহিলেন "দ্বারিক, ইহা বলিবার জন্য আর অনুমতি লইতে হইবে না, তোমার যাহা অভিপ্রায় স্বচ্ছন্দে বল"।

আমরা বনের মধ্যে যে সাধু-হৃদয় কাঠুরিয়া দ্বারিকানাথকে বৃদ্ধ দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমাকে যষ্টি ও টাকা দিয়া সাহায্য করিতে দেখিয়াছি এই বৃদ্ধ সেই দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথ রাজকন্যার আজ্ঞা পাইয়া বলিল "এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দীননাথ বা মনোরমা কেহই আংটী চুরি করে নাই, বা চুরি করিয়া বৃক্ষের উপর তুলিয়া রাখে নাই। গাছের যেখানে পাখীর বাসা ছিল সে স্থান এত উচ্চ যে, তাহারা কোন মতে ইহার উপর উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ আংটী চুরি করিয়া বৃক্ষের উপর রাখে এমন সময়ও তাহাদের ছিল না। আংটী খোওয়া যাইবার অতি অল্প সময় পরেই তাহারা কারাবদ্ধ হইয়াছিল। আমি বেশ জানি কাকেরা চক্ চকে ছোট কোন জিনিস দেখিলেই ঠোঁটে করিয়া আপনাদের বাসায় লইয়া যায়। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন কাকে সুযোগ ক্রমে আংটী লইয়া গিয়া বাসায় রাখিয়াছিল। ভগবান যে কি জন্য আমার হতভাগ্য বন্ধু দীননাথকে ও তাহার কন্যাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন"।

রাজমহিষী দ্বারিকানাথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন "দ্বারিক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমি এখন সমস্ত পরিষ্কার বুঝিতেছি, কাকগুলা প্রতিদিন গাছ হইতে উড়িয়া আমার ঘরের জানালায় আসিয়া বসে এবং আমার বেশ মনে হইতেছে যখন হেমলতার সহিত আমি গৃহান্তরে মনোরমাকে কি উপহার দেওয়া যাইবে এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাই, তখন আংটীটি জানালার ধারে বাহির করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সময়ে জানালার উপরে একটী কাক বসিয়াছিল। মনোরমা ঘরের মধ্যে দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় কাক তাহার অজ্ঞাতসারে আংটী লইয়া বাসায় উড়িয়া যায়।

রাজা এতক্ষণ স্থিরভাবে সমুদায় শুনিতেছিলেন। তিনি এই সকল কথা বার্ত্তায় বেশ বুঝিলেন যে, দীননাথ ও তাহার কন্যা অকারণে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রাজা কহিলেন নির্দ্দোষী দীননাথ ও মনোরমার প্রতি এই অবিচারের জন্য আমি বড় পরিতাপ পাইলাম; তবে আমরা জানিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে কোন দণ্ড প্রদান করি নাই বলিয়া মন কতকটা সান্ত্বনা পাইতেছে। আমাদের অজ্ঞানতা ও মায়ার মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য এই ঘটনা হইয়াছে।

এক্ষণে যদি আমি দীননাথ ও তাহার কন্যাকে আবার দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে এই আংটীর সহিত তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া প্রদান করিতে পারি এবং সকল লোকের নিকট তাহাদের নির্দ্দোষীতার কথা জানাইতে পারি তবে আমার এ পরিতাপ দূর হইবে। রাজা এক্ষণে মায়ার দিকে সরোষে দৃষ্টিপাত করিলেন। মায়া তখন বলিদানের ছাগের ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজা কহিলেন "পাপিয়সী, কোন সাহসে তুই এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করিলি এবং একটী নীরিহ পরিবারকে একবারে নষ্ট করিলি; সাধু দীননাথ, সুশীলা মনোরমা তোর কি করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করাইলি"। তাহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত দুই জন প্রহরীকে আজ্ঞা দিলেন "ইহাকে হাজত ঘরে লইয়া মনোরমাকে যে শৃঙ্খল পরান হইয়াছিল সেই শৃঙ্খল ইহার হস্তে দেও, ইহাকে সেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত কর, এবং অকারণে মনোরমাকে যেরূপ বেত্র প্রহার করা হইয়াছিল সেইরূপ ইহাকেও বেত্রাঘাত কর। যাহা কিছু অর্থ ও দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়াছে রাজ ভাণ্ডারস্থ কর। কল্য প্রাতে ইহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া যেন ইহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়"।

যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, রাজার এই কথা শুনিয়া চমকিত হইল তাহারা তাঁহার মুখে কখন এরূপ কথা শুনে নাই বা তাঁহাকে এত ক্রুদ্ধ হইতেও দেখে নাই। রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলে তাহারা আপনাআপনি মায়া সম্বন্ধীয় নানা কথা কহিতে লাগিল।

একজন প্রহরী মায়ার হস্ত কঠিন করিয়া ধরিয়া বলিল "পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়—এ কথাটা কি তোর জানা ছিল না"।

আর একজন প্রহরী মায়ার অপর হাত ধরিয়া বলিল "এখন মিথ্যা কথা ও জুয়াচুরির ফল টের পাবে তা জানিস" "ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে"।

অপর একজন চাকর বলিল "মনোরমার প্রতি মায়ার ঈর্ষানল এত প্রবল হইয়াছিল যে, সে অকাতরে মিথ্যা কথা কহিয়া মনোরমা ও তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিল। মায়া একবার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় আর সত্য বলিতে সাহস করে নাই—এ কথাটীও খুব সত্য যে পাপকে মনের ভিতর একটু স্থান দিলে শেষে সে অল্পে অল্পে সমস্ত মনটীকে অধিকার করে"।

রাজার অশ্ব চালক এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল সে বলিল "যাহা হউক মায়া এখনও যদি আপনার দোষের জন্য অনুতাপ করে তাহা হইলেও ভাল; নচেৎ পরকালে কি বলিয়া যে জবাব দিবে জানি না। কেহ বাগানে আগাছা রাখে না—যে গাছে ফল না হয় তাহা কাটিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে আংটী পুনঃ প্রাপ্তির কথা গ্রামের সকল লোকেই জানিতে পারিল। রাজা—বিচারককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন শীঘ্র সমস্ত প্রজাবর্গকে সংবাদ দিয়া বিচারালয় প্রাঙ্গণে একত্র করিয়া মনোরমা ও দীননাথের নির্দ্দোষীতার বিষয় প্রমাণসহ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বিচারপতি মনোরমা ও দীননাথকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি যথাসাধ্য চুল চিরিয়া বিচার করিতেন তথাপি তাঁহার হৃদয়ে দয়া ছিল। তিনি উপস্থিত প্রজাগণকে ডাকিয়া বলিলেন— দেখ আমি না বুঝিয়া অকারণে একটী নির্দ্দোষী বালিকা ও একটী সাধু লোককে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। মানুষ যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহার ভুল হইতে পারে।

একজন আছেন যাঁহার বিচারে ভুল নাই— যিনি সর্ব্বদর্শী, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই কেবল প্রকৃত দোষীকে চিনিতে পারেন—দেখ এই আংটী কে লইয়া গিয়াছিল বা কোথায় তাহা ছিল কোন মানুষ তাহা জানিতে পারে নাই। মানুষ বিচারক সহজে ভুলিয়া নির্দ্দোষীকেও দণ্ড দিয়া ফেলে— তাহার মানুষের হৃদয়ের কথা জানিবার উপায় নাই।

পৃথিবীতে অনেক সময় নির্দ্দোষী ব্যক্তিও শাস্তি পায় এবং পাপীও কখন কখন পুণ্যাত্মা বলিয়া লোকের নিকট আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করে। যিনি সকলের মনের গুপ্ত পাপ সকলও জানেন সেই অন্তর্যামী ভগবান আজ কৃপা করিয়া, ইহ লোকেই নির্দ্দোষী দীননাথ ও তাহার কন্যার মিথ্যা অপবাদ মোচন করিয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারিণী মায়ার শাস্তি বিধান করিলেন। যেরূপ ঘটনায় অঙ্গুরীয় পুনরায় পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে কি বোধ হয় না যে, ইহা ঈশ্বরের নিজের কৃত? কাহার ইচ্ছায় এরূপ ঝড় হইয়া বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল, কাহার ইচ্ছাতেই বা রাজকুমারেরা তাহা দেখিতে পাইয়া রাজ্ঞীর নিকট আনিয়া দিল। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মায়া নিজেই সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া চীৎকার করিয়া মনোরমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিয়া দিল। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রায় হইতেছে। পৃথিবীর লোক পাছে মনে করে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর অলীক সেই জন্য ঈশ্বর সময়ে সময়ে এই ইহলোকেই পাপীকে দণ্ড বিধান ও নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিয়া দেন।

বিচারক কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে, উপস্থিত লোকদিগের অন্তরে তাহা বিদ্ধ হইল।

তাহারা মনোরমা ও দীননাথের মিথ্যা অপবাদ দূর হইয়াছে দেখিয়া মহা আনন্দে যথাস্থানে গমন করিল।

রাজ আজ্ঞায় তিন চারি জন দূত মনোরমা ও দীননাথকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইল, বটে, কিন্তু কেহই তাহাদের সন্ধান করিয়া আসিতে পারিল না। ক্রমশঃ

নিষ্ঠুর আমোদ।

আমরা অনেকেই হয়ত ভেড়ার লড়াই দেখিয়া থাকিবে। মজা ও তামাসা দেখিবার জন্য দুইটা ভেড়াকে উত্তেজিত করিয়া ভেড়ার লড়াই দেখা হয়। ভেড়া দুইটা দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া পরস্পরকে সজোরে ঢু মারিতে থাকে, ইহাতে অনেক সময়ে ভেড়াদের শিং ভাঙ্গিয়া গিয়া রক্তারক্তি হয়।

আবার বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে গোয়ালাদের এক রকম পরব আছে তাতে যে সব গরুর নূতন বাছুর হইয়াছে সেই গরুতে আর শূয়রে লড়াই বাধান হয়। আসল কথা বুনো শূয়রে আর গরুতে লড়াই, কিন্তু কাযে আর তা হয় না। গোয়ালারা একটা শূয়রের ছানা আনে, আর অনেক লোক জন, ঢাক ঢোল লইয়া সাজ সজ্জা করিয়া অতি সমারোহের সহিত কোন বিস্তৃত মাঠে যায়। সেই খানে শূয়রের ছানা ছাড়িয়া দিয়া কয়েকটী গরুকে উত্তেজিত করিয়া দেয়; গরুগুলি সেই ছানাটীকে পদদলিত ও শৃঙ্গাঘাত করিতে থাকে। ছানাটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। যত পলাইতে যায় গরুগুলি ততই চারিদিক হইতে আসিয়া শৃঙ্গাঘাত করিতে করিতে তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এসব নিষ্ঠুরতা।

আমরা কুস্তি দেখি, জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ দেখি, সার্কাসে নানা রকমের ব্যায়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুক দেখি। ইহাতে কোনই দোষ নাই। কিন্তু এই গুলিই চরমসীমায় উপস্থিত হইলে আর নিষ্ঠুরতার অবধি থাকে না। আমরা মজা দেখিবার জন্য যদি দুটী লোককে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করি আর তাহারা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে আমরা মজা দেখিতেছি তাহারা যুদ্ধ করিতে আর রাজি নহে, তাহারা নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদের নিকট কত অনুনয় বিনয় করিতেছে তথাপি আমরা মজা দেখিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেছি, এরূপ হইলে নিষ্ঠুরতার এক শেষ হয়।

পূরা কালে রোম নগরে এই রূপ আমোদ বড় প্রচলিত ছিল। ২৬৪ খৃঃ পূঃ ইহার আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ রোম নগরের কোন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টীক্রিয়ার সময় রাজ ভাণ্ডার হইতে এইরূপ নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিবার আয়োজন হইত। এই তামাসা প্রকাশ্য স্থানে হইত এবং সকলেরই দেখিবার অধিকার থাকিত। সমস্ত ব্যয় রাজ ভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাহিত হইত। তৎপরে যাঁহার পয়সা থাকিত যিনি দেশ শুদ্ধ লোকের আমোদ যোগাইবার ব্যয় ভার বহন করিতে পারিতেন তিনিই তাঁহার আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে ঐরূপ আমোদের যোগাড় করিতেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত মৃত্যু উপলক্ষেই এই নিষ্ঠুর আমোদের চলন ছিল। তারপর মজা দেখিবার ও আমোদ করিবার নেশা চড়িয়া গেল। তখন স্বজনের মৃত্যু বা অন্য কোন বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষের জন্য আমোদ বাধিয়া থাকিত না; যাঁহার যখন সুবিধা হইত ও যখন পয়সা খরচ করিতে পারিতেন তখনই নগর শুদ্ধ লোকদিগকে মজা দেখাইয়া আমোদিত করিতেন। এই তামাসা দেখিবার জন্য রোম নগরে অনেক বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যেটী সেটীই প্রসিদ্ধ, তাহার নাম কলোসীয়াম্। এত বড় অট্টালিকা পৃথিবীর কোথায়ও নাই। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ চক্রাকার প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের উপর চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে বসিবার আসন। এই আসনের পরপর অনেক সার ছিল। এই কলোসীয়ামে এক লক্ষ লোকের বসিবার স্থান ছিল। এটী নিষ্ঠুর ক্রীড়া দেখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। এই খানে সকল অবস্থার লোকই দলবদ্ধ হইত। সম্রাট হইতে ক্রীত দাস পর্য্যন্ত এই স্থানে আসন পাইত। বৃদ্ধ, যুবা, গৃহিণী নববধূ সকলেই মারামারি কাটাকাটি রক্তপাত ও যন্ত্রণার চীৎকারে হরষিত হৃদয় হইয়া গৃহে ফিরিতেন।

যে দিনের তামাসাটা কিছু বেশী রকমের বা নূতন ধরণের হইত সে দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই কলোসীয়ামের সমস্ত স্থান পূরিয়া যাইত। কখন কখন পূর্ব্ব রাত্রেই সমস্ত স্থান ভরিয়া যাইত। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের সম্মুখের স্থান সম্রাট, তাঁহার সভাসদ্ এবং যাহার ব্যয়ে এই ক্রীড়া হইত তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎপরে নগরের অন্যান্য বড় লোকের জন্য চৌদ্দসারি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তৎপরে সাধারণ লোকের বসিবার স্থান, তার পরে মহিলাদের বসিবার স্থান, তৎপরে দাস দাসীদের বসিবার স্থান ছিল। বসিবার স্থানে মধ্যে মধ্যে নিভৃত ফোয়ারা থাকিত, সময়ে সময়ে সে ফোয়ারা হইতে সুগন্ধি জল উঠিয়া দর্শকবৃন্দের গাত্রে পড়িত। সময় হইলেই বাজনা বাজিয়া উঠিত যোদ্ধারা সসজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিত। যোদ্ধাদের নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র থাকিত। কেহ জাল হস্তে প্রবেশ করিত, প্রতিদ্বন্দীকে জালবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কেহ ঢাল, তরবারি হস্তে আসিত। কাহারও সর্ব্বাঙ্গ লৌহ চর্ম্মে আচ্ছাদিত, কেহ বা একবারে উলঙ্গ হইয়া আসিত। কাহারও এক হস্তে বল্লম অপর হস্তে এক খণ্ড বস্ত্র। ইহারা সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিত। প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তৎপরে তিন চারি জন মিলিয়া যুদ্ধ হয়। যাহারা যুদ্ধে মরিয়া যায় তাহারা নিষ্কৃতি পায়, যাহারা আহত হয় তাহাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। সিংহ গর্জ্জন করিয়া নিরুপায় আহত ব্যক্তির উপর লাফাইয়া পড়ে আর চতুর্দ্দিক হইতে দর্শক বৃন্দেরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠে। আর এক ব্যক্তি আসিয়া সেই সিংহ বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে যদি তাঁহার জয় হয় তবে মহিষ, বন্য বরাহ বা কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই রূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। রক্তস্রোতে প্রাঙ্গণ কর্দ্দমযুক্ত এবং পিচ্ছল হয়, মৃত মনুষ্য ও পশুদেহে ভরিয়া যায়। ক্রূর সম্রাট নীরোর সময়ে এই আমোদ আরোও জঘন্য আকার ধারণ

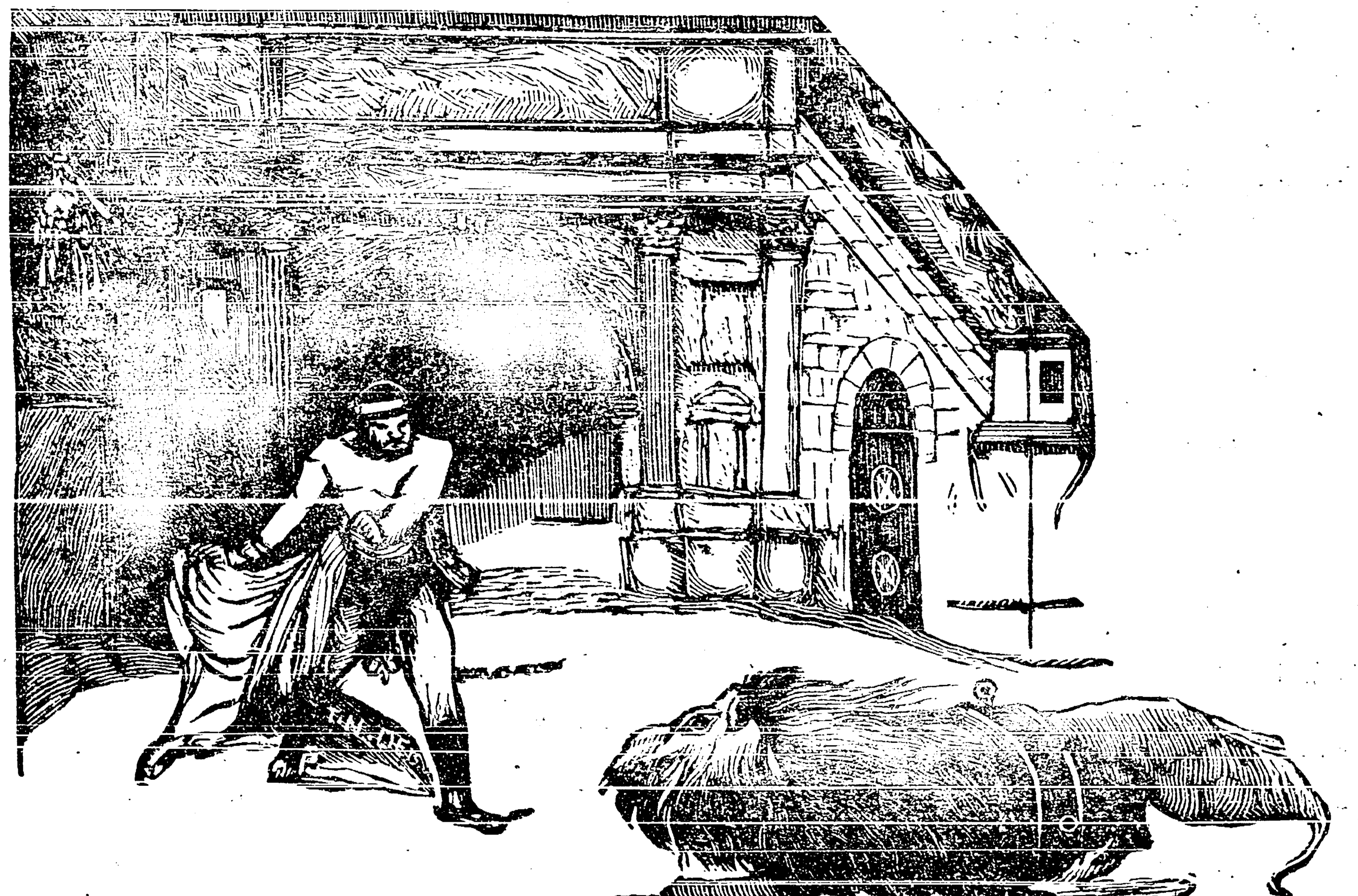

করিয়াছিল। নীরো যুবতী কুমারী ও শিশু বালক বালিকাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া মজা দেখিতেন। হানোরিয়াসের রাজত্ব কালে টেলিমেকাস্ নামক কোন ধর্ম্ম যাজক দুই যোদ্ধার মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া দর্শকবৃন্দেরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অবধি হইতে এই আমোদ একেবারে উঠিয়া যায়।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। কালোসীয়ামের প্রাঙ্গণে এক যুবক সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাকে সিংহ ধরিয়া বন্ধন করিতে হইবে। অস্ত্রের মধ্যে হস্তে এক খণ্ড বস্ত্র। ইহার নিকটে সিংহ আসিলেই ইনি এই বস্ত্র সিংহের মুখের উপর ফেলিয়া সিংহের চোখ দুটী ঢাকিয়া দেন এবং সিংহের কোমরে যে লোহার বেড় সংযুক্ত ছিল তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া সিংহকে টানিয়া লইয়া যান।

আদর্শ বালক।

ঐ প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ কুসুমের ন্যায় কে ঐ বালক যাহার কমনীয় কান্তি পরিবারস্থ সকলের মনে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। সে যেখানে যাইতেছে সেই স্থানই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। তাহার হাসি হাসি পবিত্র মুখখানি যে দেখিতেছে তাহারই মনের অন্ধকার দুর হইতেছে। যে দেখিতেছে তাহারই মনে হইতেছে আবার দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। অতি ক্রূর ব্যক্তিও তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য সরল হইতেছে, কঠোর হৃদয়ও নরম হইয়া তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব দেখাইতেছে।

কে ঐ বালক, যে সরলতা ও চাপল্য মাখা নয়ন দুইটী এদিক ওদিকে ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বুদ্ধির নূতন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে স্বাভাবিক জ্ঞান স্পৃহা প্রবল হইতেছে। হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণে ভালবাসার বীজ সঞ্চারিত হইতেছে।

কে ঐ বালক, যাহার পিতা মাতার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা দিন দিন প্রগাঢ় হইতেছে। পিতা বা মাতা কেহ পীড়িত হইলেন, তাহার কচি মুখখানি শুখাইয়া গেল, প্রাণ অভিভূত হইল। পীড়িত পিতা বা মাতা যাহা আদেশ করিতেছেন সে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাই পালন করিতেছে; তাহার যতটুকু সাধ্য সে তাঁহাদের সেবা করিতে ক্রুটি করিতেছে না—সে তাঁহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইতেছে, পথ্য প্রদান করিতেছে।

কে ঐ বালক, যে ছোট ছোট ভাই ভগ্নিগুলিকে ভালবাসিতেছে ও যত্ন করিতেছে, কোন ভাল দ্রব্য বা আহারীয় পাইলে তাহাদিগকে না দিয়া আপনি লইতেছে না, তাহাদের গায় কখন হাত তুলিতেছে না। তাহাদের সহিত একত্র ভ্রমণ, একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া তৃপ্তি অনুভব ও সুখ বোধ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের অনুগত হইয়া চলিতেছে।

কে ঐ বালক, যে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে

শয্যা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া কচি কচি হাত দুটী যোড় করিয়া অবনত মস্তকে দয়াময় হরির চরণ বন্দনা করিতেছে।

কে ঐ বালক,যে প্রভাতে বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া শরীরকে সবল ও সুস্থ এবং মনকে প্রফুল্ল করিতেছে। ব্যায়ামের পর মনোযোগের সহিত পাঠ্যাভাস করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইতেছে। কে ঐ বালক,নিত্য নিয়মিত কালে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া সন্তোষজনক পাঠ আবৃত্তি দ্বারা শিক্ষকের তুষ্টি সাধন করিতেছে। বিদ্যালয়ে তাহার এক দিনও অনুপস্থিতি নাই, শ্রেণীর মধ্যে সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্কুলের পাঠ আরম্ভ হইলে তাহার মুখে একটী অন্য কথা নাই—মন অন্যদিকে নাই,কেবল নিজের পাঠেই তাহার মন রহিয়াছে?

খেলিবার সময় কে ঐ বালক,যে একটী মন্দ কথা মুখে আনিতেছে না, কেবলই তাহার হাসি মুখ, সকল খেলুড়ের সহিত তাহার সদ্ভাব। কাহারও সহিত ঝগড়া নাই বরং খেলুড়েরা পরস্পর বিবাদ করিলে সে মিষ্টভাবে ও মিষ্ট কথায় তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেছে?

কে ঐ বালক, যাহার মুখে সদাই আনন্দের হাসি,—যে সদানন্দ,যাহার মিষ্ট কথাই আভরণ,যে মিষ্ট কথা বলিবার জন্য কখন মিথ্যা কথা বলে না—কারণ সত্যকে সে প্রাণের সমান ভালবাসে?

কে ঐ বালক, যে পরের মহামূল্য দ্রব্যও ধূলার ন্যায় জ্ঞান করে, ভ্রমেও অপরের একটা তৃণে হাত দেয় না?

কে ঐ বালক, যে সকলের নিকট অবনত; যাহার মুখে একটী গর্ব্বের কথা নাই আকৃতিতে যেন বিনয় মাখা রহিয়াছে। তাহার বসন ভূষণের পারিপাট্য নাই, জাঁকজমক নাই অথচ কখন সে মলিন বস্ত্র পরিধান করে না, চুলের পারিপাট্য নাই অথচ তাহার চুলগুলি সুপরিস্কৃত, দেহে সুগন্ধ লেপন নাই তথাপি তাহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, তাহার বইগুলি ছিন্ন বা মসি রঞ্জিত নহে। তাহার পড়িবার গৃহ ও শয়নের গৃহ কেমন পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সম্পন্ন।

কে ঐ বালক, যে অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও অনাথ বালক বালিকা দেখিলে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিতোষের সহিত আহার করাইতেছে এবং নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে তাহার প্রাণ অন্যের দুঃখে দুঃখী, অন্যের সুখে সুখী?

কে ঐ বালক, যে গৃহপালিত বিড়াল কুকুর গাভি বা অশ্বের প্রতি সদাই দয়ালু ও যত্নশীল। যে আমোদের জন্য কখন ভ্রমেও একটী পতঙ্গের প্রাণে কষ্ট দেয় না বা কোন জীবের প্রাণ নষ্ট করে না?

কে ঐ বালক, গৃহ পালিত পশু পক্ষীরাও যাহাকে দেখিতে ভালবাসে, যাহার হস্ত প্রদত্ত খাদ্য, আহার ও জলপান তাহাদের ভাল লাগে, যে কত যত্ন করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দেয়?

কে ঐ বালক, যে কখন অপরিমিত ভোজন করে না, নিমন্ত্রণে গিয়াও কখন অতিরিক্ত ভোজন করে না, সুতরাং পীড়া তাহার নিত্য সহচর নহে, যাহার খেলিবার সময় খেলা, পড়িবার সময় পড়া, যে কখন তাস বা কড়ি স্পর্শ করেনা?

কে ঐ বালক, যে কখন অসৎ বালকদের সঙ্গে বেড়ায় না, অসৎ বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা দূরে থাকুক কখন তাহা শ্রবণও করে না এবং নিজেও অভদ্র ভাবে থাকে না।

কে ঐ বালক, যে দাস দাসীর প্রতিও ক্রোধ করে না, দাস দাসীদিগকে তুমি বই তুই বলিয়া সম্বোধন করে না—এজন্য দাস দাসীরাও তাহার কোন কথা কখন অবজ্ঞা করে না?

কে ঐ বালক, যাহার প্রাণে অল্পে অল্পে ভগবানের প্রতি ভালবাসা স্থান লাভ করিতেছে, সে তাহার নিত্য পূজা করিতে শিক্ষা করিতেছে এবং তাহার বিমল প্রাণে ঈশ্বরের বিমল সত্তা প্রতিফলিত হইতেছে।

প্রকৃত গৌরব।

(প্রিয়, মতি ও নবীনের সহিত শিক্ষকের কথোপকথন।)

শিক্ষক। বল দেখি লোক মাঝে গৌরব কাহার?
মতি। অতুল ঐশ্বর্য্য আর বৈভব যাহার;
দাস দাসী অনুচর যার প্রতিক্ষণ
পলক না হতে করে আদেশ পালন;
দ্বারদেশে ভিখারীর দল শত শত
অনুগ্রহ ভিক্ষা যার করিছে নিয়ত;
অসংখ্য মানব-শির নত পদতলে
তাহারি গৌরব সত্য, এই ভূমণ্ডলে!

নবীন। জ্ঞানে যেই বড় হয় গৌরব তাহার
বিদ্যাবলে বাড়ে মান জগতে সবার।
দারিদ্র বিদ্যার বলে ধনীর উপরে;
কে না জানে জ্ঞানবান খ্যাত চরাচরে?
ফুরায় ধনের সঙ্গে ধনীর গৌরব;
বিদ্যাবলে চিরদিন পূজিত মানব।

প্রিয়। "বল বল বাহুবল" জগতে প্রচার;
ধনে জ্ঞানে কি করিবে বল নাহি যার?
সমস্ত জগত-ব্যাপী বীরের গৌরব;
তার কাছে কোন ছার বিদ্যা বা বৈভব?
কেনা জানে বোনাপার্টি সিজরের খ্যাতি?
সেকেন্দর হানিবল বীর মহামতি?
থার্ম্মপলি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণন,
না শুনেছে পৃথিবীতে আছে কোন্ জন?
ভীষ্মার্জ্জুন কর্ণ আদি বীরের বিক্রম
এখনো রয়েছে খ্যাত লক্ষমুদ্রা (১) সম।
বীরত্ব বিহনে সদা এই ধরা-ধামে
ধনী জ্ঞানী খ্যাত হয় কাপুরুষ নামে।

শিক্ষক। সত্য বটে ধনে জ্ঞানে পূজিত মানব
সত্য বটে এসংসারে বীরের গৌরব।
কিন্তু এক স্থান আছে জগত-উপরে
ধন মান বল যেথা পশিতে না পারে।
কেবল জ্ঞানের সেথা নাহিক গৌরব
ধর্ম্মমাত্র মানুষের প্রকৃত বৈভব।
ধনী যবে দরিদ্রের দুঃখ নাশ তরে
মুক্ত হস্তে আপনার ধন ব্যয় করে;
জ্ঞান দ্বারা সত্যাসত্য করিয়া নির্ণয়
জ্ঞানী যবে নিরন্তর সত্যপথে রয়;
স্বদেশ উদ্ধার কিম্বা পর উপকারে
বীর যবে আত্ম-প্রাণ দেয় অকাতরে;

(১) "লাখ টাকা।"

তথনি ত ধনী জ্ঞানী মহাবীরগণ
লোক-মাঝে হয় সত্য গৌরব ভাজন।
রাবণের সম ছিল প্রতাপ কাহার?
স্বর্গ মর্ত্ত্য বাহুবলে যার অধিকার।
বেকনের জ্ঞান-রাশি সমুদ্র সমান,
সেকেন্দর বোনাপার্টি বীরের প্রধান;
এবে কি তাদের নামে মানব-হৃদয়,
শ্রদ্ধা আর ভক্তিরসে কভু সিক্ত হয়?
কিন্তু দেখ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার
এখনো মানব-মনে করিছে বিহার।
চিরদিন সমভাবে জগতের জন,
শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁর পদে করিবে অর্পণ।
অতএব জান স্থির এই কথা সার ঃ—
"চরিত্র যাহার, সত্য গৌরব তাহার।"
আপনার স্বার্থ-ভুলে পরহিত-তরে
সাধু-কার্য্যে ফলাফল চিন্তা নাহি করে;
সত্য কথা সত্য কাজ সত্য আচরণ
বিপদে সম্পদে রাখে ঈশ্বরেতে মন!
এই ভাবে হয় গত জীবন যাহার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমভাবে গৌরব তাহার।

ভাই বোন।

৩য় পরিচ্ছেদ।

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

আজ জলের বড় আনন্দ! কেন না স্থলের পরাজয়! স্থল ও জলের চিরকাল সংগ্রাম চলিতেছে। কখনও বা গভীর সমুদ্র গর্ভ হইতে স্থলের জয়পতাকা-স্বরূপ দ্বীপপুঞ্জ উঠিতেছে; আবার কখনও বা জলের পরাক্রমে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম, নগর, রাজপ্রাসাদ নদী ও সমুদ্র গর্ভে যাইতেছে। আজ যে উচ্চতম পর্ব্বতশিখর মস্তক উন্নত করিয়া আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে হয়ত সমুদ্র গর্ভই তাহার জন্মস্থান ছিল; এবং বর্ত্তমানে যেখানে অতল সমুদ্রের তরঙ্গ সকল নাচিতেছে ও খেলিতেছে হয়ত ভবিষ্যতে সেখানেই আবার স্থলের বিজয় নিশান উড়িবে। এ সংগ্রামে চিরদিন জলেরই জয়। পৃথিবীর অধিকাংশই জলের অধিকার। তবুও লোভের নিবৃত্তি হয় না। "যত পায় তত চায়।" আজ আবার সমুদ্রের পরাক্রম প্রকাশিত হইবে—জলাধিপতির জয় হইবে। তাই জলের এত আনন্দ! তর তর শব্দে আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে বিজয় ঘোষণা করিতেছে! যাহারা স্থলের প্রজা সে শব্দে তাহাদের অন্তর কম্পিত হইতেছে। পৃথিবীর মুখ বিষাদে ঢাকা—

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জল যেন অন্ধকারে সুযোগ পাইয়া প্রফুল্ল মনে শত্রুর দুর্গ অধিকার করিতেছে।

জল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আধ হাত, এক হাত, দু হাত জল উঠিল—ঘর দরজা জিনিষ পত্র সকল জলের উদরসাৎ হইল—তবুও জলের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। জীবন রক্ষক জল আজ জীবন ভক্ষক হইয়াছে—পশু পক্ষী মানুষ কীট পতঙ্গ না হইলে সে রাক্ষসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। যে জগতের পিপাসা নিবারণ করে আজ তাহার পিপাসা নিবারণের জন্য জগতের সমস্ত প্রাণীর শোণিত চাই।

বসু বাবু সন্তান সন্ততি লইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে ছাদের উপর বসিয়া কি ভাবিতেছেন? চারিদিকে গভীর অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না। কেবল জলের ও বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ এবং মধ্যে মধ্যে মানুষের হাহাকার ও আর্ত্তনাদ। যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ততই জলের শব্দ ও হাহাকার শব্দ বাড়িতে লাগিল। বসু বাবুর করুণ হৃদয় আজ এই দুর্য্যোগের দিনে মানুষের দুঃখ দেখিয়া বিগলিত হইল। কেবল মানুষ কেন? পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এ ঘোর প্রলয়ের প্রবল পরাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইল না। সমস্ত জগতের ক্রন্দনধ্বনিতে আজ অন্ধকার আকাশ পূর্ণ হইল। বসু বাবু একবার আকাশের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, সে গভীর আঁধারে আশার একটী মাত্র আলোকও নাই; তখন কাতর স্বরে বলিলেন ঃ—"ভগবান! এ হাহাকারে কি তোমার দয়া উছলিত হইল না? তোমার সন্তান সন্ততির এ হৃদয়ভেদী প্রার্থনা কি অন্ধকার ভেদ করিয়া তোমার নিকট প্রবেশ করিতে পারে না? দয়াময়! কোন্ পাপে আজ পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা? দোষী, নির্দ্দোষী, পাপী, সাধু সকলেরই আজ এক গতি, এক অবস্থা। লীলাময়! তোমার এ বিচার মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। এই ঘোর বিপদের সময় তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় আপনার পুত্র কন্যা পরিবারের কথা ভুলিয়া পরের জন্য বিগলিত হইল! ইহাকেই বলে মহত্ত্ব! ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব!!

যাহাদের খড়ের ঘর তাহারা বহু পূর্ব্বেই জলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—স্রোতের হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। মানুষ, বিড়াল, কুকুর, শেয়াল সকলেই স্রোতের মুখে চলিয়াছে এবং যেখানে উচ্চ স্থান, বৃক্ষ অথবা বাড়ীর ছাদ সেখানে প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বসু বাবুর ছাদের উপরেও ক্রমে অনেকে জড় হইল। কিন্তু সে কতক্ষণ? জলের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বসু বাবু দেখিলেন আর উপায় নাই—মুহূর্ত্ত পরেই সকলকে ভাসিতে হইবে—জলের স্রোতে সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হইবে—চিরদিনের জন্য স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র পুত্র কন্যাদিগকে জলের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে এবং হয়ত আপনাকেও সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তখন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "প্রস্তুত হও আর সময় নাই। আমাদের যতদূর সাধ্য তাহা করিয়াছি এখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রক্ষা করিতে হয় তিনিই করিবেন আর যদি মারিতে হয় তবে তিনিই মারিবেন।" এই বলিয়া ছেলে ও মেয়ে দুই জনকে দুই ক্রোড়ে করিলেন। এবং সস্নেহে তাহাদের মুখ চুম্বন করিলেন। সে দৃশ্য কি চমৎকার! এক দিকে যেমন পিতা মাতা সন্তান সন্ততির রক্ষার জন্য আপনাদের কথা ভুলিয়াছেন অপর দিকে

তেমনি সন্তান সন্ততিও পিতা মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এ ভয়ানক বিপদের কথা ভুলিয়াছে। সন্তান সন্ততি যেমন পিতা মাতার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় চিত্তে রহিয়াছে তেমনি পিতা মাতাও আবার জগতের পিতা মাতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্থির রহিয়াছেন; মানুষ যদি সকল সময়ে বুঝিতে পারিত যে তাহাদের রক্ষার জন্য সদা সর্ব্বদা একজন আপনার নিরাপদ ক্রোড় পাতিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইলে আর তাহারা বিপদের সময় এত চিন্তিত ও আকুল হইত না।

বসু বাবু এই বিপদের সময়ে স্থিরভাবে রহিলেন বটে কিন্তু সে ভাবে আর অনেকক্ষণ থাকিতে হইল না। জল ক্রমে ক্রমে গলা পর্য্যন্ত উঠিল—তখন তাঁহারা ছেলে মেয়েদিগকে কাঁধের উপর উঠাইলেন। কিন্তু জলের সঙ্গে কতক্ষণ সংগ্রাম চলে? মানুষের ক্ষুদ্র বল কতক্ষণ সে পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? আর এক ঢেউ—জলের আর এক আক্রমণ—তাহা হইলেই সমুদায় শেষ হইবে। সকলেই সেই যমদূত-স্বরূপ তরঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদূরে জলের ভয়ানক গর্জ্জন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকার এবং জীব জন্তুর বিকট চীৎকার শ্রুত হইল। পলকের মধ্যে সে তরঙ্গ—সে হাহাকার—বসু বাবুর ছাদের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ছাদে যাহারা ছিল তাহারা সে হাহাকারের শব্দ বৃদ্ধি করিয়া তরঙ্গের শরণাগত হইল। পলকের মধ্যে কত স্নেহ, প্রণয়, ভক্তি, ভালবাসা সে জলের গর্ভে ডুবিল—কত আশা ভরসা ধন সম্পদ সে স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া গেল। গভীর আঁধার ও জলের তর তর শব্দ ভিন্ন সংসারে আর কিছুই রহিল না। জলের স্রোত আনন্দে নাচিতে নাচিতে—বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে—সমুদ্রের দিকে চলিল। কেন না আজ জলের জয় স্থলের পরাজয়।

ক্রমশঃ

চন্দন কাঠ।

উদ্ভিদ্‌বেত্তারা এ পর্য্যন্ত যত প্রকার বৃক্ষের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, চন্দনের মত সৌগন্ধ বৃক্ষ আর একটিও দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে মহিসুর, কোয়েম্বাতুর এবং শালেম জেলা হইতে দক্ষিণে মদুরা এবং উত্তরে কোল্‌হাপুর পর্য্যন্ত চন্দনের জন্মভূমি। ইহারা ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতে এবং সামান্য ও শুষ্ক মাটিতেই অধিকাংশ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে চন্দনের বড় আদর। পৌত্তলিকদিগের পক্ষে দেব-পূজার জন্য ইহা একটি নিত্য পদার্থ। ইহা ছাড়া চন্দনের কাঠ হইতে এক প্রকার তৈল-সার প্রস্তুত করা হয় যাহা "চন্দনের আতর" বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। মহিসুরে এই আতরের খুব কারবার চলিয়া থাকে। এই আতর কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় জাতিই ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণই ইহার অধিক পক্ষপাতী। বৃক্ষের দেহের

কাষ্ঠ অপেক্ষা মূল হইতে যে আতর সংগ্রহ করা হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। চন্দনের বিচি হইতেও এক প্রকার ঘন তৈল বাহির হয়, যাহা দক্ষিণাত্যের দুঃখী লোকগণ সময়ে সময়ে দীপ প্রভৃতির জন্য জ্বালাইয়া থাকে।

এতক্ষণ চন্দন কাষ্ঠ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম তাহা পাঠক পাঠিকাদিগের অনেকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বোধ করি জানেন। কিন্তু এ সকল গুণ ছাড়া এমন একটি বিশেষ কার্য্যে চন্দন কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয় যাহার জন্য জগতের অন্যান্য জাতির নিকট ভারতবাসীরা যথেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন। সেইটি বলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে বোম্বাই, সুরট, আহম্মদাবাদ এবং কানাড়া, এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কুরে চন্দন কাষ্ঠ খুদিয়া যে সকল চমৎকার দ্রব্য তৈয়ার করা হয় তাহা পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই দেখেন নাই। ছবির ফ্রেম, পাখা, বাক্স, কলমদান, কাগজকাটা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য জিনিস এই কাষ্ঠ হইতে যে কতদূর সুন্দর ভাবে তৈয়ার করা হয় তাহা যাঁহারা কখন চক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। কানাড়া ও মহিসুরের কার্য্য প্রায় একরূপ ও সমান। ইহাতে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। সুরট ও আহম্মদাবাদের কার্য্য একটু বিভিন্ন। উহাতে দেব দেবী এবং বৃক্ষ লতাদি উভয় প্রকার কারিকুরিই একত্রে জড়িত। আর একটি কথা। মহিসুর ও কানাড়ার চিত্র সমূহ যত অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ হইতে খুদিয়া বাহির করা হয় অপরাপর জায়গার দ্রব্যগুলি তত গভীর করিয়া খোদা হয় না। এ সম্বন্ধে শিল্প জগতে কানাড়া ও মহিসুরের সম্মানই অধিক।

বোম্বাই প্রদেশে আর এক প্রকার কারিকুরি দেখা যায়। শুদ্ধ চন্দন কাঠের জিনিশ তৈয়ার না করিয়া কখন কখনও বা নানা প্রকার লতা পাতা কাটা বাক্স প্রভৃতির চারি ধারে ও মাঝে মাঝে হাতির দাঁত ও আবলুশ কাঠ বসাইয়া জিনিসগুলিকে সাজান হয়। এই রূপ কায করা বাক্স প্রভৃতি সাহেব মহলে "Bombay boxes" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চন্দনের চামর বড়ই সুন্দর। প্রায় এক গজ লম্বা একখণ্ড সার কাষ্ঠ হইতে সূচি প্রমাণ সূক্ষ্ম এক একটি কাঠি খুদিয়া বাহির করিয়া ঐ সকল কাঠি একত্র গোছা বাঁধিয়া একটি কাঠের বা হাতির দাঁতের বাঁটের সহিত সংলগ্ন করা হয়। এই চামরের হাওয়া ক্ষণকাল সেবন করিলে প্রাণ পুলকিত হয়। বড় বড় রাজা মহারাজাদিগকে ব্যজন করিবার জন্য চামর ব্যবহার করা হয়।

মহিসুরের ১৭ইঞ্চি লম্বা, ১১ইঞ্চি চওড়া ও ৮ইঞ্চি উচ্চ একটি উত্তম কাজ করা দেব দেবীর মূর্ত্তিযুক্ত একটি বাক্সের মূল্য ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা। জহরৎ বাক্স ৪০৲ হইতে ৮০৲; দস্তানা বাক্স ২০৲ হইতে ২৫৲; তাসের খোল ১০৲ হইতে ১২৲; কাগজ কাটা ৩৲ হইতে ৪৲; পাখা ॥০ হইতে ১৬৲; চামর ১৫৲ হইতে ৭০৲; ছড়ি ১০৲ হইতে ২৫৲; এবং কলমদান ৪৲ হইতে ১০৲ টাকা।

বালকের সততা।

মহম্মদ খাঁ নামক একজন সওদাগর গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে মর্ণিং পোষ্ট নামক পত্রিকায় নিম্ন লিখিত ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

"১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে আমি বান্দা নগর দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় কোন নদীর পার্শ্ববর্ত্তী এক উদ্যানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যাইবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ একটী ছোট ব্যাগ যাহাতে আমার প্রভুর ৫০০০৲ টাকা মূল্যের নোট ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য ছিল তাহা ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়াই আমি টের পাইলাম যে, ব্যাগ ফেলিয়া আসিয়াছি এবং সেই মুহূর্ত্তেই ফিরিলাম। পথিমধ্যে ১৩। ১৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালকের সহিত পণ্ডিতের পুকুরের নিকট সাক্ষাৎ হইল। বালক আমাকে উৎকণ্ঠিত ও ত্রস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিছু হারাইয়াছেন কি?" আমি উত্তর করিলাম হাঁ। বালক আমার ব্যাগ আমাকে ফিরাইয়া দিল। আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ব্যাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে কি আছে তাহা বালককে দেখাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি প্রকারে এই প্রলোভন সহ্য করিলে। বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে আমি বাল্যকাল হইতে পর দ্রব্যকে ঢিলের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাহার জনক জননীকে অভিনন্দন করিলাম যে তাঁহারা এমন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাফের বলিয়া তাহার ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার প্রতি যে ঘৃণা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে স্বর্গীয় দুত ভাবিলাম। বালককে আমি ৫৲ টাকা দিতে চাহিলাম কিন্তু সে তাহা লইল না; বলিল যে আমি আপনার জন্য কিছুই করি নাই।

বালক এই প্রকারে আমাকে রক্ষা না করিলে আমি জেলে যাইতাম; ও আমার সর্ব্বনাশ হইত। আমি একজন দরিদ্র কাবুলী, আমার আর কোন সাধ্য নাই। চিরকাল জগদীশ্বরের নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিব। বালকের নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বান্দা জেলা স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে পাঠ করে।"

আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর।)

আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্ক একজন স্কটলণ্ড দেশীয় লোক তিনি জাহাজে কাজ করিতেন। ঐ জাহাজের কাপ্তেন ষ্ট্রাড্‌লিং উপরি লিখিত ঘটনার চারি বৎসর চারি মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে এই দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কালের মধ্যে ঐ দ্বীপের নিকট দিয়া অনেক জাহাজ গিয়াছিল, কিন্তু দুই খানি মাত্র ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। উহারা স্পানিয়ার্ড জাহাজ এবং

উহার নাবিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে; তাহাতে নিকটস্থ অরণ্যে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। ডিউক জাহাজের কাপ্তেন রজার্স তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন;—

ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে বলিলেন যে স্কটলণ্ডস্থ ফাইফ্‌থায়োরের অন্তঃপাতী লার্গো নামক স্থানে তাঁহায় জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি নাবিকের কর্ম্ম শিক্ষা করেন। তিনি যে জাহাজে কাজ করিতেন তাহার কাপ্তেনের সহিত মনান্তর ঘটায় ও জাহাজের স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া জল উঠিতেছে দেখিয়া তিনি প্রথমে নিজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নির্জ্জন দ্বীপে থাকিতে চান। কিন্তু পরে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কাপ্তেন আর তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি তাঁহার বস্ত্রাদি, শয্যা, একটী বন্দুক, কিঞ্চিৎ বারুদ ও গুলি, এক খানি ছুরি, একটী জল গরম করিবার পাত্র, একখানি বাইবেল ও অন্য কয়েকখানি পুস্তক, গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী যন্ত্র ও অন্য দুইটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া সেই জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আহারান্বেষণ ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে আপনাকে ব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু প্রথম আট মাস তাঁহার একাকী থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। তিনি পিমেণ্টো নামক এক প্রকার বৃক্ষ দ্বারা দুই খানি কুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং বড় বড় ঘাস দিয়া তাহার চাল ছাইয়া ছিলেন। ঘরের ভিতরে ঝড় বৃষ্টির গতিরোধ করিবার জন্য বৃক্ষনির্ম্মিত প্রাচীর ছাগ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন; ঐ দ্বীপে অনেক ছাগল বন্য অবস্থায় চরিয়া বেড়াইত। যত দিন বারুদ ও গুলি ছিল ততদিন তিনি গুলি করিয়া ছাগল মারিতেন পরে বারুদ ফুরাইয়া গেলে দৌড়িয়া ছাগল ধরিতেন। বারুদের অভাবে তিনি দুইখণ্ড পিমেণ্টো কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। কুটীর দুই খানির মধ্যে একখানি বড় ও এক খানি ছোট। তিনি ছোট খানিতে রন্ধনাদি ও বড়খানিতে শয়ন করিতেন। জীবন ধারণোপযোগী কার্য্য করিয়া যে সময় থাকিত সেই সময় পাঠ, প্রার্থনা, ধর্ম্মসঙ্গীত গানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঐ নির্জ্জন বাসের সময় তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে সেরূপ কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না তাহাও সন্দেহস্থল। ক্রমশঃ।

ধাঁধা।

এক একটা কথার দুরকম অর্থ হয় সে একটা ধাঁধা। আবার কয়েকটা কথা লইয়া তার এক একটার অর্থ বা উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখাইয়া কোন নূতন কথা গড়া বা একটা বড় কথার কয়েকটী অংশের অর্থ দিয়া সে কথাটা কি সিদ্ধান্ত করাও ধাঁধা। অর্থাৎ যাহা হঠাৎ সহজে বুঝা যায় না একটু ভাবিতে হয়, যাহার জন্য একটু মাথা ঘুরাইতে হয় তাহাই ধাঁধা।—যেমন "আমার আধ খানা সাহেব আধ খানা বাঙ্গালী, কিন্তু দুই অপদার্থ বল ত আমি কি ফল?" আবার দেখ "হস্ত পদ নাহি তার নাহি বাক্ শক্তি, কৌশলেতে কথা কয় বুঝে কার শক্তি। পবন সমান হয় তাহার গমন, বিদ্যুৎ আকার তার সমস্ত লক্ষণ।" এই দুইটী ধাঁধা। আবার তোমরা গোলক ধাঁধা জান, শ্লেটে পেনসিল দিয়া

ঘেরাল লাইন টানিয়া ঘর আঁক, সেই ঘর হইতে কি উপায়ে বাহির হইতে পারা যায় তাহা স্থির করাও একটা ধাঁধা। আবার এক ঘটি জলের ভারে একজন মানুষকে তিন হাত উপরে তোলা যায় ইহাও একটা ধাঁধা।

এবার তোমাদের এক রকম ধাঁধার কথা বলিতেছি এগুলি চোখের ধাঁধা। বর্ষাকালে গঙ্গার বা অন্য কোন নদীর জল বাড়িয়া যখন খুব স্রোত হয় তখন দুই ধারের জল অপেক্ষা নদীর মাঝখানের জল অধিক বেগে বহিতে থাকে। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া মাঝখানের জলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া যদি ধারের দিকে তাকান যায় তবে বোধ হইবে যেন ধারের জল উজান বহিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। সাদা কাগজের উপর পয়সার মত কাল দাগ আর কাল কাগজের উপর পয়সার মত ঠিক তত বড় সাদা দাগ দিয়া যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে সাদা দাগটা কাল দাগ অপেক্ষা বড় দেখাইবে। চতুর্থী বা পঞ্চমী তিথিতে উজ্জ্বল অর্দ্ধ চন্দ্রের উপর অনুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উজ্জ্বল অংশটী সেই রেখা ছাড়াইয়া তাহার বাহিরে পড়িয়াছে দেখায়। এটাও ধাঁধা।

নীচে এক রকম ধাঁধার ছবি দিলাম। এই পৃষ্ঠা খুলিয়া সখা খানি ভাঁজ করিয়া ছবিটা সম্মুখে রাখিয়া ডান হাতে সখার নীচের ডান কোনা ধরিয়া যদি ঘোরাবার মত করে কাগজ খানি শীঘ্র শীঘ্র নাড়িতে থাক (অর্থাৎ ডান কোনা ধরিয়া কাগজের বাম দিকের কোনাকে পেনসিল মনে করে টেবিলের উপর বা দেওয়ালে যদি গোল চাকা আঁকা যায় তবে যেরূপ গতি হয় সেইরূপ গতি দিলে) দেখিতে পাইবে যে ছবির সব চাকাগুলি আপন আপন কেন্দ্রের উপর ঘূরিতেছে। যত শীঘ্র হাত ঘূরাইবে তত শীঘ্র চাকাগুলিও ঘূরিতে থাকিবে। যে দিকে কাগজ ঘূরাইবে, চাকাগুলিও সেইদিকে

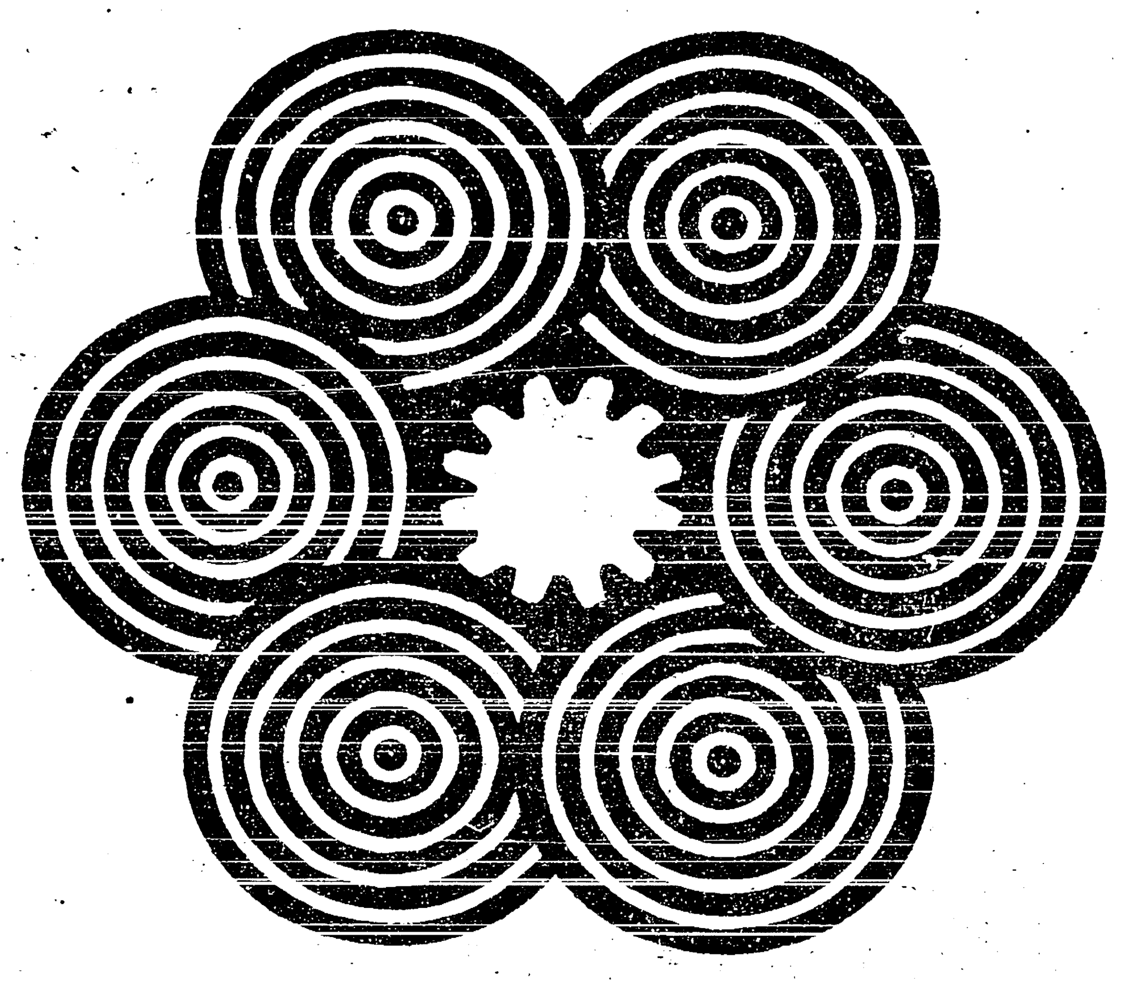

ঘূরিবে। কিন্তু এই ছবির ভিতরে যে খাঁজ-কাটা সাদা চাকাটী আছে সেটী বিপরীত দিকে ঘুরিবে। এ চোখের ধাঁধা, বাস্তবিক চাকাগুলি ঘূরে না। অথচ দেখায় যেন ঘূরিতেছে।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, সিলং—১৮৮৬ সালের সখার মূল্য শ্রীমানের নিকট এখনও বাকী আছে। দুই বৎসরের পূর্ব্বের ঋণ এখনও শোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। সম্প্রতি তাগীদ দেওয়াতে উক্ত শ্রীমান টাকা না দিয়াই যেরূপ অশ্লীল ভাষায় আমাদিগকে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার ভদ্রতা জ্ঞান যে কিছুমাত্র আছে এমন বোধ হয় না। আমরা ইহার অভিভাবককে উপদেশ দিই যে, তিনি যেন ইহাকে পুনর্ব্বার গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষার্থে পাঠাইয়া দেন, তথায় দুই চারি ঘা বেত্রাঘাত ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা ইহার চরিত্র ভাল হইবার সম্ভব নহে।

সখা।
ষষ্ঠ ভাগ। দশম সংখ্যা।
অক্টোবর, ১৮৮৮।

ভাই বোন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

পৃথিবীতে কাহারও পরাক্রম চিরকাল থাকে না। অত্যাচারী মনে করে তাহার ক্ষমতা চিরদিনই সমান ভাবে থাকিবে; কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতেই সে ক্ষমতা কোথায় চলিয়া যায়! আগুন যখন ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন সে মনে করে সমুদায় পৃথিবীই তাহার উদরসাৎ হইবে; কিন্তু অল্পক্ষণেই তাহার সে ভ্রম দূর হয়—মহা ক্ষমতাশালী অগ্নি ভস্মরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অতি তুচ্ছ পদার্থ মধ্যে গণ্য হয়। সকলেই এই নিয়মের বশীভূত। সমুদ্র মহা পরাক্রমশালী হইলেও এ নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না; কারণ যিনি এ নিয়মের কর্ত্তা তাঁহার ক্ষমতার নিকট সমুদ্রের বল অতি তুচ্ছ। তাই আজ আর জলের সে আনন্দ ধ্বনি নাই—সে জয় শব্দ নাই। কাল যেখানে জলের তর তর শব্দ ছিল আজ সেখানে মানুষ এবং কুকুর বিড়াল প্রভৃতির মৃত দেহ রহিয়াছে। অত্যাচারীর পরাক্রম চিরস্থায়ী হয় না বটে কিন্তু লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। তাই আজ সমুদ্রের অত্যাচারে সহস্র সহস্র জীবজন্তু প্রাণ হারাইয়াছে—পিতা মাতা, পুত্র কন্যা বিহীন হইয়াছে—ভ্রাতা ভগিনী চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—শত শত বালক বালিকা পিতা মাতা হীন হইয়া চিরদিনের জন্য অনাথ হইয়াছে। বৃক্ষ লতা পর্য্যন্তও এ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—শত সহস্র বৃক্ষ লতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রের যে অবস্থা হয় আজ দৌলত খাঁর সেই অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধ হইতে অধিক ভয়ানক। এ যুদ্ধে কাহারও পরিত্রাণ নাই। মানুষ হইতে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত সকলেই এ ভীষণ যুদ্ধে হত হইয়াছে। দৌলত খাঁ আজ ভীষণ শ্মশান—মানুষ যাহারা জীবিত ছিল তাহারা প্রেত ও পিশাচের আকার ধারণ করিয়াছে—লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্র অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য দস্যুর ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ফিরিতেছে এবং মৃত কিম্বা অর্দ্ধ মৃতের শরীর হইতে পিশাচের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতেছে। যে হতভাগ্য বা হতভাগিনী এখনও জীবনের আশা করিয়া সেই দস্যুদিগের নিকট জল চাহিতেছে তাহারা জলদানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু অস্ফুটস্বরে "মা" "বাবা" বলিয়া

কাঁদিতেছে; কিন্তু নরপিশাচদিগের হৃদয়ে তাহাতে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদয় হইতেছে না। মানুষ কিরূপে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে পারে তাহারা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কোথাও বা শিয়াল কুকুরে মৃত মাতার বক্ষঃস্থল হইতে মৃত কিম্বা প্রায় মৃত শিশুকে কাড়িয়া লইয়া আহার করিতেছে। যে মাতা জীবিত থাকিতে প্রাণান্তেও আপনার শিশুকে ছাড়িতেন না আজ তিনি বিনা আপত্তিতে আপনার স্নেহের পুত্তলিকে শেয়াল কুকুরের আহারের জন্য দিতেছেন। কোথাও বা কাক গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষী সকল কোটর হইতে মানুষের চক্ষু বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ নরনারী সকল বিকট ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা মানুষ ও পশু পক্ষী একত্রে মৃত্যু শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। মৃত্যুর অধিকারে কাহারও প্রতি কাহারও ভয় বা বিদ্বেষ নাই। জীবিত থাকিলে যাহারা মানুষের আলয় হইতে শত যোজন দূরে থাকিত—মানুষ যাহাদিগকে ভয় বা ঘৃণা করিয়া কখনও তাহাদের নিকটে যাইত না—আজ তাহারা মৃত্যুর অনুগ্রহে সকলেই এক শয্যায় শয়ন করিয়াছে। আজ আর মান অভিমান নাই—ভেদাভেদ নাই। সকলেই ভাই ভাই—সকলেই এক পিতা মাতার সন্তান।

এ দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিবেন। অনেকেরই মনে হইবে "ঈশ্বরের কি অবিচার!" কিন্তু তাঁহাদিগকে একটী কথা ভাবিতে বলি। যদি এ সংসারে মন্দ না থাকিত এবং সকলেই ভাল হইত তবে কি ভাল বলিয়া একটা কথা থাকিত, না তাহার আদর থাকিত? যদি অন্ধকার না হইয়া প্রতিদিনই পূর্ণচন্দ্র উঠিত তবে কি চাঁদের আলোকে মানুষ এত আহ্লাদিত হইত? অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের এত আদর—"মন্দ" আছে বলিয়াই "ভাল"র এত সম্মান। কেবল তাহাই নহে,—যখন অন্ধকারের ভিতর আলোক দেখা যায় তখন তাহা আরও উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। রাত্রি যত বেশী আঁধার হয়, নক্ষত্রের আলোক ততই অধিক উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। যখন লোকে দুঃখ ও দুর্দ্দশায় পতিত হয় তখনই তাহাদের সদ্‌গুণ সকল নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশিত হয়। চারিদিকে যখন অসৎ কাজ ও অসাধু ব্যবহার দেখিয়া অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয় তখন যদি ভাগ্যক্রমে কোন পুণ্য কর্ম্ম বা সাধু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আর আনন্দের সীমা থাকে না। সে সৎকাজ সামান্য হইলেও অতিশয় মনোরম বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথাঃ—সংসারে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা পাপ নাই। ঈশ্বরের এমনি ইচ্ছা এবং সুবিচার যে যাহা আমরা অতিশয় ঘৃণাজনক কার্য্য মনে করি তাহার মধ্যেও শিক্ষার বিষয় আছে—যাহা আমাদের নিকট ঈশ্বরের অবিচার বলিয়া বোধ হয় তাহাও আমাদের শিক্ষার জন্য। কোন কাজে তোমার আমার ক্ষতি হইতে পারে স্বীকার করি কিন্তু হয়ত তাহাতে পৃথিবীর শত সহস্র লোকের উপকার হইবে। আমরা স্বার্থপর—নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত—তাই যে কাজে আমরা অসুখী হই—যাহাতে আমাদের লালসা পূর্ণ হয় না—তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের অবিচার মনে করি। আমাদের বুদ্ধি অতি সামান্য—সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না তাই মূর্খের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি। ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও অবিচার নাই—কোথাও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা পাপ নাই।

দৌলত খাঁর এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া একদিকে যেমন পৃথিবীকে নরক বলিয়া বোধ হয় তেমনি

অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় "পৃথিবীই স্বর্গ—স্বর্গ বলিয়া অন্য কোন স্থান নাই।" যখন দেখা যায় যে জননী জলের স্রোতে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু তবুও বক্ষঃস্থিত শিশুকে পরিত্যাগ করেন নাই—শত সহস্র প্রবল তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তবু সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই—জলের খরতর স্রোতে তাঁহার অপত্যস্নেহ ভাসিয়া যায় নাই—তখন কে বলিবে পৃথিবী স্বর্গ নহে? যখন দেখা যায় অর্দ্ধ মৃতা ভগিনী মৃতপ্রায় ভ্রাতার জন্য অতি কষ্টে জল আনয়ন করিতেছে—তখন কে বলিবে পৃথিবীর লোক কেবল আপনার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত? এত মানুষের কথা;—দৌলত খাঁর সে প্রলয়ে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য্য ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। মহাদেবের আরাসস্থল কৈলাস ভবনের বণনা পড়িয়াছি;—সেখানে পশু পক্ষী পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলেই শান্ত ভাবে বাস করে—বিড়ালে ইন্দুরে, সাপে ময়ূরে, একত্রে বন্ধু ভাবে থাকে। কৈলাস ভবনে কখনও যাওয়া ভাগ্যে ঘটে নাই সুতরাং সেখানকার কথা বলিতে পারি না কিন্তু ৮২ সালে দৌলতখাঁতে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা জানি। এক বৃক্ষের উপর মানুষ, সাপ এবং বাঘ একত্রে রহিয়াছে দেখা গিয়াছিল।

এ ভাবে দৌলত খাঁ অনেকক্ষণ রহে নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে যত শীঘ্র সম্ভব সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। মৃতদেহ সরাইয়া দেওয়া হইল—অর্দ্ধ মৃত এবং কাতর যাহারা ছিল তাহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল—যাহারা জীবিত ছিল তাহাদিগকে খাদ্য এবং বস্ত্র দেওয়ার হুকুম হইল। জীবিতেরা আপনাদিগের ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদিও গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি মড়ক নিবারণ হয় নাই। মৃত মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতির দুর্গন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইল এবং সে জন্য যাহারা জীবিত ছিল তাহাদেরও অধিকাংশ সংক্রামক রোগে প্রাণত্যাগ করিল।

এ সময়ে বসু বাবু এবং তাঁহার পুত্র কন্যা কোথায়? অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক হইল না—পুলিষের রিপোর্টেও কিছু জানা গেল না। কেবল বসু বাবুর স্ত্রীর মৃতদেহ শিশুসন্তান বক্ষে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া পুলিষ কর্ম্মচারীরা অনুমান করিল; কিন্তু কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেল না। শরীর ফুলিয়া বিকৃত হইয়াছিল—দস্যুরা হস্তপদ হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে তাহার চিহ্ন পাওয়া গেল—একটী শিশু ক্রোড়ে ছিল সে বসু বাবুর কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অনুমিত হইল। বসু বাবুর স্ত্রী হিন্দুকূল বধু; কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই—দাস দাসী যাহারা ছিল তাহাদিগকেও পাওয়া গেল না।—সুতরাং পুলিষ কর্ম্মচারীরা অন্য উপায় না দেখিয়া অনুমানে কার্য্য শেষ করিলেন। বসু বাবু উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী—তাঁহার স্ত্রীর অনুসন্ধান হওয়াই চাই সুতরাং পুলিষ ঠিক করিল সেই মৃতদেহই বসু বাবুর স্ত্রীর; এবং সেইরূপ রিপোর্ট প্রেরণ করিল। কিন্তু বসু বাবু ও তাঁহার পুত্র কন্যার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

ক্রমশঃ

আর্কিয়প্টেরিক্স্।

আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে মামথের কথা বলিয়াছি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কত অদ্ভুত জীব জন্তু পৃথিবীতে ছিল তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত তাহাদের অস্থি কঙ্কালে টের পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব জন্তু পৃথিবীতে বাস করিত। এখন কেবল তাহাদের চিহ্নাবশিষ্ট রহিয়াছে। ভারতবর্ষেই নর্ম্মদাতীরে এত প্রকাণ্ড এক হস্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছে যে অত বড় জীব পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল কিনা আজও বলা যায় না।

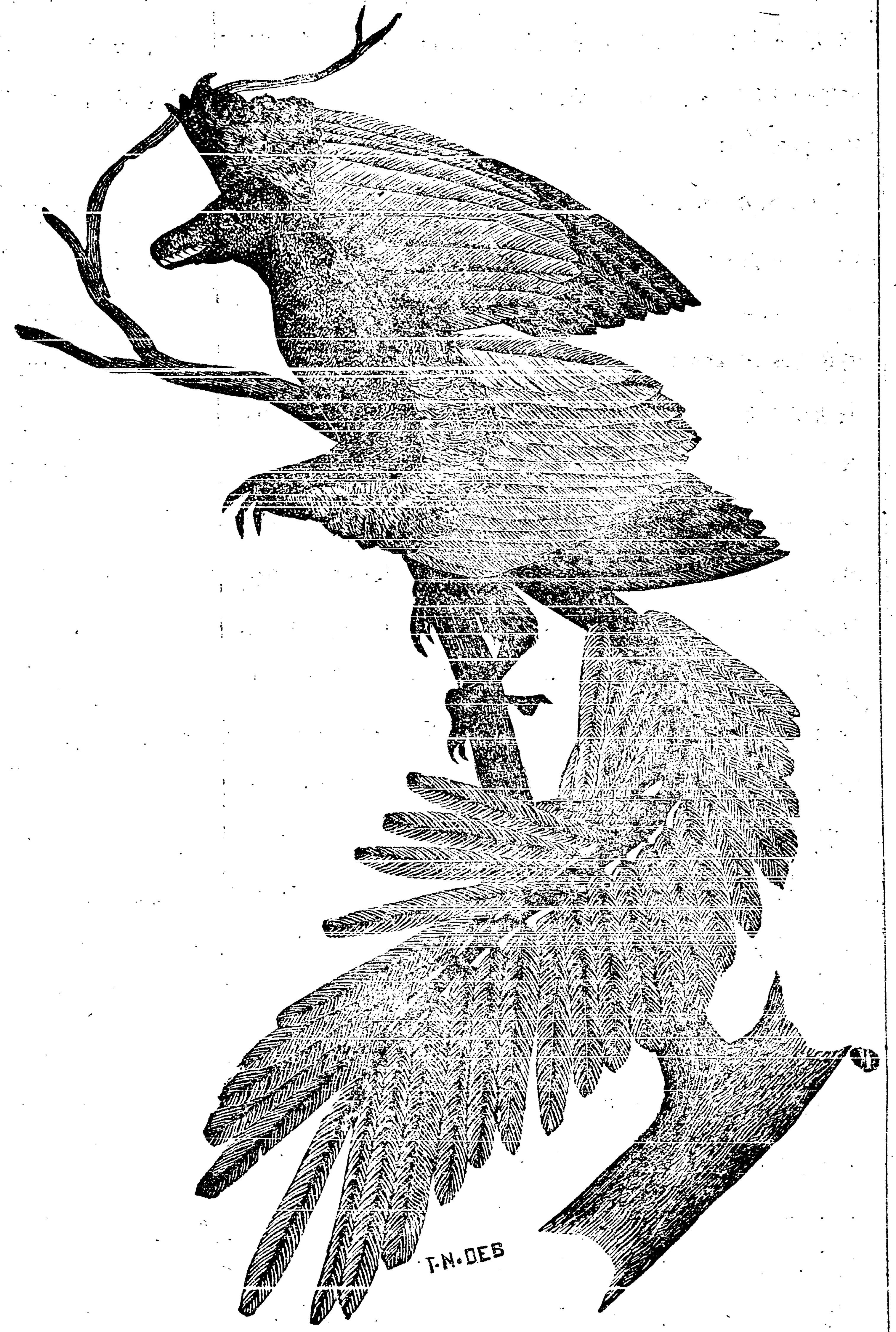

তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এখন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আমরা যত জাতের জীব দেখিতে পাই সেই সব গুলিই যে এইরূপ হইয়াই সৃজিত হইয়াছে এবং বরাবরই এইরূপ থাকে তাহা নহে। এক জাতীয় জীব কালক্রমে বংশ পরম্পরায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ও পরবংশীয়দের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং তখন ইহারা যে এক জাতীয় তাহা আর বলা যায় না। এইরূপে এক জাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়।

পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ সরীসৃপ। পাখীরা টিকটিকি গিরগিটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে টিকটিকির ডিম ফুটিয়া একটা পাখী বাহির হইয়াছিল বা হইতে পারে।

হঠাৎ এরূপ রূপান্তর হয় নাই; অল্পে অল্পে অদৃশ্য রূপে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। এবং এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতে কত যুগ লাগিয়াছে কে বলিতে পারে? সরীসৃপ রূপান্তরিত হইয়াই যদি পাখী হইল তবে পাখী আর সরীসৃপের মাঝামাঝি কোন এক প্রকার জীব অবশ্য জন্মিয়াছিল। সেটা কি? এবং তাহার কি কোন চিহ্ন পাওয়া যায়? এই অদ্ভুত সরীসৃপ-পক্ষীর দেহের অল্পাংশ মাত্রই ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বাভেরিয়া দেশের কোন গিরি প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার প্রায় বার বৎসর পরে বোধ হয় সেই প্রদেশেই এই জীবের একটী সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়। এই পক্ষীর একটী প্রকাণ্ড লেজ আছে। লেজে কুড়িটী গাঁইট আছে এবং প্রত্যেক গাঁইটের দুই ধার হইতে দুইটী পালক বাহির হইয়াছে। পা দুখানি ঠিক পাখীর পা। ডানা দুখানিতে যে দুইটা পা আছে, তাহা ঠিক যেন সরীসৃপের পা। কোন পাখীরই দাত হয় না; কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি দাঁত আছে। মস্তিষ্ক পক্ষীর ন্যায়। ডানায় পায়রার পালকের মত পালক এবং পায়ে পাখীর লোমের মত লোম আছে। শরীর সরীসৃপের ন্যায়। শরীরের আর কোন অংশে পালক নাই। শরীর টিকটিকির ন্যায় চর্ম্মে আবৃত পালকগুলি বোধ হয় অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত। চক্ষু সরীসৃপের চক্ষুর ন্যায়। এই পাখী কাকের মত বড় হইবে। ইহার নাম আর্কিয়প্টেরিক্স্ রাখা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বতন জীবেরা কিরূপ ছিল, কেনই বা ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইল কে বলিতে পারে? ইহা ত বহুদিনের কথা। এক শত বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা যে দুই একটী অদ্ভুত জীব দেখিয়া তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই জীব আর আমরা দেখিতে পাই না। তাহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কত প্রকারের জীব এই পৃথিবীতে জন্মিল আর কতই লোপ পাইল। আরও কত নূতন প্রকারের জীব জন্মিবে কে বলিতে পারে?

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।

(১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম প্রথম সেলকার্ক নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত না হইলে কিছু খাইতেন না। তাহার কারণ প্রথমতঃ মানসিক কষ্ট, দ্বিতীয়তঃ রুটী লবণের অভাব। অপরিচিত স্থানে কখন কি বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, জাগিয়া থাকা যখন সাধ্যাতীত হইত কেবল তখনই তিনি শয়ন করিতেন। পিমেণ্টো বৃক্ষের কাষ্ঠ তাঁহার অগ্নি ও প্রদীপের কার্য্য করিত। এই কাষ্ঠ জ্বালিলে কেবল যে পরিষ্কার আলোক উৎপন্ন হইত তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে এক প্রকার সৌরভ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত। তিনি মৎস্য বা মাংস কখন কেবল সিদ্ধ করিয়া, কখন বা উহার ঝোল প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। তিনি উক্ত দ্বীপে অবস্থান কালে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ ছাগল মারিয়া আহার করিয়াছিলেন এবং আর ৫০০ ছাগল ধরিয়া তাহাদের কাণে চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বদা

চলিয়া বা দৌড়িয়া আহার অন্বেষণ করিতে হইত বলিয়া তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি জঙ্গলের ভিতর ও পাহাড়ের উপর অসাধারণ বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন।

লবনহীন মাংসে তাঁহার যে অরুচি ছিল তাহা ক্রমে চলিয়া গেল। তিনি যে জাহাজের কাপ্তেন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সেই জাহাজের নাবিকেরা উক্ত দ্বীপে কতকগুলি শালগামের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিল। তাহা ক্রমে অনেক বিঘা ভূমির উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শীত কালে ঐ ভূমিতে শালগাম উৎপন্ন হইত তাহাও তিনি আহার করিতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ দ্বীপে এক প্রকার কপি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং পিমেন্টো বৃক্ষের ফল তাঁহার ব্যঞ্জনের মরীচের কার্য্য করিত। বনে দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রমে তাঁহার পাদুকা ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে এবং পাদুকা নির্ম্মাণের উপায় না থাকাতে তিনি খালি পায়েই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাহাতে তাঁহার পায়ের চর্ম্ম এমন কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে তিনি অনায়াসে বিনা পাদুকায় পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত বেড়াইতে পারিতেন এবং ঐ দ্বীপ ত্যাগের পরে পাদুকা ব্যবহার করিলেই তাঁহার পায়ে বেদনা হইত। নির্জ্জন বাস-জনিত বিষাদের লাঘব হইলে পর তিনি অন্যমনস্ক হইবার জন্য নিজের নাম, ঐ দ্বীপে আসিবার দিন এবং কত দিন তিনি সেখানে আছেন তাহা গাছের গায়ে খুদিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জাহাজ কাষ্ঠ বা জল লইবার জন্য ঐ দ্বীপের নিকট নঙ্গর করিত তাহা হইতে যে সকল বিড়াল ও ইন্দুর দ্বীপে উঠিয়াছিল তাহাদের ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে সেলকার্ককে প্রথম প্রথম বিড়াল ও ইন্দুরের উৎপাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাত্রে যখন ঘুমাইয়া থাকিতেন তখন ইন্দুরগণ তাঁহার পায়ে কামড়াইত ও তাঁহার পোষাক কাটিয়া ফেলিত। তখন তিনি বিড়ালগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছাগলের মাংস খাইতে দিতেন। ক্রমে তাহারা এমন পোষ মানিল যে রাত্রে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শুইয়া থাকিত এবং ইন্দুর আসিলেই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। এতদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি ছাগলকে পোষ মানাইয়াছিলেন। নির্জ্জনতার কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে এই সকল পালিত ছাগ ও বিড়ালদিগকে লইয়া নৃত্যগীত করিতেন। এইরূপে ঈশ্বরের কৃপায় ও যৌবন-কাল-সুলভ শারীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে তিনি শীঘ্রই নির্জ্জন বাস-জনিত অসুবিধা ও কষ্টের উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেলে পর সেলকার্ক প্রেক দ্বারা ছাগচর্ম্ম সেলাই করিয়া একটা জামা ও টুপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সুতার অভাবে ছাগলের চামড়া ছুরি দিয়া সরু সরু ফিতার মত করিয়া কাটিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছুরি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে পর তিনি উপকূল হইতে নাবিকদিগের পরিত্যক্ত পিপার বেড়ের লৌহ লইয়া দুই খণ্ড প্রস্তরের সাহায্যে তাহা পাতলা ও ধারাল করিয়া ছুরির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি সূতার কাপড় ছিল; পুরাতন মোজার সূতাও প্রেকের দ্বারা সেলাই করিয়া তিনি তাহা হইতে কতকগুলি কামিজ প্রস্তুত করেন। যখন আমাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন ঐ সকল কামিজের মধ্যে একটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ব্যবহারের অভাবে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা অনেক ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের জাহাজে আসিবার পর প্রথম আমরা

তাঁহার কথা অনেক সময় বুঝিতে পারিতাম না। তিনি সকল কথা সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন; কারণ ঐ দ্বীপে অবস্থান কালে তিনি জল ভিন্ন অন্য কোনও পানীয় গ্রহণ করেন নাই, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগের রন্ধন করা খাদ্য আহার করিতে পারিতেন না। আমরা প্রায় এক পক্ষকাল সেখানে ছিলাম। সেই সময়ে তিনি জাহাজস্থ রোগীদিগের জন্য প্রত্যহ দুই তিনটী ছাগল ধরিয়া দিতেন। তিনি ঐ দ্বীপে কোনও বিষাক্ত বা হিংস্র জন্তু দেখেন নাই। বিড়াল, ইন্দুর ও ছাগল ব্যতীত অন্য কোনও পশু তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ নামক এক ব্যক্তি আর কয়েকটী পরিবারের সহিত এই দ্বীপে কিছুদিন ছিলেন। তিনিই প্রথমে এখানে ছাগল আনয়ন করেন। পরে চিলি দেশ আবিষ্কৃত হইলে তাঁহারা সেখানে চলিয়া যান। এই ব্যক্তির নাম হইতে ঐ দ্বীপকে জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ দ্বীপ বলা হয়।

পৃথিবীর পূর্ব্ব কথা।

আজ পৃথিবী বৃক্ষ লতা, ফল পুষ্প, নদী পর্ব্বতে সুশোভিত। আজ বনে ফুল ফুটিতেছে, বৃক্ষ শাখায় পাখী গান করিতেছে, মানুষ চেষ্টা এবং যত্নে পৃথিবীকে স্বর্গের নন্দন কানন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু চিরদিনই কিছু পৃথিবীর এ অবস্থা ছিল না; এবং বোধ হয় চিরদিন থাকিবেও না। আজ যাহা দেখিতেছ, পৃথিবীর জন্ম হইতেই এ সকল কিছু ছিল না। আজ আমরা সংক্ষেপে পৃথিবীর পূর্ব্ব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা সকলেই ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, কমলা লেবুর ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। তোমরা ইহাও জান যে, পৃথিবী ক্রমাগত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয় চাপা, এবং কটিদেশ স্ফীত; ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল। কারণ তরল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত একটা গোলাকার বস্তু যদি ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার উপর এবং নিম্ন দিক চাপা হইলেই তাহার মধ্যস্থান স্ফীত হইবেই হইবে। কারণ তরল পদার্থ নির্ম্মিত একটা গোলক যদি ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার উপর এবং নিম্ন দিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে। সুতরাং পৃথিবী যে এক সময় তরল অবস্থায় ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পৃথিবী যেমন তরল অবস্থায় ছিল, তেমনি ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। সে কি ভয়ানক উত্তাপ তাহা মনেও ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যে উত্তাপে লৌহ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য তরল হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এ তেমনি উত্তাপ। পৃথিবী তখন ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত একটী বাষ্প গোলক মাত্র ছিল। কিন্তু পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে লাগিল। যে শূন্যপথে পৃথিবী ঘুরিতেছে সেখানকার উত্তাপ অতি সামান্য; সুতরাং এই শীতল আকাশ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমে কমিতে

লাগিল। এই রূপে পৃথিবী ক্রমে যত শীতল হইতে লাগিল, সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশিও ক্রমে তরল হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল তাহা নহে, কতকটা সেই উত্তপ্ত অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল। এখন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে এক বিন্দু জল নাই; এখনও আমরা সেই বাষ্পরাশি দ্বারা আবৃত, উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পৃথিবীর উত্তাপ যখন ক্রমে আরও কমিয়া আসিল, তখন সেই বাষ্পরাশি আর বাষ্পাকারে থাকিতে পারিল না। সেই বাষ্পরাশি ঘন হইতে লাগিল এবং জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। কিন্তু এখানকার বৃষ্টির ন্যায় সে বৃষ্টিজল শীতল নহে; তখনকার পৃথিবীও যেমন ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ছিল, বৃষ্টিও তেমনি উত্তপ্ত, সুতরাং উষ্ণ বৃষ্টিজল উষ্ণ পৃথিবীর উপর পড়িবামাত্র, আবার তাহা বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। আবার শীতল আকাশের পাশে শীতল হইয়া আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িল। কতদিন এই ভাবে চলিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু অবশেষে উত্তপ্ত বাষ্প এবং উত্তপ্ত পৃথিবী যখন খুব শীতল হইয়া পড়িল, তখন জল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। তখন চারিদিকে কেবল জল, জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। পৃথিবীর জীবনের সেই প্রথম যুগ। আমরা মামথ প্রবন্ধে এ যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং মনুসংহিতায় ও পুরাণেও এই যুগের কথা লিখিত আছে।

পৃথিবী এ পর্য্যন্তও ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমে যখন ইহার বাষ্পাবরণ পাতলা হইতে লাগিল, তখন ক্রমে সেই অন্ধকারময় পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণ দেখা দিল। এই সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন; এই সূর্য্যালোকই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য্যের মূল কারণ; এই সূর্য্যালোকের জন্যই সেই জলমগ্ন পৃথিবীকে, বৃক্ষ লতা, ফল ফুল, নদী পর্ব্বতে শোভিত দেখিতেছি; এই সূর্য্যালোকের জন্যই পৃথিবী আজ মানুষের বাসের উপযোগী হইয়াছে; এবং এই সূর্য্যালোক না থাকিলে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তিও হইতে পারিত না।

পৃথিবী যে উত্তপ্ত বাষ্পাবরণে আবৃত ছিল, সেই উত্তপ্ত বাষ্পের মধ্যে লৌহ প্রভৃতি ধাতুও বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। ক্রমে যখন পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল, এবং সেই শীতলতার জন্য যখন সেই বাষ্পরাশি জলরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইয়া সমুদ্র উৎপন্ন করিল; তখন লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতব পদার্থ বাষ্পাকারে ছিল, তাহাও বৃষ্টি জলের সহিত পৃথিবীর উপরে পড়িল। এই সকল পদার্থ রেণু ক্রমে সমুদ্র জলে স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্তর গঠিত হইতে লাগিল। এবং সেই সকল স্তর ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মহাদেশের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হইল বটে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ এখনও উত্তপ্ত এবং তরল রহিয়া গেল। ভিতরের এই অগ্নির প্রভাবে উপরের আবরণ যে স্থান কাটিয়া ধাতু স্রোত নির্গত হইল, সেইগুলি ছোট বড় নানা প্রকারের পর্ব্বত হইয়াছিল।

পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ব্বেই শীতল হইয়া জমিয়া কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু ভিতরটা তত শীঘ্র শীতল হয় নাই। কালে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ শীতল হইতে লাগিল, ততই ভিতরের তরল পদার্থ ঘন হইয়া বসিতে আরম্ভ করিল। তরল পদার্থ ঘন হইয়া জমিয়া কালে, আয়তনে ছোট হইয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর গর্ভস্থ তরল পদার্থ যখন জমিয়া কঠিন হইতে লাগিল, তখন আয়তনও কমিয়া গেল, কাজেই

পৃথিবীর উপরের আবরণটা অনেক স্থান তুবড়াইয়া এবং অনেকস্থান দমিয়া যাইতে লাগিল। এবং কোন কোন স্থান উচ্চ হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হইল। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত এই রূপে সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃথিবীর সেই বাল্যাবস্থায় যে সমস্ত দেশ মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সকল দেশ মহাদেশই যে এখন রহিয়াছে, তাহা নহে। কত হইয়াছে, কত গিয়াছে, আবার কত নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে, সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থ রেণু স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্থানে স্থানে স্থল হইয়া উঠিল; আবার কোন স্থানের স্থল সমুদ্র বেগে ভাসিয়া যাওয়াতে সে স্থান পুনরায় জলে পূর্ণ হইল। এই যে প্রকাণ্ড হিমালয়, ইহাও এক সময় সমুদ্র গর্ভে ছিল। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এমন কত দেশ মহাদেশ নির্ম্মিত হইয়া আবার সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। আজ যে স্থানে ফল ফুলে, বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ সুন্দর উপবন সে স্থান একদিন সমুদ্র গর্ভে ছিল। আবার আজ যে স্থানে সমুদ্র দেখিতেছ এক সময় সে স্থান হয়ত একটী সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। এই পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে ক্রমাগত চলিতেছে। পৃথিবী কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই। আজ যাহা আছে কাল আবার তাহা থাকিবে না।

ফুলের সাজি।

একাদশ অধ্যায়।

সুখের দিন।

দীননাথ ও মনোরমা যে গ্রামে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহার নাম গোপালপুর, তথায় দীননাথ ও মনোরমা কৃষক গৃহে বাস করিবার জন্য চিরন্তন বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কৃষক পত্নী পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্য দিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে আরও কিছু বাসন ও দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য কতকগুলি হাঁড়ি সরা প্রভৃতি প্রদান করিল। মনোরমা পুনরায় মনের সুখে আপনারা রন্ধন করিয়া আহার করিতে পাইয়া বড়ই প্রীত হইল। দীননাথ ও মনোরমা এত দুঃখের পর আবার সুখী হইল। দীননাথ সাজি প্রস্তুত করিতে করিতে মনোরমার সহিত কত সুন্দর সুন্দর কথা কহিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষক গৃহের সকল পরিবার একত্র হইয়া বৃদ্ধ দীননাথের গল্প শ্রবণ করিতে ভালবাসিত। কৃষকের ঘরের রকে একটী মাদুর পাতা হইত তথায় মনোরমা, কৃষক তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্র কন্যা সকলেই উপবেশন করিয়া দীননাথের উপদেশপূর্ণ নানা প্রকার গল্প শুনিয়া পরম আনন্দিত হইত।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইয়া বর্ষাকাল আরম্ভ হইল। কৃষকের বাড়ীর পশ্চাতে একখণ্ড পতিত জমি ছিল, কৃষক সময়াভাবে

তাহাতে কোন ফসলাদি জন্মাইতে পারিত না। দীননাথ কৃষককে বলিয়া তথায় একটী বাগান করিতে আরম্ভ করিল; সে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার অগ্রে স্থানটী কোদ্‌লাইয়া বৃক্ষাদি পুঁতিবার উপযুক্ত করিল। জমির চারিদিকে সুন্দর করিয়া বেড়া দিয়া তন্মধ্যে এক স্থানে শাক সব্‌জীর বীজ ছড়াইল, অপর স্থানে বেল, মল্লিকা, যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছ সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পুঁতিয়া দিল। মনোরমার উপর এই সকল বৃক্ষের পরিচর্য্যা অর্পিত হইল। দীননাথ বাগানের মধ্য দিয়া দুটী পরিষ্কার পথ করিয়া তাহার দুই ধারে ইষ্টক পুঁতিয়া পথের উপর খোয়া ছড়াইয়া বাগানটী মনোহর করিল। মনোরমা ঐ পথের স্থানে স্থানে এক একটী লতামণ্ডপ প্রস্তুত করিল। দীননাথের সুরুচির বলে ও মনোরমার তদ্বারকে অতি শীঘ্রই বাগানখানি অতি সুরম্য হইল। নিকটস্থ গ্রাম সকলের মধ্যে এমন আর একখানি বাগান ছিল না। দীননাথের রোপিত আম, জাম, আতা, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছগুলিও ক্রমে সতেজ হইয়া নূতন নূতন পত্র ফেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাগানটী মনোহারী শোভার আধার হইয়া উঠিল।

আবার উদ্যান কার্য্যে দক্ষ দীননাথ উদ্যানের কাজ পাইয়া পরম সুখী হইল। সে প্রসাদপুর নিজের বাগানে যেমন ফুল ও ফল হইতে আপন দুহিতা মনোরমাকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিত এখানেও সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিল। বাগানের প্রত্যেক ফল, পাতা বা ফুল হইতে দীননাথ আপনার উপদেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিত। বর্ষাকাল অতীত হইল,—একদিন মনোরমা নিকটস্থ কোন সরোবর হইতে কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় এক ছড়া মালা গাঁথিয়া পিতাকে অর্পণ করিল। দীননাথ হাস্যমুখে মালা গ্রহণ করিয়া বলিল "মা! যে ভাল খোঁজে তাহার ভালই মেলে; মনোরমা, এই পদ্ম ফুল হইতে শিখিবার অনেক আছে। এই কাঁটার মধ্যে পদ্ম ফুল ফুটার সহিত আমাদের অবস্থার ঠিক তুলনা হয়। কে বিশ্বাস করিবে যে, আমরা এই নির্জ্জন পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের মধ্যে আমরা এত সুখ ও আনন্দ লাভ করিব? স্থান যতই মন্দ বা সামান্য হউক না কেন, নিত্য সন্তুষ্ট ব্যক্তি তথায় বাস করিয়া কখন অসুখ অনুভব করেন না। তাই বলিতেছি মা মনোরমে, তুমি আরও বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতি হও তাহা হইলে কষ্টের মধ্যেও ভগবান তোমায় এমন সুখ প্রদান করিবেন যাহা কোন মনুষ্য অর্পণ করিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।"

নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকেরা গোপালপুরস্থ কৃষকের বাটীতে ধান্য ক্রয় করিতে আসিত, একদিন কোন কৃষক পত্নী আমাদের পরিচিত কৃষকের বাড়ীতে ধান্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটী ছেলে ছিল, সেই কৃষক পত্নী যখন ধান্য দেখিয়া ওজন করিয়া লইতেছিল তখন ঐ বালক পলাইয়া দীননাথের বাগানে প্রবেশ করিয়া একটী গোলাপ তুলিতে গেল। সে তাড়াতাড়ি যেমন ফুল লইয়া ছুটিয়া আসিবে অমনি একটা ইট পায় বাধিয়া পড়িয়া গেল—গোলাপ গাছের কাঁটায় তাহার গা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার চীৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া তাহার মা এবং গৃহস্বামিণী তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইল। দীননাথ ও মনোরমা প্রথমে একটী বালকের ক্রন্দন তৎপরে তাহাদিগকে ওরূপ শীঘ্র শীঘ্র যাইতে দেখিয়া কি হইয়াছে জানিবার জন্য তাহাদের

পশ্চাতে পশ্চাতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া দেখে বালকের গা কাঁটায় ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বালক "এমন খারাপ গাছ দেখি নাই; গাছে আমার গা চিরিয়া গেল; দুষ্ট গাছ" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

মনোরমা তাড়াতাড়ি এক ঘটী ঠাণ্ডা জল আনিয়া বালকের চকে মুখে দিল, এবং ক্ষত স্থানগুলির উপর তৈল মাখাইয়া দিল। কতক সুস্থ হইলে তাহারা বালককে লইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল এবং মনোরমা আপনার গৃহ হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া বালকের হস্তে দিল। এইরূপে ঐ বালক কতক ঠাণ্ডা হইলে বৃদ্ধ কহিল—"বালকের এই ফুল তোলা ও কষ্ট দেখিয়া আমার একটী কথা মনে উঠিতেছে। বালক যেমন ফুলের লোভে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল অনেকেই পার্থিব সুখের প্রলোভনে পড়িয়া সেই রূপ দিক বিদিক জ্ঞানহারা হয়। গোলাপ যেমন কণ্টকাবৃত বৃক্ষে জন্মে, পার্থিব সুখ সম্পদের চারিদিকও সেইরূপ বিপদাকীর্ণ। বালকের ন্যায় অনেক অজ্ঞান লোক এই সুখ লাভ করিতে গিয়া বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যে সুখের লোভে পড়িয়া বিপদগ্রস্থ হয় তাহারই নিন্দা করিতে থাকে। ভগবান আমাদিগকে যে সদ্‌বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন আমরা যদি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের পদে পদে বিপদ হইবার সম্ভাবনা"।

আর একদিন প্রভাতে মনোরমা বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখে তাহার সাধের সূর্য্যমুখী গাছগুলির মধ্যে একটী গাছে ফুল ফুটিয়াছে। গোপালপুরে তাহাদের প্রতিবেশী কেহ কখন এ ফুল দেখে নাই। দীননাথ দূরস্থ গ্রাম হইতে বীজ আনিয়া এই গাছ জন্মাইয়াছিল। মনোরমা প্রতিবেশী ও কৃষকের বাড়ীর সকলকে এই ফুল দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে বাগানে ডাকিয়া আনিল। তাহারাও ফুল সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের গৃহস্বামিণী অপরাপর সকলকে কহিল—"দেখ দেখ ফুলটী যেন সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; শুনিয়াছি যে দিকে সূর্য্য ফিরিবে ফুলও সেই দিকে ফিরিবে। সকাল বেলা সূর্য্য পূর্ব্বদিকে থাকে ফুলও পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে, দুপর বেলা সূর্য্য যেমন মাথার উপর থাকিবে ফুলও ঊর্দ্ধ মুখ হইবে, আবার বৈকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে যাইলে ফুলও পশ্চিম দিকে ফিরিবে, এইজন্য ইহার নাম সূর্য্যমুখী"। দীননাথ কহিল "ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু যে মানুষের মন সর্ব্বদা এই ফুলের মত ভগবানের দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে সেই ধন্য। আমরা যেন সুখে, দুঃখে, বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে কেবল হরির মুখ পানে চাহিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সকল ক্লেশ দূর হইবে। মনোরমে, আমার এই কথাগুলি মনে রাখিও।"

কৃষক কহিল--"আহা ইহার গাছটী যদিও সরু তবুও কেমন সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।"

দীননাথ উত্তর করিল "এই গাছ একটী অঙ্গুলির ন্যায় আমাদিগকে স্বর্গের দিকে দেখাইয়া দিতেছে—প্রতি পল্লীগ্রামে চাষাদের বাগানে এরূপ গাছ থাকা ভাল—কারণ আমরা প্রায়ই সংসারের কাজে ভগবানকে ভুলিয়া যাই। এই ফুল আমাদিগকে স্বর্গ, ঈশ্বরের কথা মনে করাইয়া দিতে পারে। আরও দেখ, ছোটই হউক আর বড়ই হউক, যত প্রকার গাছ বা লতা আছে সকলেরই ঊর্দ্ধ দিকে গতি। এমন কি লতাগুলি আপনি উঠিতে পারে না বলিয়া অপর কোন বৃক্ষ বা বস্তুর আশ্রয় লইয়া উপরের দিকে উঠে। মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতাকে এইরূপে উপরে উঠিতে তোমরা

অনেকে দেখিয়াছ। এই সব স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং সকলের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন হইয়া আমরা যদি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভগবানের দিকে লক্ষ্য না করি এবং নীচ বাসনার দাস হইয়া নীচ পার্থিব সুখে মনকে আবদ্ধ করি তাহা হইলে আমাদের ন্যায় কৃপাপাত্র আর কেহ নাই। সেই জন্য এস ভাই, আমরাও আমাদের মনকে উচ্চ বিষয়ে নিযুক্ত করি;—হরির চরণ চিন্তা ভিন্ন এখন আর কিছু নাই, এবং নীচ কামনা সকল একবারে ভুলিয়া যাই। গাছেরা যেমন যেদিকে রৌদ্র সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে আমারাও সেই-রূপ যেন সদা হরির কৃপা পাইবার জন্য আকুল হই।” দীননাথের কথায় উপস্থিত সকলেই বড় আনন্দ বোধ করিল এবং তাহার উপদেশে তাহাদের ক্রমে ক্রমে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইতে লাগিল। যেমন অগ্নির স্পর্শে অন্য পদার্থ ও অগ্নিময় হইয়া যায়, সাধু দীননাথের সহবাসে ক্ষুদ্র গ্রাম গোপাল-পুরের অধিবাসীগণও সাধুতা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল। দীননাথ এবং মনোরমাও গোপালপুরে সরল হৃদয় কৃষকবর্গ ও কৃষক বণিতাগণ দ্বারা পরি-বৃত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল এবং প্রসাদপুরের কষ্টের কথা ভুলিয়া আবার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইল।

যাঁহাদের হৃদয় পবিত্রতা ও শান্তির নিকেতন, যাঁহারা বিশুদ্ধ বিবেকযুক্ত ও নিষ্পাপ এবং যাঁহারা হরির চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা যতই কেন সামান্য স্থানে বাস করুন না, যতই কেন দরিদ্র হউন না কেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই।

ফুলের সাজি প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

তীতুমীর।

“নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুজরুগি করিল,
যত সব মিঞা মোল্লা,
বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাদসার সাথে লড়াই জুড়িল।”

তীতুমীরের লড়াইয়ের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। অমরা বাঙ্গালী—লড়াইয়ের ধার ধারি না; বাঙ্গলা সংবাদপত্রে লড়াইয়ের কথা লইয়া মহা আন্দোলন, এবং লড়াইয়ের মস্ত মস্ত বিবরণ দেখিতে পাও বলিয়া মনে করিও না, বাঙ্গালীর কোন পুরুষে লড়াই করিয়াছে, বা সেই বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, লড়াই জিনিসটা কি তাহা কোন দিন চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু সে কথা থাক্। আমাদের কোন পুরুষে কেহ লড়াই না করিলেও, এবং আমরা জীবনে কখনও লড়াই কি তাহা না দেখিলেও, ছেলেবেলা হইতে তীতুমীরের লড়াইয়ের কথাটা শুনিয়া আসিতেছি; এবং আর অন্ততঃ সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও যদি জন্মিতাম তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলে লড়াইটা স্বচক্ষেই দেখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। আমরা তীতুমীরের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

চব্বিশ-পরগণার মধ্যে বসিরহাট একটী সবডি-ভিসন। সেই সবডিভিসনে নারকেলবেড়ে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই নারকেলবেড়ে গ্রামে তীতুমীরের বাসস্থান ছিল। তীতুমীরের বাল্যকালের কথা বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। মক্কা মুসলমানদের প্রধান তীর্থ স্থান। তীতুমীর তীর্থ করিতে মক্কায় যায়। সেখানে ওহাবীদিগের নেতা সৈয়দ আহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়; সৈয়দ আহাম্মদের নিকট তীতুমীর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ওহাবীগণ অতিশয় তেজস্বী এবং ইহাদিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক; ইহারা একজনের জন্য আর একজন অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। সুবিধা হইলে আমরা ওহাবীদিগের কথা পরে বলিব। তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই তাহার শিষ্য হইল। ২৪-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলার তিন চারি সহস্র লোক তীতু-মীরের শিষ্য হইল। সুতরাং তীতুমীর ক্রমে এক জন বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিল। তীতুমীরের শিষ্যেরা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিত। কথিত আছে হিন্দু জমিদারেরা এই দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখার জন্য তীতুমীরের শিষ্যদিগের প্রতি জনের শ্মশ্রুর উপর পাঁচ সিকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করেন; এবং এ ছাড়া অন্য প্রকারেও ইহাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তীতুমী-রের লড়াইয়ের মূল এই। হিন্দু জমিদারদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের জন্য তীতুমীরের শিষ্যেরা স্থানে স্থানে বিদ্রোহী হইতে লাগিল। এবং এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে প্রতিদিন তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওহাবী-দিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক। চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলায় তীতু-মীরের যত শিষ্য ছিল, সকলেই তাহাদের গুরুর আজ্ঞায় একত্রিত হইল এবং পরস্পরকে রক্ষা করি-বার জন্য প্রস্তুত হইল। এই তিন জেলার প্রায় তিন চারি সহস্র মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দেশ মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদিগের দল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং লুঠ ও চাঁদা দ্বারা বিদ্রোহীগণ অপ-রিমিত অর্থ সংগ্রহ করিল। ইহারা যে কেবল হিন্দু-দিগের উপর অত্যাচার করিত তাহা নহে; যে সকল মুসলমানেরা ইহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিত তাহাদিগের উপরও ইহারা ঐরূপ অত্যাচার করিত। ক্রমে তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল; এবং অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর নারকেলবেড়ে গ্রামে তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করে, এবং বাঁশের দ্বারা একটী দৃঢ় দুর্গ ঐ গ্রামে নির্ম্মাণ করে। এই সময় ইহারা প্রচার করিতে থাকে যে, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়া আবার মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইল। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ সালের ৬ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের দুর্গ হইতে পাঁচ শত অস্ত্র-ধারী তীতুমীরের শিষ্য, নিকটস্থ একটী নগর অক্র-মণ করে। ঐ নগরের দেবালয়ের পুরোহিতকে বধ করিয়া দুইটী গরু হত্যা করিয়া, সেই গো-রক্তে হিন্দুদেব-মন্দির কলঙ্কিত করে, এবং দেব মূর্ত্তির সম্মুখে গরুর দেহ ঝুলাইয়া রাখে। এই প্রকার অনবরত অত্যাচার চলিতে লাগিল। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক হিন্দুর বাস সেই সকল স্থানে গিয়া গোহত্যা প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রকার অত্যাচার করিত; হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিলে, তাহাদিগকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিত; এবং সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া গ্রামখানি দগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন। প্রথমে জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ

তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে. কোন ফলই হইল না, ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৪ই নবেম্বর একদল সৈন্য বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়। এই সৈন্য দলের অধিপতি ভাবিয়াছিলেন, সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া এবং বন্দূকের আওয়াজে ভীত হইয়াই, বিদ্রোহীগণ পলায়ন করিবে বা আত্ম-সমর্পণ করিবে। এই জন্য এবং বৃথা কতকগুলি লোকের জীবন বধ করিবেন না মনে করিয়া, সৈন্যদিগকে কেবলমাত্র বারুদ পুরিয়া বন্দুকে আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন। বন্দুকে গুলি ছিল না—সুতরাং ফাকা আওয়াজে তাহাদের কোন ক্ষতিই হইল না। ইংরাজ সৈন্য বন্দুক আওয়াজ করিলে, বিদ্রোহীগণের কাহারও কিছু হইল না দেখিয়া বিদ্রোহীগণ আরও উল্লসিত হইয়া উঠিল। তীতুমীর তখন সদর্পে বলিয়া উঠিল “গুলি খা ডালা” অর্থাৎ গুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। শিষ্যবর্গ তীতুমীরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ১৭ই নবেম্বর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইহাদিগের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অনেকেই বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল, কতক পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

গবর্ণমেণ্ট এখন বুঝিলেন, সহজে বিদ্রোহীদিগের দমন হইবে না। তখন একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য, কতকগুলি গোলন্দাজ ও এক দল ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইল। তীতুমীর এবং তাহার অনুচরবর্গ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ময়দানে যুদ্ধ সজ্জায় দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজ সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুইবার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, তাহাদিগের আশা এবারও তাহারা জয়ী হইবে। পূর্ব্বদিন যুদ্ধে যে সকল ইংরাজের প্রাণবধ করিয়াছিল আজ তাহাদিগের মৃতদেহ আপনাদের সম্মুখে জয় পতাকার ন্যায় রাখিয়া দিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল; চিরদিন কাহারও সমান যায় না, ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তীতুমীরকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজকে আশ্রয় করিলেন। বিদ্রোহীগণ হতবল হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। ইংরাজ সৈন্য সবলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া, দুর্গ অধিকার করিল। এই যুদ্ধেই তীতুমীরের মৃত্যু হইল। এবং যুদ্ধের অবসানে সেই অসংখ্য বিদ্রোহীদিগের তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র জীবিত ছিল। ইহাদিগের এক শত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হয় এবং তীতুমীরের সেনাপতির প্রাণ দণ্ড হয়।

একটা গল্প।

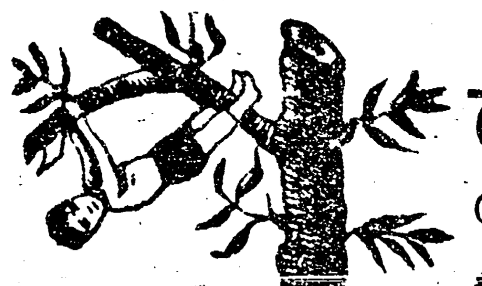
রেশ গল্প শুনিবার জন্য রোজ তার দাদা মশাইকে বড় বিরক্ত করিত। বুড় দাদা মশাই বড় ভাল মানুষ ছিলেন তাই পরেশকে রোজ গল্প শুনাতেন। সে দিন পরেশের বাড়ী নবীন আর সুরেণ গিয়া হাজির হইয়াছিল আর দাদামশাই এই গল্পটী তাদের কাছে বলিলেন। এই বেলা তোমাদের ব’লে রাখি যে, নবীন আর সুরেণ বড়ই দুষ্ট ছেলে। লেখা পড়া ত কিছুই করে না, আর কেবল দুজনায় মারামারি করে। তাই দাদা মশাই জানিতে পেরে এই গল্পটী বল্লেন।

“নবীন পরেশ আর সুরেণ তোমরা শোন, হ’রে আর যেদো দুই বন্ধু ছিল। তারা এক স্কুলে পড়িত, আর এক পাড়ায় থাকিত। বন্ধুত্বটা কিন্তু বড়ই আঁটাআঁটি ছিল, শুনছ সুরেণ আর নবীন। বন্ধুতার এতই জোর টান যে, সুরেণ যদি রাস্তার ডান ধার দিয়া যায় আর নবীন বাঁ দিক দিয়া যায়,

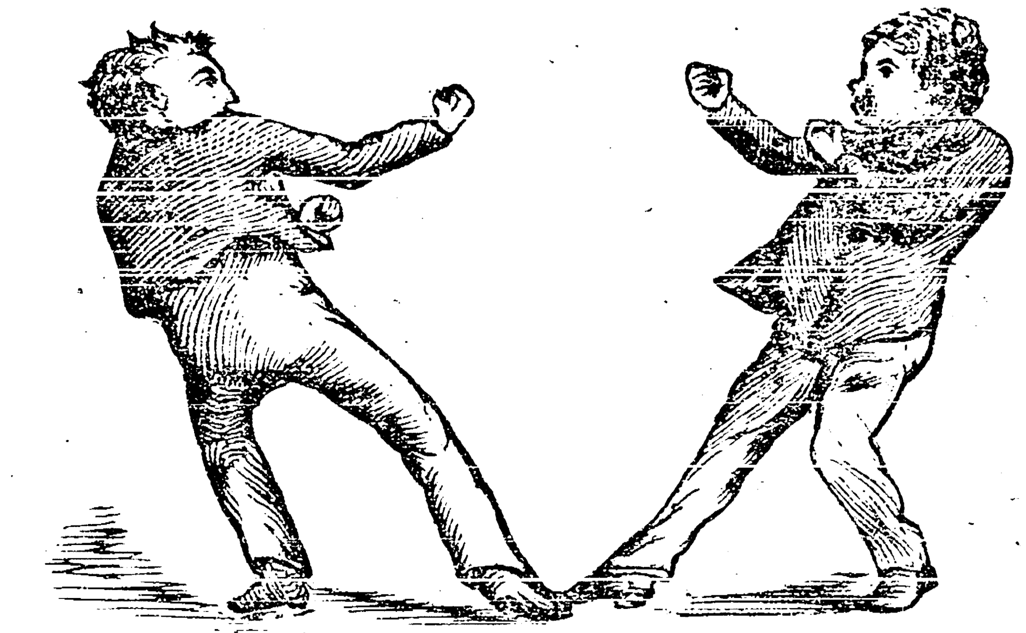

দুজনে দেখা হয়েছে কি সেই টানের চোটে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়েছে। (চিত্র দেখ) রাস্তার মাঝখানে এসে তাদের বন্ধুত্বটা এইরূপে দেখাত।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বন্ধুতা দেখিয়ে স্কুলে যাইত। পণ্ডিত মশাই সব টের পাইলেন। তিনি পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের অনেক খাওয়াইতেন। খাবার জিনিষের আর কত নাম বলব—চড়, কিল, চাবুক ইত্যাদি। কিছুতেই তাদের কিছু হয় না। এক দিন এইরূপে তাদের বন্ধুতার শেষ হয়। সের আলি জমাদার রাস্তায় পাহারা দিতে আসিয়াছিল সে কি জানি কি

করে তাদের কি কল্লে। (২য় চিত্র দেখ) সে দিন থেকে তারা দেখা হলে আর রাস্তার মাঝে আসিত না। সুরেন আর নবীন লজ্জিত হইয়া তখনি বাড়ি চলিয়া গেল। পরেশ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কুকুরের বুদ্ধি।

কুকুর বিড়ালের গায়ে সময়ে সময়ে ছোট ছোট কীট জন্মে তা তোমরা দেখে থাকবে। একটী কুকুরের ঐরূপ হইয়াছিল। বেচারির বড়ই কষ্ট, সে না পারে ঘুমাতে না পারে দণ্ড স্থির হয়ে বস্‌তে। অবশেষে সে এক কৌশল ক'রে ঐ কীটের যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পায়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের স্বভাব এই যে, তাহারা জলে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, কুকুর ভায়া এই স্বভাবের সুবিধা লইয়া একদিন জগন্নাথ ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে জলে ল্যাজ ডুবাইয়া বসিল, ক্রমে যত জোয়ার বেশী হয় তার শরীরও তত জলে ডুবে। শরীরের যে অংশ জলে ডুবে কীটেরা সে অংশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শুষ্ক অংশে আশ্রয় লয়, এইরূপ চলিতে লাগিল। অবশেষে কুকুরের সমস্ত শরীর জলে ডুবিয়া গেল কেবল নাকের অগ্রভাগ জাগিয়া রহিল। বুদ্ধিমান কুকুর মুখে করিয়া খানিকটা তুলা লইয়া গিয়াছিল, কীটেরা কুকুরের শরীরে আর আশ্রয় না পাইয়া ঐ তুলাতে আশ্রয় লইল। কুকুর যেই দেখিল আর একটী কীটও তার শরীরে নাই অমনি ফুঁদিয়ে তুলা দূরে ভাসাইয়া দিয়া "বাঁচিলেম" বলে উঠে দৌড় মারিল।

ধাঁধা।

এপ্রেল মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। লতা।

নূতন।

১। চিরদিন হিন্দুগণ ঘৃণা করে মোরে ;
কিন্তু যবে রাখি আমি লাঙ্গুল বাহিরে,
তখন সাদরে তারা করিয়ে গ্রহণ
চূর্ণ করি দেহ মোর করয়ে ভক্ষণ।
মাথা খেয়ে, অকৃতজ্ঞ জীব জন্তুগণ
আমাতেই বাস করে আনন্দিত মন।

২। অতিশয় নম্র আমি মৃত্তিকা সমান
সুমিষ্ট কতই দ্রব্য নরে করি দান।
কিন্তু এক অপরূপ আছে মম রীত
মাথা না কাটিলে কভু আসে না সংগীত,
মস্তক পদেতে যবে হয় সম্মিলন
জল মধ্যে বাস করি মূরতি ভীষণ।
নদীতে সমুদ্রে আমি সর্ব্বত্র সমান।
দাঁড়ি মাঝি মোর ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণ।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। একাদশ সংখ্যা

নবেম্বর, ১৮৮৮।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

সখার পাঠক পাঠিকা, তোমরা অনেকগুলি বড় লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াছ। আজ তোমাদের কাছে এক মহাত্মার জীবন-চরিত বর্ণনা করিব, যাঁহার নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শুন নাই কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রকৃত বড় লোক। অনেক প্রকারের বড় লোক আছেন, কেহ রাজ-নীতিজ্ঞ, কেহ যোদ্ধা, কেহ দেশ হিতৈষী কেহ বা ধর্ম্ম-প্রচারক। তোমরা মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জীবন-চরিত পড়িয়াছ, ইহাঁরা ধর্ম্মের জন্য বড়। যে মহাপুরুষের কথা বলিব ইনিও এই শ্রেণীর বড় লোক। তোমরা হয়ত পুস্তকে বা লোকের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার অলৌকিক ভাব, ও ঈশ্বর ভক্তির কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, মন অপূর্ব্ব ভাবরসে অভিষিক্ত হয়, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বাহির হয়, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইহাঁর ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্ম্মকথা সকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তি সকল ঈশ্বর সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।

১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি জেলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগে শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে এই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, তিনি পরম তাপস ও সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বালক রামকৃষ্ণ অতিশয় চঞ্চলমতি ছিলেন। বাল্যকালে বোধ হয় পাঠশালায়

লেখা পড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু একটু বয়স হইলেই আর পাঠশালায় বা টোলে পড়িতে যান নাই। তিনি বলিতেন, "আমি দেখিতাম যত ভট্টাচার্য্য টোলের ছাত্র পূজা করিয়া চাউল কলা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, মনে করিতাম টোলে পড়িয়া ত এই হইবে, আমার এমন পড়ায় কাজ নাই।" ছেলেবেলায় তিনি আপনি কৃষ্ণ সাজিয়া বালকদিগকে শ্রীদাম, সুবল, সাজাইয়া খেলা করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে অল্পে অল্পে ধর্ম্মভাব স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিলে তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া কোপিন করিয়া পরিধান করিতেন। তিনি বালক অবস্থায় এমন চিত্র করিতে ও ঠাকুর গড়িতে পারিতেন যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। এমন কি চিত্রকর বা কুম্ভকারগণ কোন পট বা ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া তাহা ঠিক হইল কি না তাঁহার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইত। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল। যাহা একবার শ্রবণ করিতেন বা যাহা একবার কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিত তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না। তিনি উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ কিছুই নিজে পাঠ করেন নাই কিন্তু শ্রবণ করিয়া ঐ সমস্ত পুস্তকের বিষয় সকল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কূট প্রশ্ন সকল তিনি বলিবা মাত্র বুঝিতে পারিতেন। ১২।১৩ বৎসর বয়ক্রম কালে কলিকাতার অন্তঃপাতী ঝামাপুকুর নামক স্থানে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠিতে আসিয়া তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিছুদিন পরে জানবাজারের খ্যাতনামা রাণী রাসমণি কলিকাতার দুই ক্রোশ উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বিস্তর অর্থব্যয়ে গঙ্গার ধারে একটী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই কালী পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হন। কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণও তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীতে বাস করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বাহিরে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় নাই।

দুই বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যু হইলে তিনি কালীর নিত্য পূজা করিতে নিযুক্ত হন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৬ বৎসর তখন হুগলি জেলাস্থ জয়রামবাটী গ্রাম নিবাসী রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর তিনি স্বদেশ হইতে আবার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে আগমন করিয়া নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি চিরদিন গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে জানে? যাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে না তাহাকে তিনি তাহা করান। পরমহংস বলিয়াছিলেন—"আমার প্রথমে খুব ইচ্ছা ছিল গৃহধর্ম্ম পালন করি, কিন্তু জানিনা কোথা হইতে এক ঝড় আসিয়া আমার মন ওলট্ পালট্ করিয়া দিল।"

তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; স্ত্রীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। যখন তাঁহার স্ত্রী বালিকা তখনই তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য এবং ভগবানে গাঢ় অনুরাগ স্থাপিত হয়। তিনি বলিতেন কামিনী, কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র ও অর্থলালসা হইতে মনকে মুক্ত না করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না। সেই জন্য তিনি আপন স্ত্রীকে কখনও পত্নীভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "টাকায় ভাত কাপড়, ভাল বাড়ী, গাড়ী

[illegible] আত্মার কিছুই হয় না।" মাটী ও টাকা [illegible] নিকট সমান ছিল। তিনি এক দিন এক হস্তে মাটী ও অপর হস্তে টাকা লইয়া মনে মনে বিচার করিলেন মাটী এবং টাকা একই পদার্থ, যেমন মাটী সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না, টাকাও তেমন সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না অতএব "মাটী টাকা, টাকা মাটী" এইরূপে মাটী ও টাকা গঙ্গা সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি কখন টাকা পয়সা হস্তে করিতে পারিতেন না, কেহ দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে টাকা ছুঁয়াইলে অঙ্গুলিগুলি আড়ষ্ট হইয়া যাইত। কি অদ্ভুত ত্যাগ!

রামকৃষ্ণের এইরূপ আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রীতি দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তি হয়। মথুর বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন কালী বাড়ীর ভৃত্যেরা গিয়া তাঁহাকে বলিল যে, ভট্টাচার্য্য (তখন পরমহংসকে সকলে ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকিত) কালীর মস্তকে ফুল চন্দন না দিয়া আপন মস্তকে দিয়া কালীর বেদীর উপর বসিয়াছেন। মথুরানাথ বাবু বলিলেন তিনি সামান্য লোক নহেন, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিবে না তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন। মথুর বাবুই তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কালী পূজা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য তৎকার্য্যে নিযুক্ত হন। মথুর বাবু কালীবাটীস্থ একটী অট্টালিকার উপরে তাঁহাকে বাস করিতে দেন এবং তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত তখনই তাহা প্রদান করিতেন। মথুর বাবু কখন বা তাঁহাকে জানবাজারস্থ বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং তিনি অন্দরমহলে পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে লজ্জা করিত না। মথুর বাবু তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি রামকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সংযম হইয়াছে কি না তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অধিকাংশ সময় বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া অবস্থান করিতেন, এবং কালীবাটীর উদ্যানে গঙ্গাতীরে তিনি স্বহস্তে পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর সাধনা করিতেন। তাঁহাকে অনেকেই বাতুল মনে করিত, কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য তাঁহার সেবা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সে সময়ে তিনি তাঁহার শরীরের তত্ত্বাবধারণ না করিলে সে কঠোর তপস্যায় দেহ রক্ষা হইত কি না সন্দেহ। তপস্যা করিয়া তাঁহার সুন্দর কান্তি মলিন এবং দেহ অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল। এই প্রকার কঠোর সাধনায় প্রায় ১০।১১ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। সাধনার সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, বলিলেও তোমরা বুঝিবে না। তাঁহার জীবনের চুম্বক কথাগুলি মাত্র বলিয়া যাইব।

যত দিন তাঁহার ইষ্ট লাভ হয় নাই তত দিন তিনি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে দিন যাপন করিতেন। যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি "দিন ত গেল, আমার ত কিছুই হইল না" এই বলিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেন। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তিনি এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যখন যাহা মনে হইত যে ইহা করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে তিনি অনন্যমনা হইয়া তাহাই করিতেন।

তোতাপুরী নামক একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনি বেদান্ত শ্রবণ এবং তৎসম্বন্ধীয় সাধনাদি শিক্ষা করেন। ইনি ক্রমিক এগার মাস রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দান করেন। যখন গুরু

দেখিলেন যে তিনি শিষ্যকে আর অধিক শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না বরং শিষ্য তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন তখন তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যান। শুনা যায় রামকৃষ্ণকে তোতাপুরীই "পরমহংস" উপাধি প্রদান করেন। পরমহংসদিগের যে ভেক থাকে তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না।

এক সন্ন্যাসিণী আসিয়া তাঁহাকে সমগ্র তন্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দান ও সাধনা করান। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি প্রথমে রামকৃষ্ণের ভাব বাতুলতা নয় বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন এবং বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইতে তাঁহার ভাবের সহিত চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাভাবের ঐক্য আছে সকলের নিকট প্রদর্শন করেন।

পরমহংস সিন্দুরিয়াপটী নিবাসী দাতা শ্রেষ্ঠ ৺ শম্ভূচরণ মল্লিকের নিকট বাইবেল গ্রন্থ শ্রবণ করেন। শম্ভু বাবু রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং বরাহনগরস্থ বাগানে আসিলে তাঁহাকে কালীবাটীর উদ্যান হইতে আনিয়া তাঁহার নিকট শ্যামা বিষয় শ্রবণ করিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা চর্চ্চা করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার বেশ তালবোধ ছিল—এমনি সুমধুর রামপ্রসাদী ও অন্যান্য শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত করিতে পারিতেন যে, শ্রোতামাত্রেরই অন্তরে তাহা বিদ্ধ হইত। সে মোহন গীত যে একবার শুনিত সে আর তাহা ভুলিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় ছিল। আহার, নিদ্রা, কথা, হৃদয় সমস্ত বালকের ন্যায়—এমন সরলহৃদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না; যাহা মনে করিতেন তাহা অকপটে বলিতেন। বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবাদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন যাহারা বিষয় ভোগ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ধর্ম্ম কথা কহে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মৌখিক, ভিতরে বিষয় চিন্তায় পোরা; যেমন পায়রাগুলা মুখে বক্ বকম্ করে বটে কিন্তু গলার ভিতর মটর গিজ্‌গিজ্ করিতেছে। কোন সুলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ যাহারা সত্যবাদী ও ঈশ্বরভক্ত এমন কোন বালক দেখিলে তিনি কত আদর করিতেন; তাহাদিগকে কত আহারীয় প্রদান করিতেন। যাহাতে তাহারা চিরকাল সচ্চরিত্র থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। এই কারণে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই যুবাপুরুষ ও বালক। ফলতঃ তিনি সরলমতি বালকদিগের সহিত থাকিতে ও কথা কহিতে ভাল বাসিতেন। সেই জন্য তিনি আমাদের সখার পাঠকদিগেরও পরম বন্ধু ছিলেন।

তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী বা পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না। সকলকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন। এজন্য তিনি কোন কোন ধনী ব্যক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা অসাধারণ ছিল, অর্থকে তিনি অনর্থের কারণ স্বরূপ জানিতেন। একদা উত্তর পশ্চিম দেশস্থ তাঁহার পরিচিত কোন ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া কিছু কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বলিলেন, আপনার এরূপ অবস্থা,—আমি আপনার নামে কোম্পানীতে দশ সহস্র টাকা রাখিয়া দি, তাহার সুদে আপনার খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওরূপ কথা আর আমার সম্মুখে বলিবে না।" ধনী বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করিলেন। তিনি লোকের নিকট কখন একটী পয়সা গ্রহণ করেন নাই। যিনি সাংসারিক সুখকে অস্থায়ী এবং

ঈশ্বর দর্শনকে নিত্য অর্থাৎ স্থায়ী সুখ জ্ঞান করিতেন তাঁহার কি সামান্য অর্থে লোভ জন্মিতে পারে?

পরমহংস রামকৃষ্ণ কোন সদ্গুণশালী লোকের নাম শুনিলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা না থাকিলে মানুষ গুণশালী হয় না।

মথুর বাবুর সহিত তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান, তথায় অন্য সকলের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়া বলেন, ঐ পাতলা সুন্দর যুবাটীর ফাত্‌না নড়িতেছে আর সকলে যেন ঢাল তরবার ধরিয়া ধ্যান করিতেছে। মথুর বাবু বলিলেন ঐ যুবাটীর নাম কেশবচন্দ্র সেন, এই তাঁহার কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথম দর্শন।

ইংরাজী ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে যখন পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন বেলঘরিয়া নামক গ্রামে বাবু জয় গোপাল সেনের উদ্যানে প্রচারকবর্গসহ সাধন ভজনায় অনুরক্ত ছিলেন, তখন এক দিন পরমহংস এক খানি ছেকড়া গাড়ী করিয়া কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সঙ্গে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহচরগণ সহ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রথমে হৃদয় ভট্টাচার্য্য আসিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন আমার মামা হরিনাম শুনিতে বড় ভাল বাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হয়। আপনার নিকট তিনি কিছু ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। তাঁহার বাহিরের কোন আড়ম্বর সাজ সজ্জা না থাকায় প্রচারকগণ তাঁহাকে প্রথমে সামান্য জ্ঞান করেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হরিনাম করিতে তাঁহার সমাধি হইল—সকলে মনে করিল ইহা একরূপ ভেল্কি। কিছু পরে তিনি প্রমত্তভাবে হাসিতে লাগিলেন এবং এরূপ গভীর ধর্ম্মকথা কহিতে লাগিলেন যে তখন সকলেই তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ করিলেন। পরমহংসকে দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেবশচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, কখন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনিও কেশবচন্দ্রের গৃহে আসিয়া অনেক ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে দেখিতে চান। কতিপয় সাধক ও কতকগুলি লোক ভিন্ন পরমহংসকে সাধারণ লোকে বড় চিনিত না। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কথা ও উপদেশ সকল মিরার, ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়া সাধারণকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত করান। "পরমহংসের উক্তি" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক কেশব বাবু আপনি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি জনসাধারণের পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কখন বিদ্যাভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় মহা পণ্ডিত ও জ্ঞানী, এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণও, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহারা সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি

সকলের দাসানুদাস।” স্ত্রীলোক মাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মার ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। কত ঘৃণিত পাপীকে তিনি স্নেহভরে আলিঙ্গন দানে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে গুরু বোধে ভক্তি করিলেও তিনি কাহাকেও শিষ্য জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তিনি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। কাহারও একটী সামান্য দোষ দেখিলে তাহা শুধরাইয়া দিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ভাব দর্শনে পুন্যের সঞ্চার হইত। পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইত। তাঁহার এমনই প্রভাব ছিল যে, তাঁহার কাছে যাইলে লোকের কঠোর মন নরম হইত, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে বা অন্য প্রচারকদিগের সহস্র উপদেশে যে ফল না পাওয়া যায় তাঁহার কাছে একবার বসিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যাইত।

কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ যিনি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন নাই; যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহাকে তিনি তদনুরূপ সাধনা করিতে বলিতেন এবং তাহাদের পরিত্রাণ হইবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।

১৮০৮ শকে অর্থাৎ গত ১২৯৩ সালে ৩১ শে শ্রাবণ রবিবার তিনি ক্ষতকণ্ঠনালী রোগে বৎসরের অধিক কাল ভুগিয়া ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা শ্যামপুকুরে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করেন। তৎপর ডাক্তারদিগের মতে কাশীপুরে একটী প্রকাণ্ড উদ্যান বাটী ভাড়া করিয়া তথায় তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী সকল রকম চিকিৎসাই হইয়াছিল, কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। তাঁহার পুত্র সম প্রায় ১৫।১৬ জন শিষ্য অবিরত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং অনেকে পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য অকাতরে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কপর্দ্দকহীন ও গৃহত্যাগী তাঁহার পীড়ার সময় রাজার ন্যায় সেবা ও চিকিৎসা হইল ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইতে পারে না পরমহংস চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।

সত্য-প্রিয়তা।

ইংলণ্ড দেশের কোন বড় দোকানে এক বিবি ছিটের কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। দোকানের ভিতরে গিয়া কোনও বিশেষ ছিটের খোঁজ করিলে দোকানের আর এক ধারে তাঁহাকে

যাইতে বলা হইল। সেইখানে একটী বালক কর্ম্মচারী সেই বিবি কি চান তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসর, মুখখানি সরলতা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, মুখশ্রী দেখিলেই তক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিশ্বাসের সঞ্চার হয়।

বালক তাড়াতাড়ি নানাবিধ কাপড় দেখাইতে লাগিল। তার মধ্যে এক রকম কাপড় খরিদদারের পছন্দ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন “রঙ্গটা কি পাকা? বালক বেশ করিয়া ছিট দেখিয়া পরে উত্তর দিল, না, রঙ্গ পাকা বলিয়া বোধ হয় না। আজ দুদিন হইল এক বিবি ছিটের নিন্দা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, তার কাপড়ের রঙ্গ ফিকে হইয়া গিয়াছে।

বালককে ধন্যবাদ দিয়া বিবি বলিলেন “তবে যদি আমার পছন্দমত ছিট না থাকে তাহা হইলে আমাকে আর এক দোকানে যাইতে হইবে।”

বিবি ও বালক পরস্পরে যেখানে থাকিয়া কথা কহিতেছিল দোকানের মনিব তার কাছেই ছিলেন সুতরাং উভয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিবি দোকান হইতে বাহির হইলেই তিনি বালকের দিকে এগিয়ে এসে কর্কশস্বরে বলিলেন “কাপড় ধু’লে রঙ্গ উঠে যাবে একথা বলবার তোমার কি দরকার ছিল?’

বালক আশ্চর্য্যের সহিত চেয়ে দেখে বলিল “বিবি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি তাই বলিয়াছিলাম।”

আ! বোকা! কেন বলিলে না যে রঙ্গ ধুলেও উঠে না।

বালক সহজেই বলিয়া ফেলিল “তাহা হইলে যে মিথ্যা বলা হইত।”

তবে “আমি জানি না” একথাত বলিতে পারিতে।

মহাশয়. তাই বা কেমন করিয়া বলিব, আমি যে জানিতাম।

প্রভু বিদ্রূপস্বরে বলিলেন ও, বুঝেছি, তুমি ধর্ম্মভীরু, সত্য-প্রিয়। যখন এমন, তখন আর এখানে কাজ করা চলে না। তুমি এপ্রকারে আমার খরিদদার তাড়াইবে তা হ’বে না। সপ্তাহ শেষ হইলে তুমি এখান হইতে বিদায় হও।

বালকের হৃদয় একবারে দমিয়া গেল। চাকরি যাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়। তাহার মা দুঃখিনী বিধবা। কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাহাকে ভাত কাপড়ের যোগাড় করিতে হইত এবং পুত্রে প্রতি সপ্তাহে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া দিত তাহা যৎসামান্য হইলেও তাহাদের পক্ষে তাহা সামান্য নয়। তা ছাড়া বালকের সবে এক মাস হইল চাকরি হইয়াছে। তাহাও আবার তাহার খুড়া মহাশয়ের সুপারিশে জুটিয়াছিল। খুড়োর বেশ দশ টাকা সঙ্গতি ছিল, মনে করিলেই ভাইয়ের ছেলেকে অকাতরে সাহায্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি আপনার নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধু অপেক্ষা অর্থকে অধিক আদর করিতেন এবং মনে করিতেন ভ্রাতুষ্পুত্রের চাকরি জুটাইয়া দিয়া তার বিস্তর উপকার করিয়াছেন ও তাহাকে চিরদিনের মত বাধিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বালকের মনে যখন এইরূপ ভাবনা ও ক্লেশ হইতেছিল তখন কিন্তু কর্ম্মটা ভাল করা হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাহার একবারও সন্দেহ হয় নাই। বাস্তবিক তাহার এমনই সৎস্বভাব ছিল যে মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বাড়ীতে গিয়া আহারের পর মাকে কাজে জবাব দিবার কথা জানাইল।

মা কেবল এই কথা বলিলেন, বাছা! আমার বিশ্বাস তুমি এমন কোন দুষ্কর্ম্ম কর নাই যাতে তোমাকে জবাব দিতে পারে। সবিশেষ শুনিয়া মা দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদের সহিত বলিলেন, বাছা, তুমি ঠিক কাজ করিয়াছ। সত্য বিক্রয় করিয়া চাকরি রাখায় প্রয়োজন নাই।

মা, আপনার মুখে "আমি অন্যায় করি নাই" এই কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু মা, আমি এখন কি করিব, আমার ত এখনি একটী চাকরি চাই, বালক উৎকণ্ঠিত হইয়া মাকে এই কথা বলিল।

মা বলিলেন, আমার বিবেচনায় তোমার খুড়ো মহাশয়ের কাছে যাওয়াই শ্রেয়ঃ হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার আর একটী চাকরী যোগাড় করিয়া দিবেন।

বিশ মিনিট পরে নগরের খোষপোষাকী লোকেরা যে রাস্তায় বাস করেন সেই পথের একটী সুশোভন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালক ঘণ্টা ধ্বনি করিল। এক চাকর আসিয়া বালককে সঙ্গে করিয়া তাহার খুড়ার নিকট উপস্থিত করিল।

তাহার খুড়ার আকার প্রকার ভারি গর্ব্বিত লোকের মত ছিল। দেখিলে বুঝা যাইত যে তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া মনে করেন, কাজে কাজে আর সকলকে হীন চক্ষে দেখেন! মুরব্বিয়ানা চালে বালককে বলিলেন, কেমন হে চাকরি বাকৃরি কেমন চল্‌চে। "বালক খুড়োকে ভয় করিত সুতরাং থতমত খাইয়া উত্তর করিল "বড় ভাল নয়, খুড়া মহাশয়!"

খুড়ার চক্ষে চসমা ছিল। চসমার মধ্য দিয়া বালকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া বালকের কথা পুনরায় উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, বড় ভাল নয়, "কেন, কি হয়েছে?" "যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় দোকানের কর্ত্তা আমাকে সেই কাজ করাইতে চান।" "আমি তোমার কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া বালক সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল।

কথা শেষ হইলে বালক খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহাতে অনুগ্রহের চিহ্নমাত্রও নাই। বিরক্তিস্বরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার কি মত তুমি কি জানিতে চাও? বালক ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল আপনি যদি বলেন। তবে শুন তুমি নিতান্ত বোকাম করিয়াছ, ক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া তাড়ান তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার বিবেচনায় তোমার মনিব ঠিক কাজই করিয়াছেন। আমি যদি তোমার প্রভু হইতাম তাহা হইলেও আমি ঠিক ঐরূপ করিতাম।

বালক কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল "বিবিকে ঠকান কি ন্যায়মত কাজ হত?" তাহার খুড়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ন্যায়সঙ্গত কাজ হইত কি না সে বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য তোমার সহিত বিচার করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। যাহা হউক এই ত ঘটিল যে তোমার উপস্থিত কর্ম্মটী গেল। আর একটী কর্ম্মের জন্য কি চেষ্টা করিতেছ?

বালক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "খুড়া মহাশয়, আমি মনে করিয়াছিলাম যে আপনি মার অনুরোধে অন্ততঃ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।" তাহার খুড়া খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়িতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, তোমাকে সাহায্য করার কোন দরকার নাই, খুব ভাল

চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেও ত তুমি এক মাসের মধ্যে কাজ ছাড়িয়া দিবে। যে কাজ রাখিতে চায় না, তার জন্য ক্রমাগত কর্ম্ম খুজে বেড়াতে আমার মাথা ব্যথা পড়ে নাই।

খুড়া বালকের প্রতি এইরূপ বিমুখ হওয়াতে বালক অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তবে এখন আমি কি করিব?" তুমি কি করিবে এ কথাটা কাজ ছেড়ে দিবার আগে ভাবিলেই ভাল ছিল।

"খুড়া মহাশয়, আমি আশা করি, আমার মার দিকে চাহিয়া আপনি আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিবেন। মাকে খুব বেশী খাটিতে হয়, আবার তার উপর আমাকে তাঁর গলগ্রহ হইতে হইবে।" তা আমি কি করিব; তাঁহার যে খুব কষ্ট হইবে তাহা বেশ বুঝি। কিন্তু সে সমস্তই তোমার দোষ।

বালক দুঃখীর সন্তান ছিল বটে কিন্তু একেবারে মনুষ্যত্ব খোয়ায় নাই। খুড়ার সহিত বাক বিতণ্ডা না করিয়া, তাঁহার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, আমি যাহা ন্যায়ানুগত কার্য্য বিবেচনা করি, তাহা করাতে আমার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার করা আপনার যদি ভাল বলিয়া বোধ হইল, তাহা হইলে অবশ্য আমাকে কষ্ট সহিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অনাহারে রাখিবেন আমার এরূপ মনে হয় না। বালকের মুখে এপ্রকার সাহস ও তেজের কথা শুনিয়া খুড়ার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বাড়ী হইতে দূর হ, আর যেন আমাকে তোর মুখ দে'খতে না হয়।" বালকও আর একটীও কথা না বলিয়া খুড়ার বাড়ী হইতে বাহির হইল। যে দুঃখের বোঝা লইয়া বালক খুড়ার বাড়ীতে আসিয়াছিল তার চেয়ে অধিক দুঃখভার লইয়া খুড়ার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল। আপনার সামান্য কুটীরে প্রবেশ করিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা, কি করিলে?

মা, কিছুই হইল না। আমার সকল আশা ফুরাইয়াছে।

বাছা, নিরাশ হইও না। যখন পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন, পরমেশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

মা, তোমার একথা আমি মনে রাখিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু ইহা বড় কঠিন! যখন খুড়া মহাশয় আমার জন্য কিছুই করিলেন না, তখন আমাকে নিজে চেষ্টা করিতেই হইবে।

খুড়ার সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সবিশেষ মাকে জানাইল। তিনি বলিলেন "তিনি যে অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন একদিন না একদিন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন। বাছা, তুমি নিরাশ হইও না। আমার খুব বিশ্বাস, যদি আমাদের ধৈর্য্য থাকে তাহা হইলে এই দুঃখ পরে সুখে পরিণত হইবে।"

ক্রমে শনিবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকও দোকানে যাইয়া মাহিয়ানা লইয়া বিদায় হইল। সোমবার হইতে কাজ খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

ঈশ্বর কৃপায় সেখানকার কোনও হোটেলে খবরের কাগজ দেখিবার সুবিধা যুটিয়াছিল। বালক সেইখানে দৈনিক কাগজে কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল এবং নানাস্থানে আবেদন করিল। কিন্তু সকলই নিস্ফল হইল। দেখিতে দেখিতে শুক্রবার আসিয়া পড়িল। চারি দিন ধরিয়া বালক কাজ খুঁজিতেছে কিন্তু কিছুই হইতেছে না, ক্রমে বালক নিরাশ হইতে লাগিল।

এক দিন কাজের চেষ্টায় গিয়া বিফল হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় কাপড়ের দোকানে যে বিবির কাপড় কেনার বিষয়ে বালক

সাহায্য করিয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সৌভাগ্যক্রমে উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারিয়াছিল। বিবি দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, তোমাকেই না আমি সে দিন কাপড়ের দোকানে দেখিয়াছিলাম?

হাঁ, মা!

তুমি কি সে কাজ ভাল বাস।

আমি কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।

বিবি একটু আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন কাজ ছাড়িয়া দিয়াছ? কেন ছাড়লে? "আমি আপনাকে সেই যে বলিয়াছিলাম যে রঙ্গ ধুলে উঠে যাবে, সেই জন্য মনিব কাজে জবাব দিয়াছেন।" বিবি ঘৃণা ও রাগের ভরে বলিলেন, "বাস্তবিক এই রকম ক'রে যদি তাহারা কারবার চালায়, আমি আর কখন ওদের কাছে কিছুই কিনিব না। তবে তোমার চাকরি নাই?" হাঁ,মা, আমি কদিন চাকরির চেষ্টায় ফিরিতেছি কিন্তু চাকরি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। বিবি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, আমার স্বামী একজন সওদাগর, আমি বলিলে তিনি তোমাকে একটী চাকরী অবশ্য দিবেন। আর যদি এমন হয় যে আপাততঃ কোন কর্ম্মখালি না থাকে তাহা হইলেও তোমার একটী উপায় করিয়া দিবেন।"

বালক আহ্লাদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইতেছে, বিবি তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য বেশী কিছু করি নাই, আমার জন্য তোমার চাকরি গিয়াছে, তোমাকে একটা কাজ জুটাইয়া দেওয়া আমারই কর্ত্তব্য; তুমি সেখানে কত মাহিনা পাইতে? "মা, আমি সপ্তাহে তিন টাকা পাইতাম।"

বালক বিবির সহিত তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিল। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার স্বামী একটী বিশেষ কাজের জন্য কর্ম্ম স্থান হইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। বালকের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার স্বামী বালককে এক জন হিসাব বিভাগের অতিরিক্ত কেরাণী রূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং বর্ষ শেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। স্নেহবচনে আরও ববিলেন আগেকার কর্ম্মস্থানে যেরূপ সততা ও বিশ্বাস দেখাইয়াছ সেইরূপ যদি এখানেও দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আহ্লাদে বালকের সরল ও সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়াই মাকে এই সুখের কথা বলিল। এই সময় হইতেই তাহাদের সময় ফিরিল। ক্রমাগত উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিয়া সেই দুঃখী বালক এই নূতন কর্ম্মস্থানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়া আজিও কাজ করিতেছেন। সুখ সৌভাগ্যের সীমা নাই। আর সেই হতভাগ্য কাপড়ের দোকানদার দেউলিয়া হইয়া যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে, নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় বাস করিতেছে। তাহার অন্যায়োপার্জিত ধন তাহাকে সৌভাগ্যশালী করিতে পারে নাই!

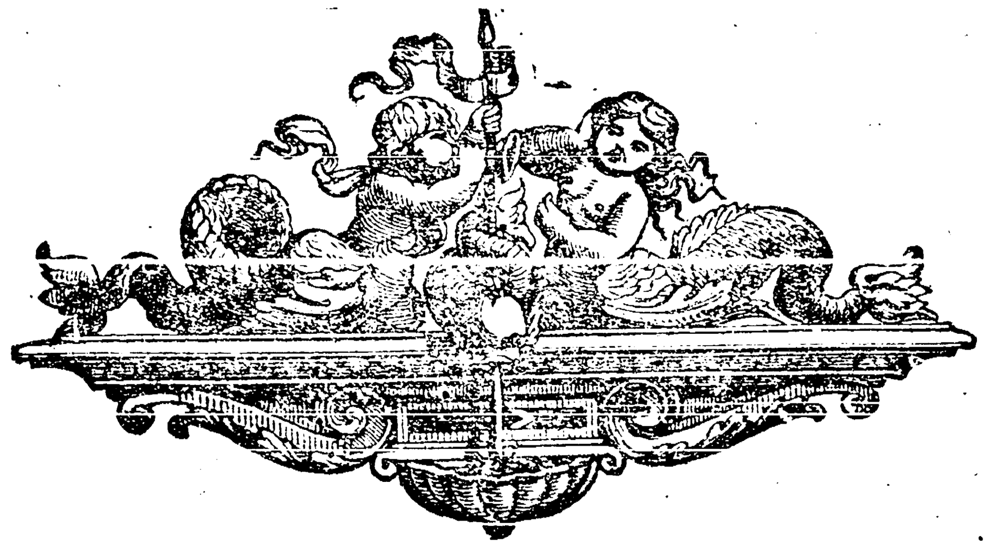

গায়ক পাখি।

থ্রস।

পাখিরা গান গায়। সব পাখি আবার গান গায় না। কাক গান গায় না। কোকিল গায়। কাকও ডাকে, কোকিলও ডাকে, তবে কাকের সুধুই ডাক, কোকিলের ডাক ডাক নয়, গান। যে পাখির স্বর শুনিতে ভাল লাগে তাহারাই গান করে। আমাদের দেশে অনেক পাখি আছে যেমন শ্যামা, বুলবুল, টোকগেল, বউকথাকও প্রভৃতি, যাদের স্বর বেশ মিষ্টি অথচ এদের এত নাম নাই। আমাদের দেশে কোকিলের বড় নাম। এমন কবি নাই যিনি কোকিল সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখেছেন। সেই সে কালের সংস্কৃত কবি হইতে এই আমাদের আধুনিক বাঙ্গালি কবি পর্য্যন্ত সকলেই কোকিলের ডাকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে আর কোন পাখির এত গুণ-গান শুনিতে পাওয়া যায় না।

আরব্য ও পারস্য কবিরা তাঁহাদের কবিতায় বুলবুলকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, বুলবুলের গুণ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বুলবুলের মত কোন পাখিই নাই। এমনি বুলবুলের গান।

বিলাতী কবিদের কাছে শুন "নাইটিংগেল" আর 'কুকু'। এই দুইটাই পাখিদের মধ্যে তানসান। এমন কবি নাই যিনি ইহাদের হইয়া দু-কথা না বলিয়াছেন।

এবার আমরা একজাতীয় গায়ক পাখির ছবি দিলাম। ইহাদের ইংরাজিতে থ্রস বলে। ইহাদের গানও বেশ সুমিষ্ট। কবিদের পুস্তকের মধ্যে ইহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাইটিংগেল ও বুলবুল জাতীয়। দেখিতে অনেকটা ছাতারিয়া পাখির মত। এক জন ইংরাজি লেখক এই থ্রস সম্বন্ধে মনের আবেগে কটমট ইংরাজিতে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—"সন্ধ্যার সময়ে যখন দুরস্থ জল প্রবাহের অস্ফুট কুল কুল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, যখন সান্ধ্য সমীরণ বিকশিত কুসুমের সৌগন্ধি অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া দেয়, তখন কোন বৃক্ষশাখা বা গিরিপার্শ্ব হইতে থ্রসের সঙ্গীত-রব নির্গত হইয়া বন ও গিরিগাত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অন্যান্য পাখির আরও কত চমৎকার গান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহাই যথেষ্ট। ইহার গীতধ্বনি আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, প্রাণকে কোমল করিয়া দ্রব করিয়া দেয়, মনে পবিত্র শান্তি বিস্তার করে, পৃথিবীর শান্তিকে স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহার মোহিনী শক্তি মানব মনের দুঃখ-সমুদ্রের আন্দোলিত বারিকে প্রশান্ত করিয়া দেয়।" ইত্যাদি অনেক! ইহাদের গানটা কিরূপ শুন—কুই, কুই, কুই, কুঈন, কুইপ্—টিউরু টিউরু, চিপ্উই—টু-টী, টু-টী, চিউ চু—চিররি, চিররি, চুঈ—কুই, কুই, কুই।

ইহারা প্রায়ই নদী বা পুকুরের ধারে বনের মধ্যে থাকে। ফড়িং প্রভৃতি ছোট ছোট পোকা আর সামুক গুগ্লি ইহাদের খাদ্য। সামুক মুখে লইয়া পাথর, ইঁট বা গাছের গুঁড়িতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া খায়। ছোট ছোট ফল ও শস্যাদিও ভক্ষণ করে। ইহাদের বাসার ভিতরের দিকটা কচি পাতা, ঘাস, খড় প্রভৃতি কোমল দ্রব্যের। বাহিরের দিকটা গাছের শিকড়, কাঠের টুকরা, দড়ি,

সুতা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের গায়ের রং ধূসর অথচ একটু সবুজের আভা যুক্ত, ডানার উপর হল্‌দে রঙ্গের ফুট ফুট আছে। পেটের দিকটা সাদা তাতে কাল ফুট ফুট। পা একটু লাল্‌চে রঙ্গের।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

একশত বৎসরেরও অধিক হইল বাঙ্গালায় এক ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হয়। তখন ভারত ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই; আজ ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাজা, কিন্তু তখন ইংরাজ বাঙ্গালার দেওয়ান মাত্র। ইংরাজ রাজ্যের প্রথম সূত্রপাতের সময় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালায় যে মন্বন্তর উপস্থিত হয়, আজিও বাঙ্গালী তাহার ফলভোগ করিতেছে। এ প্রকার মন্বন্তর কেহ কখনও দেখে নাই—শুনে নাই। ইতিহাসে লেখে বাঙ্গালা দেশ যখন মোগল সম্রাটের অধিকার ভুক্ত হয়, তখনও এই প্রকার একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজার রাজধানী গৌর নগর ইহাতেই শ্রীভ্রষ্ট এবং ধ্বংস হইয়া যায়।

সিরাজুদ্দৌলার পর মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছেন। ইংরাজ বাঙ্গালার দেওয়ান। রাজস্ব ইংরাজ আদায় করেন; মীরজাফরের উপর রাজ্য শাসনের অর্থাৎ বাঙ্গালীর প্রাণ ও ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার। মীরজাফর মহা পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু ও কাপুরুষ; মীরজাফর আত্মরক্ষায় অসমর্থ, প্রজা রক্ষা করিবে কিরূপে? সুতরাং বাঙ্গালার লোকের তখন কি প্রকার অবস্থা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরাজ রাজ্য শাসন করেন না, কেবল রাজস্ব আদায় করেন। মীরজাফর রাজ্যশাসনে অক্ষম; সুতরাং বাঙ্গালা ক্রমে অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠিল। দস্যু ভয় এই সময় বাঙ্গালায় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ইহারই দুই তিন বৎসর পরে ঘটে। কিন্তু সে কথা আর আজ নহে; সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভাল রকম ধান্য জন্মিল না, সুতরাং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস চা'ল কিছু দুর্ম্মূল্য হইল। দেশের লোকের কিছু কষ্ট হইল; কিন্তু ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হওয়াতে লোকের আশা হইল, আয়েন্দা সনে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, কর্ত্তিকেও বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ধান্যের গাছ জন্মিয়াছিল, ফলিলে তাহাতে লোকের সকল কষ্ট দূর হইত, লোকের অবস্থা স্বচ্ছল হইত। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ক্ষেত্রের ধান্য শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। শস্য যখন খুব প্রচুর পরিমাণে ফলে, তখন রাজপুরুষেরা সিপাহীদের জন্য সুলভ মূল্যে শস্য কিনিয়া রাখেন; আর যেবার ফসল ভাল না হয়, সেবারও যত মূল্যেই কেন হউক না রাজপুরুষেরা সিপাহীদের জন্য কতক কিনিয়া রাখিবেনই। এবারও তাহাই হইল; ক্ষেত্রের ধান্য শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছিল, যাহা কিছু ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পায় না। চা'ল ক্রমে অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইল, ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল; দেশে এক মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। চৈত্রের ফসল দেখিয়া লোকের একটু আশা হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যে প্রকার অভাব, তাহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য; চৈত্রে যাহা কিছু জন্মিল, তাহাতে লোকের পেট ভরিল না। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর দেখিয়া কৃষকের প্রাণ শুকাইয়া গেল, গৃহস্থ মহা ভীত হইল, রাজা রাজস্ব আদায় হইবে না ভাবিয়া

বিষণ্ণ হইলেন। বাঙ্গালীর প্রাণান্তেও মুখ ফুটে না, কিন্তু সকল জিনিষেরই সীমা আছে, বাঙ্গালীর এই অসাধারণ ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। লোকে আধপেটা খাইল, তার পর এক সন্ধ্যা খাইল, তার পর তাহাও পাইল না। তখন দেশ মধ্যে এক মহা হাহাকার উঠিল। মাঠে ধান্য শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছে, গোলায় ধান্য নাই, গৃহস্থের গৃহে চা'ল নাই। যাহারা কোন দিন ভিক্ষা করে নাই, পেটের দায়ে তাহারাও ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তার পর তাহাও পাইল না, ভিক্ষা কে দিবে—কোথা হইতে দিবে? চা'ল প্রথমে খুব দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, তার পর একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল!

কৃষকেরা প্রথমে বীজ ধান খাইল, তার পর গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, তার পর ঘর বাড়ী, জোত জমা, যা কিছু ছিল, পেটের দায়ে সব বেচিল। কিন্তু তাহাতেও পেট ভরে না—পেট-ভরা দূরে থাক, সকলের মুখে একমুঠা করিয়াও কুলায় না। ইতিহাসে লেখে পিতামাতা হৃদয় পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণসম ছেলে মেয়েদিগকে তখন বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর তাহাই বা কে কিনে? বাজারে খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। গৃহস্থের গৃহে যত দিন টাকা কড়ি ছিল, ততদিন কায় ক্লেশে দিন কাটাইল, তার পর ভিক্ষা আরম্ভ করিল, তার পর আর তাহাও পায় না! ধনীর গৃহ অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশে চা'ল নাই—অর্থে কি করিবে? সোণা রূপা, টাকা কড়ির তখন আর কোন মূল্য নাই—টাকা তখন মাটির অপেক্ষাও হীন। তখন একমুঠা টাকা অপেক্ষা একমুঠা চা'লের মূল্য সহস্র গুণে অধিক। পেটের দায়ে লোকে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। ইহারা টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি হরন করিত না—সোণা রূপা দিয়া তখন কি করিবে? যাহার ঘরে এক মুঠা চা'ল আছে সন্ধান পায়—কাড়িয়া খায়; হয়ত অপহৃত একমুঠা চা'ল লইয়া নিজেরাই কাটাকাটী করিয়া মরে। দেশের তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ! কোটী কোটী লোক অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে, দেশে চা'ল নাই! ধনীর গৃহ ধনে পূর্ণ, কিন্তু তাহার শিশুসন্তান অন্নাভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; সে আর্ত্তনাদে মাতার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, পিতার বুকে শেল বিঁধিতেছে; কিন্তু উপায় নাই—দেশে চা'ল নাই! একবার সেই ধনীর গৃহের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। শত দাস দাসী যাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল, আজ তাহারা কেহ নাই। যে গৃহ আমোদ প্রমোদ ও উচ্চ হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহা নীরব; কেবল মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি উঠিতেছে। বাজারে যাও দেখিবে হাট বাজার লোক শূন্য; গ্রামে যাও দেখিবে গ্রাম মনুষ্য শূন্য। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে লোক নাই। শত শত গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে মানুষ নাই। মধ্যে মধ্যে কেবল শিশু ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। গ্রামের লোকেরা গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়াছে; দলে দলে নগরের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে,—আশায় নগরে গিয়া খাইতে পাইবে! কতক নগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে, কতক তাহাও পারিতেছে না। অনাহারে ও রোগে পথেই মরিতেছে। একবার ভাবিয়া দেখ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। পরিবারের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া লোকে আত্মরক্ষার জন্য উন্মত্তের মত কেবল চারিদিকে ছুটিতেছে। পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, স্বামী স্ত্রীকে অনাথা করিয়া যাইতেছে; কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছে না! দেশময় কেবল হাহাকার। দলে দলে রুগ্ন শীর্ণ ক্ষুধায় উন্মত্ত লোক নগরের দিকে ছুটিতেছে; দলে দলে গৃহ ছাড়িয়া পলাইতেছে, যাহারা পলাইতেছে তাহারা কতক পথেই মরিতেছে, কতক বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিতেছে। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা না খাইতে পাইয়া রোগে ভুগিয়া, মরিতেছে।

লোকে প্রথমে খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল, পরে ঘাস খাইতে লাগিল, আগাছা খাইতে আরম্ভ করিল। ইতর লোকে ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিল। ইতিহাসে লেখে শেষে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা আর কিছু না পাইয়া মৃত মানুষের মাংস খাইতে আরম্ভ করিল।

বিপদ প্রায় একা আসে না। রোগ সময় বুঝিয়া উপস্থিত হইল; জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয় এবং বসন্ত রোগে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল; বিশেষ বসন্তের প্রকোপ কিছু অধিক হইয়াছিল। কে কাহার চিকিৎসা করে, কে কাহাকে দেখে, কে রোগীর মুখে একবিন্দু জল দেয়! কেহ কাহাকে দেখে না, কেহ কাহাকে স্পর্শ করে না, মরিলে কেহ তাহার সৎকার করে না; যে গৃহে রোগ প্রবেশ করে, গৃহবাসীরা রোগীকে ফেলিয়া সে গৃহ হইতে পলায়ন করে। মরিলে গৃহ হইতে ফেলে না—মরে আর গৃহ মধ্যে আপনি আপনি পচে!

রাজপথের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর। দলে দলে শীর্ণ, শুষ্ক দেহ, ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা উন্মত্তের মত ছুটিতেছে; কেহ রোগ যন্ত্রণায় পথে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; কেহ আসন্ন মৃত্যুকালে ক্ষীণ কণ্ঠে একবিন্দু জলের জন্য কাতরাইতেছে—কে তাহার কথা শুনে? কেহ মরিতেছে, কত সহস্র সহস্র মৃত দেহ রাজপথে পড়িয়া রহিয়াছে। শকুনী গৃধিনী শিয়াল ও কুকুরেরা দিবাভাগে সেই প্রকাশ্য রাজপথে মহানন্দে সেই শবমাংস ভক্ষণ করিতেছে। কে কাহার সংবাদ লয়? ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার, রোগীর আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর কাতরতা এবং এই শকুনী গৃধিনী ও শিয়াল কুকুরের বিকট কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না!

চিরদিন কিছুই থাকে না, কালে সকলই যায়। যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গলা উৎসন্ন হইয়াছিল, তাহাও চলিয়া গেল। ১১৭৭ সালে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভগবান প্রসন্ন হইলেন। এবৎসর বেশ বৃষ্টি হইল, পৃথিবী আবার শস্য-পূর্ণ হইল; কিন্তু খাইবার লোক নাই। ৭৬ সালে দেশ শস্য শূন্য হইয়াছিল, লোকে না খাইতে পাইয়া মরিল, ৭৭ সালে দেশ শস্যে পূর্ণ হইল, খাইবার লোক জুটিল না। ইতিহাসে লেখে এই মন্বন্তরে বাঙ্গলার দশকোটী অর্থাৎ প্রায় ছয় আনা রকম লোক প্রাণ হারায়!

খুব শস্য হইল বটে কিন্তু দেশ জনশূন্য! গ্রামে গ্রামে বাড়ী পড়িয়াছে তাহাতে বাস করিবার লোক নাই; শত শত উর্ব্বরা ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে, কর্ষণ করিবার লোক নাই। ক্রমে মাঠ গ্রাম জনপদ সমস্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠিল। বৎসরের পর বৎসর গেল ক্রমে জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেখানে সমৃদ্ধ নগর ছিল, সেস্থান সিংহ ব্যাঘ্রের আবাসস্থান হইল। দেশের তিন ভাগের এক ভাগেরও অধিক ঘোরতর জঙ্গলে পরিণত হইল। কত গ্রাম কত নগর সেই মন্বন্তরে উৎসন্ন গিয়াছে, আজও তাহা ঘোরতর জঙ্গলে পরিপূর্ণ—কেবল সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া রহিয়াছে!

———

সমালোচনা।

সথায় যে সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকাদি সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, তাহার অনেকই আমরা সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি না। ইহাতে গ্রন্থকারগণ হয়ত আমাদের উপর অনেক সময় অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে আমরা অসমর্থ। যে সকল পুস্তক সথার পাঠক পাঠিকাদিগের উপযোগী এবং যে সকল পুস্তক পাঠে সথার পাঠক পাঠিকাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা, আমরা কেবল সেই সকল পুস্তক সমালোচনা করিতে পারি, অন্যান্য পুস্তক সমালোচনা করা সথার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে। সুতরাং গ্রন্থকারগণ আমাদিগের ত্রুটি লইবেন না। যে সকল গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাদি আমাদিগকে উপহার দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা নিতান্ত বাধিত আছি, এবং তাঁহাদের উপহার অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। যে কারণে সকল প্রকার পুস্তক আমরা সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি না, তাহা উল্লেখ করা হইল, সুতরাং আশা করি গ্রন্থকারগণ আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।

কলিকাতা আশাদলের (Band of Hope) জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত সুরাপান বা বিষপান নামক পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। সুরাপানে আমাদের দেশের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সুরা বিষে যে আমাদের দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, কত সুখের সংসার শ্মশান হইয়া গিয়াছে কত গৃহ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কত শত রমণী বিধবা হইয়াছে, কত বালক বালিকা অনাথ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সুরা বিষে কত সংসারের সুখ শান্তি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, পরিবারের মধ্যে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা চলিয়া গিয়াছে,—আছে কেবল অশান্তি, অশ্রুজল ও হাহাকার। খোলাভাটীর কল্যাণে এখন আমরা প্রতি গ্রামে, প্রতিগৃহে সুরাপানের বিষময় ফল দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীতে যত প্রকার দুষ্কার্য্য সাধিত হয়, তাহার অনেকের মূল সুরাপান। ইহাতে শরীরের স্বাস্থ্য যায়, বল যায়, বুদ্ধি যায়, শেষে জীবন পর্য্যন্ত যায়। দেশের জেল, পাগলাগারদ, দরিদ্রালয় প্রভৃতিতে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে কত লোক সুরাপানে জেলে গিয়াছে, কত লোক সুরা বিষে পাগল হইয়া গিয়াছে, কত লোক সুরা পানের জন্য পথের ভিখারী হইয়াছে। মদ্যপান করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, মানুষ পশুর সমান হয়। জ্ঞান বাবু এই সুরা বিষপানের বিষময় ফল এবং ইহা দ্বারা আমাদের দেশের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, দেশের লোকের দিন দিন কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। সুরাপানে যত প্রকার ক্ষতি হইতেছে, কি উপায়ে সুরাপান দেশে কমিতে পারে এবং সুরা সম্বন্ধীয় অনেক কথা এ পুস্তকে আছে। এই পুস্তকখানি লিখিতে জ্ঞান বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, সেজন্য তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের সহিত [illegible] দিতেছি। পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া জ্ঞান বাবু দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন, এ পুস্তক যতই পঠিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। সথার পাঠক পাঠিকাগণ সুরাকে চিরদিন বিষ বলিয়া জানিবে; এবং সুবিধা হইলে এই পুস্তকখানি এক একবার পড়িয়া দেখিবে।

সখা।
ষষ্ঠ ভাগ। দ্বাদশ সংখ্যা।

ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

নানাকথা।

এখনকার জর্ম্মন সম্রাটের পিতামহ সম্রাট উইলিয়াম, যাঁহার কয়েক মাস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, একবার কয়েক জন বন্ধুর সহিত শীকার করিতে গিয়াছিলেন। শীকার করা শেষ হইলে সম্রাটের হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সাধ হয়। তাঁহার সহিত সাক্সনির রাজা ও ম্যাকলেনবর্গের ডিউকও হাঁটিয়া আসিতে লাগিলেন। শীকারের পরিশ্রমের পর অনেক দূর হাঁটিয়া আসায় তাঁহাদের বড় ক্লান্তি বোধ হইল। রাস্তায় দেখিতে পাইলেন একজন লোক একখানা ভাঙ্গা কাঠ-বোঝাইএর গাড়ি লইয়া আসিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। সেও পয়সার লোভে স্বীকৃত হইল। খানিক দূর গিয়া তাঁহারা কে এই জানিবার জন্য গাড়োয়ানের বড় কৌতূহল জন্মে। সে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ হে তুমি কে" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন 'আমি ম্যাকলেনবর্গের ডিউক'—"হ্যাঁ তাইত"; "তুমি কে মশাই" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন 'আমি সাক্সনির রাজা'—"বেশ বেশ"; "আর তুমি কোথাকার রাজা" তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন 'আমি জর্ম্মণ দেশের সম্রাট'। গাড়োয়ানের ওসব কিছুই বিশ্বাস হইল না, সে মনে করিল এই তিনজন লোক তাহার সহিত বড় মজাই করিতেছে। সে বলিল "আচ্ছা আমি কে জান, আমি পারস্য দেশের রাজা"। তারপর রাজার বাড়ী পৌঁছিয়া যখন দেখিল অনেক লোক জন সাজ সজ্জা করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাদের নমস্কার করিতেছে, তখন তাহার চৈতন্য হইল, অমনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক দি গ্রেটের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটী কল কারখানার ঘর ছিল। বাড়ীটি দেখিতে বড় কদর্য্য; কেবল ধোঁয়া ধূলায় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত, রাজার চোখের সাম্‌নে অমন কুৎসিৎ জিনিষ কেন থাকিবে। রাজার সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। তিনি সেই কারখানার কর্ত্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে যত টাকা চায় তত টাকা দিয়া তিনি ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। কিন্তু গৃহস্বামী এই বাড়ী কিছুতেই বিক্রয় করিতে রাজি হইল না। তখন রাজা বলপূর্ব্বক ঐ বাড়ী ভাঙ্গাইয়া দিলেন। সে লোকটা তখন বলিল "আচ্ছা এখন বাড়ী ভাঙ্গ, দেশে আইন আছে, আমি দেখে নেব"। তৎপরে সে বিচারালয়ে রাজার নামে নালিস করিল। জজেরা বিচার করিয়া বলিলেন যে "রাজা বড় অন্যায় কায করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনরায় ঐ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে এবং তাহার

সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে আমরা আদেশ করিতেছি”। কার হুকুমের জোর বেশী—রাজার, না রাজা যে আইন করিয়াছেন তাহার? আইনেরই বেশী। রাজা বাধ্য হইয়া পুনরায় সেই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক টাকা দিলেন। যদিও রাজা মনে মনে বিরক্ত হইলেন তবুও বলিতে লাগিলেন “দেশে যে এমন সুন্দর আইন আছে এবং সেই আইন প্রচলিত করিতে যে এমন সৎ বিচারক আছেন তজ্জন্য আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।”

সেই ব্যক্তির বংশধরেরা অদ্যাবধি সেই কারখানার অধিকারী। আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই কারখানার কোন মালিকের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় সে এই বাড়ী বিক্রয় করিবার ইচ্ছায় জর্ম্মন সম্রাট উইলিয়ামের নিকট পত্র লিখে। ঐ পত্রে রাজা ফ্রেডরিকের সহিত ঐ বাড়ী লইয়া যে বিবাদ হয় তাহারও উল্লেখ করে। উইলিয়াম তাহার উত্তরে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন ঃ—

প্রিয় প্রতিবাসি—আমি তোমায় ঐ বাড়ী বিক্রয় করিতে দিব না। যত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের কেহ জীবিত থাকিবে তত দিন উহা তোমাদেরই থাকিবে। উহা প্রুসিয়ার ইতিহাসের অংশ স্বরূপ। তোমরা সম্প্রতি বড় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। এই পত্রের সহিত তোমাকে ৬০০০ ছয় সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিলাম, ভরসা করি তোমাদের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। আমাকে সর্ব্বদা তোমাদের প্রিয় প্রতিবাসী মনে করিও—

ফ্রেডরিক উইলিয়াম।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক রাবিলে রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। একবার তিনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস হইতে কোন দূরস্থ নগরে গমন করেন। সেই স্থানে তাঁহার যাহা কিছু সম্বল ছিল সব ফুরাইয়া যায়। পারিসে ফিরিয়া আসিবার ব্যয়ের কিছুমাত্র সংস্থান নাই, অথচ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন এক বড় জুয়াচুরি ফন্দি বাহির করিলেন। তিন চারিটা ছোট ছোট কাগজের বাক্সে সুরকি আর ধূলা পূরিয়া সেই বাক্সগুলির উপর “রাজার প্রাণবধের জন্য বিষ” এই কথা বড় বড় করিয়া লিখিয়া তাহার নীচে ‘রাবিলে’ নাম স্বাক্ষর করিয়া যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর নানা স্থানে সকলে যাহাতে দেখিতে পায় এরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিলেন। পরদিন গৃহস্বামী ‘রাবিলে’ স্বাক্ষরিত “রাজার প্রাণবধের জন্য বিষ” দেখিতে পাইয়া পুলিসে খবর দিল। পুলিস আসিয়া রাবিলেকে রাজার প্রাণ নাশের চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ সরকারী খরচে পারিসে পাঠাইয়া দিল। রাবিলে বিনা ব্যয়ে পারিসে হাজির। বিচারে সেই বাক্সগুলিতে বিষের লেশ মাত্র না পাওয়ায় রাবিলের কোন অপরাধ প্রমাণ হইল না। রাবিলে অক্লেশে মুক্তি পাইলেন।

সকল দেশেই লোকে শোকের চিহ্ন ধারণ করে। আমরা শোক চিহ্ন স্বরূপ সাদা কাপড়, থানের ধূতি প্রভৃতি ব্যবহার করি। পুরাকালে গ্রীক ও রোমীয়েরা শোক সময়ে আমাদের ন্যায় শ্বেত বস্ত্র ব্যবহার করিত। এখন ইউরোপীয় সমস্ত জাতিরই শোক চিহ্ন কাল বর্ণের। ইজিপ্তে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। শোক সময়ে তুর্কিরা বেগুনি রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করে। চীনেরা সাদা কাপড় পরে।

লর্ড ল্যান্সডাউন।

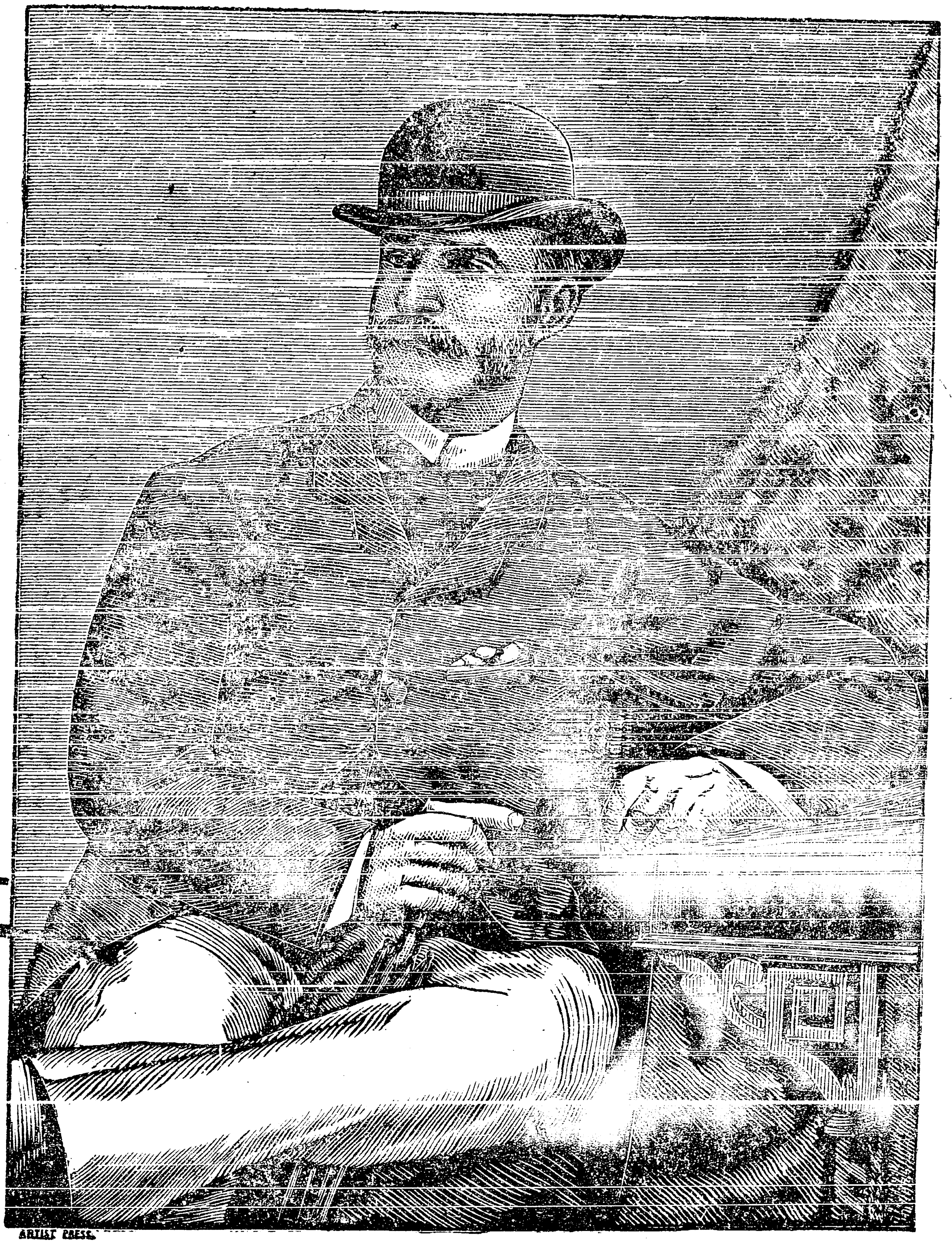
ARTIST PRESS.

আমাদের একজন নূতন বড়লাট আসিয়াছেন। ইনি লর্ড ল্যান্সডাউন। ইহাঁর বয়স অধিক নয়, ৪৪ বৎসর মাত্র। অন্যান্য লাটেরা প্রায় সকলেই ইহাঁ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ইনি অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতের রাজা এডওয়ার্ড দি

কনফেসারের সময় হইতেই অর্থাৎ সাত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁদের খুব প্রতিপত্তি, সেই সময় হইতেই ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ রাজনৈতিক ও যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রিটিস রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। প্রথম মার্কুইস লর্ড সেলবোর্ণ তৃতীয় জর্জ্জের মন্ত্রী ছিলেন। বর্ত্তমান লর্ড ল্যান্স-ডাউনের অর্থাৎ আমাদের বড়লাটের পিতামহ তৃতীয় মার্কুইস অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া খুব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইয়াছেন। লর্ড সভায় বিশ বৎসর ধরিয়া দলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ জর্জ্জ, চতুর্থ উইলিয়ম এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র আমাদের বড়লাটের পিতা রুগ্ন ও দুর্ব্বল অবস্থায় তিন বৎসর মাত্র পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধি ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের বড়লাট ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পিতার জেষ্ঠ পুত্র। ইনি অক্সফোর্ডের ইটন ও ব্যালিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং কিয়ৎ-কালের জন্য উইল্টস্ ইউমনিরি অশ্বারোহী সৈন্য দলের কাপ্তান ছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালে লেখা পড়া অপেক্ষা মৃগয়া ক্রিকেট খেলা ও নৌকা বাহনে খুব আসক্ত ছিলেন। ১৮৬৬ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হয়েন।

১৮৬৮ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। গ্লাডষ্টোন তখন মন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রী সভায় কোন ছোট পদে ইহাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এক বৎসর পরেই ডিউক অব এবার-কর্ণের কনিষ্ঠা দুহিতাকে বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালে লর্ড ল্যান্সডাউন যুদ্ধ বিভাগের ছোট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েন। ১৮৮০ সালে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রী হইলে ইনি ভারতবর্ষের আণ্ডার সেক্রেটারি হয়েন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার দুই মাস পরে মন্ত্রিসমাজের সহিত তাঁহার মত বিরোধ হওয়ায় সে পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর তিন বৎসর কোন কর্ম্ম করেন নাই। ১৮৮৩ সালে লর্ড লান্সডাউন ক্যানাডার গবর্ণর হইয়া তথায় গমন করেন। ক্যানাডার গবর্ণররূপে ইহাঁর কীর্ত্তি-কলাপ বড়ই প্রশংসনীয় হইয়া উঠে। তিনি নানাগুণে প্রজাগণের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এক রেলওয়ে নির্ম্মাণ করেন। ক্যানাডা-বাসীদিগের শিল্প কার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। লর্ড ল্যান্স-ডাউন কার্য্যক্ষম, মিষ্টভাষী, বাকপটু ও রহস্যশীল বলিয়া ক্যানাডায় যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি অতিথি সৎকারে বড় নিপুণ, এ বিষয়ে ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ইহাঁর প্রধান সহায়।

লর্ড ল্যান্সডাউন আইরিশম্যান। আয়র্লণ্ডে ইহাঁর বিস্তৃত জমিদারী আছে। বিলাতে ইহাঁর বড় বড় বাড়ী আছে।

ইহাঁর চারি সন্তান;—দুই কন্যা ও দুই পুত্র। ইহাঁর নাম—হেন্‌রি চার্লস্ কীথ পেটি-ফিট্‌জ্‌মরিস্—ইহাঁর উপাধি—মার্কুইস অব ল্যাণ্ডস্‌-ডাউন্ জি, সি, এম্, জি; আর্ল্ ওয়াইকোম্ব; ভাইকাউণ্ট ক্যাল্‌ন ও ক্যাল্‌নষ্টোন; আর্ল অব-কেরি এবং আর্ল অব সেলবর্ণ; ভাইকাউণ্ট ক্লান্‌মরিস্ ও ফিট্‌জ্‌মরিস্; ব্যারন্ অব কেরি, লিক্‌স্‌ন ও ডাঙ্কার্টন্।

ভাই বোন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১৪৭ পৃষ্ঠার পর।)

পূর্ব্ব কথিত ঘটনার ৭ বৎসর পর বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামের এক পুকুরের ঘাটে, বিকাল বেলা দুই জন লোক বসিয়া কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। গ্রীষ্ম কাল, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটু একটু দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। আমরা যে দুই জনের কথা বলিলাম তাহার মধ্যে এক জন পুরুষ, অন্যটী স্ত্রীলোক। উভয়েরই বয়স বিশ বৎসরের উপর হইবে। চেহারা দেখিয়া বোধ হয় তাহারা বড়ই সুখে আছে। দুজন ভাই ভগিনী। ভ্রাতা মনের সুখে দিদির নিকট কত কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে ছেলেবেলার কথা উঠিল। তখন উভয়েরই মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইল। যেন তাহাদের সে সুখের মধ্যে দুঃখের একখানা মেঘ উঠিল। ভগিনীর চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তখন ভ্রাতা বলিলেন

"দিদি, একবার যদি বাবা কিম্বা মার কোন নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম, তবেই দুঃখ দূর হইত।"

দিদি। "না ভাই সে আশা আর নাই। পর-মেশ্বর সুখের মধ্যে মনে একটা দুঃখ রাখিলেন, এ দুঃখ আর দূর হইবে না।

ভাই। "কেন দিদি, যিনি আমাদের এত দুঃখ দূর করিয়াছেন তিনিই এ দুঃখ দূর করিতে পারেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর—তাঁহাকে ডাক, দেখ তাঁহার দয়া হয় কি না?"

এইরূপ কথাবর্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ পথিক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাঁহারা আগন্তুককে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং মহিলাটী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। ভদ্র-লোকটী আগন্তুককে সসম্মানে বসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ বসিয়া বলিলেন—

"মহাশয় ক্ষমা করিবেন—আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখানে অনে-কের নিকট আশ্রয় চাহিলাম, পাইলাম না। ভরসা করি আপনি বিমুখ হইবেন না।"

যুবক। আজ্ঞে এ আর কত বড় কথা। মহাশয় সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। এখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল শ্রান্তি দূর করুন। পরে আপনার থাকিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

বৃদ্ধ। এখানে বসাটা কি ভাল দেখায়? চলুন বাহির বাড়ীতে যাওয়া যাক।

যুবক ও বৃদ্ধ বহির্ব্বাটীতে চলিলেন। সেখানে গিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন বাড়ীটী অতি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। ভৃত্যেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারা বাবুকে দেখিয়া শশব্যস্তে আসিয়া আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিল। বাবু বলিলেন "দক্ষিণ দিকের একটা কামরায় পরিষ্কার করিয়া সেখানে একটা বিছানা করে দাও, আর বাড়ীর ভিতরে বল যে, এক জন ভদ্রলোক এসেছেন, একটু জলখাবার যোগাড় করে দিক্।

সে চাকর আদেশ পাইয়া চলিয়া গেল। অন্য এক জনকে হাত মুখ ধোবার জল দিতে বলিয়া বাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন। গিয়া দিদিকে বলিলেন "দিদি! অতিথি এসেছে দেখেছ? আমার মনটা যেন কেমন করিতেছে—কোথা যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। তুমি একবার উকী দিয়ে ভাল করে দেখ দেখি, তোমার কিছু মনে-হয় কি না।"

যুবক বাহিরে আসিলেন, বাহিরে শীতল বায়ুতে একটু বেড়াইলেন কিন্তু তাঁহার মন শান্ত হইল না, কি যেন মনে ঢেউ খেলিতেছে, ছেলেবেলার কত কথা মনে উঠিতেছে—সেই প্রবল বাতাস, জল, অন্ধকার রাত্রি, মা বাপ, শিশু ভাই সকলই একে একে মনে হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কত বাসনা মনে জাগিল, আবার নিবিয়া গেল। "এই সুখের দিনে যদি স্বর্গীয়া জননীর বুকে মাথা রাখিতে পারিতাম" "একবার যদি পিতার চরণ দর্শন করিতে পারিতাম" এইরূপ কত ভাবিলেন, মন আরও অস্থির হইল। অবশেষে মনে হইল অতিথি একাকী বসিয়া আছেন, অমনি সেখানে গেলেন।

অতিথির মনে কি হইয়াছিল তাহা আমরা বলিব না। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "বড় একটী কৌতূহল হইতেছে। মহাশয় কি চিরকালই এখানে বাস করিতেছেন? না, এখানে নূতন বাস করিতেছেন?"

যুবক। কেন মহাশয়? আপনার এরূপ সন্দেহ হইতেছে কেন?

বৃদ্ধ। এখানে কোথাও আশ্রয় পাইলাম না, এখানকার লোকে কাহাকেও রাত্রিতে থাকিতে দেয়, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি কেন এত আদর করিলেন? আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোথাও অতিথির প্রতি এত আদর দেখি নাই।"

যুবক। মহাশয়! আমরাও একদিন সেখানকার লোক ছিলাম, অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখানে এসেছি।

বৃদ্ধের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য যুবক সমস্ত কথা বলিলেন। কেমনে এখানে এসেছেন তাহাও বলিলেন। শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষুতে জল আসিল; তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, দুঃখে কি সুখে তাহা যুবক বুঝিলেন না। আমরাও জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে বাধ্য যে ইনিই আমাদের—বসু বাবু। এবং যুবক তাঁহার পুত্র। পূর্ব্ব কথিতা রমনী তাঁহার কন্যা।

কন্যা দেখিয়া পিতাকে চিনিয়াছেন। ভাই বাবাকে চিনিতে পারেন কিনা তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে রহিয়াছেন।

বৃদ্ধ যখন পুত্রের সকল কথা শুনিলেন তখন তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। যুবক তখন আর থাকিতে পারিলেন না। "বাবা" বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাকরেরা দেখিয়া সকলে অবাক হইল। বাড়ীর ভিতরে একবার গেল। তখন দিদিঠাকরুণও আসিয়া মিলিলেন। তাহার পরে কি ভাবে বৃদ্ধ ও পুত্র কন্যা সুখী হইলেন ও পরস্পরকে গ্রহণ করিলেন তাহা লিখিবার বিষয় নহে। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা অনুভব করিবেন।

ভিখারিণী।

ছিন্ন-বাস পরা, ধূলায় ধূসরা,
এলো থেলো চুল গুলি,
পাগলিনী প্রায়, চারি দিকে চায়,
চ'লে যায় ঢুলি ঢুলি!

বদন মলিন, অতিশয় ক্ষীণ,
শরীরে নাহিক বল,
যেন দিন-হীন, দুঃখেতে মলিন,
আঁখি দুটী ছল্ ছল্!
কে বলনা ভাই, তোমারে সুধাই,
আসিল বা কোথা হ'তে?
এ বেশে সাজিয়া, কিসের লাগিয়া,
ফিরিতেছে পথে পথে!
ওই অভাগিণী, বুঝি ভিখারিণী;
নহিলে কে আর হবে?
কাতরে কাঁদিছে, কত কি বলিছে,
শুন শুন ভাই সবে!
"আমি অভাগিনী, দীন কাঙ্গালিনী
কেহ নাই এসংসারে,
শুষ্ক তরু প্রায়, জরাজীর্ণ কায়,
বেড়াই গো দ্বারে দ্বারে!
ছিল গো আমার, সোণার সংসার,
সুখের পসরা-ডালা,
পতি পুত্র ধন, আত্মীয়-স্বজন,
সোহাগের মণি-মালা!
মনে হ'লে হায়, বুক ফেটে যায়,
সে সকলে সমাদরে,
আমি গো রাক্ষসী, হাসি হাসি বসি,
দিয়াছি যমের করে!
এবে অনাথিনী, আমি অভাগিনী,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
মাথা দিতে ঠাঁই, কোথাও না পাই,
বিধাতার এ সংসারে!
টেনা ছেঁড়া বাস, অঙ্গে বার মাস,
বাস মোর তরু-তলে,
উদরের তরে, ফিরি ঘরে ঘরে,
'ভিক্ষা দাও মা গো ব'লে!'
নাহি জানি হায়, বিধাতার পায়,
করিয়াছি পাপ কত;
সেই সে কারণে, এ পোড়া জীবনে,
দহিতেছে অবিরত!
মৃত্যু-ভিক্ষা চাই, বিধাতার ঠাঁই,
সকাতরে বারে বার!
না শুনেন হরি; আমি যদি মরি,
কে বহিবে দুঃখ-ভার?
এ পড়া কপাল, থাকে যত কাল,
জ্ব'লে পুড়ে হব ছাই!
নয়নের জল, রহিবে সম্বল,
মুছাবার কেহ নাই!"
মরি মরি হায়, বুক ফেটে যায়,
শুনে ও দুঃখের গান,
কি জানি কেনরে, বুকের ভিতরে
কেমন করে যে প্রাণ!
চল চল হায়, ডাকিয়া উহায়,
ঘরেতে লইয়া যাই,
কন্যা পুত্র ভাই, কেহ ওর নাই,
সব হব আমরাই!
মুছাব নয়ন, ঘুচাব বেদন,
রাখিব যতন ক'রে
ও মলিন মুখে, হাসিটি দেখিলে,
নাচিব আমোদ ভরে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা সকলেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন না কোন কবিতা পাঠ করিয়াছ। কবিগাথা, কবিতামালা, পদ্য প্রকাশ প্রভৃতি বালক বালিকাদিগের পাঠ্য প্রায় সকল পদ্য গ্রন্থে তাঁহার কাব্যের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত আছে। ইনি বাঙ্গলার এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। ইনিই প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অমৃতাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন। মেঘনাদ বধ কাব্য ইহাঁর রচিত সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। আমাদের একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে "বহু দোষ সত্বেও এই কাব্য খানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ 'গাঁথিব নূতন মালা—

রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে, এবং এই 'নূতন মালা' চিরকাল তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।"

যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত; ইনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। মধুসূদন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ইহাঁর কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মধুসূদন বাল্যকালে নিজ গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। পরে একটু বড় হইলে কলিকাতায় হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মাইকেল নাম গ্রহণ করেন। পিতা হিন্দু ছিলেন, পুত্র খৃষ্টান হইল, এই ব্যাপারে তিনি যদিও যারপর নাই মর্ম্মাহত হন, তথাপি একমাত্র সন্তান বলিয়া স্নেহবশতঃ পুত্রকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। খৃষ্টান হওয়ার পর চারি বৎসর কাল শিবপুর বিশপ্স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এইখানে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে মান্দ্রাজ গমন করেন। মান্দ্রাজে সর্ব্বদা ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং এক জন উত্তম ইংরাজী লেখক বলিয়া গণ্য হয়েন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কলেজের ইংরাজ প্রধান শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজের এথীনিয়ম নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন এবং সম্পাদক স্বদেশ গমন করিলে পর ইনিই ঐ পত্রের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন ও খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি এক [illegible] ক্ষুদ্র ইংরাজী কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইংরাজী ভাষায় পদ্য লিখিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত অসার তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির ও ইংরাজী ভাষার উপর যে বিলক্ষণ দখল জন্মিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত তিনি এক কলম বাঙ্গালা লিখেন নাই বরং বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষাকে বড় ঘৃণা করিতেন।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৬ সালে স্ত্রীর সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সেই সময়ের কলিকাতার পুলিশ মাজিষ্ট্রেট কিশোরী চাঁদ মিত্রের অধীনে প্রথমে কেরাণী তৎপরে ইন্টরপ্রিটরের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৫৮ সালে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এবং এই রত্নাবলীর অনুবাদের পর হইতেই তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি একটু অনুরাগ জন্মে এবং সেই সময়ে তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন।

তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া যে কয় বৎসর এখানে ছিলেন তাহাতে বিশেষ শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মন বিষাদে পূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার এই সময়ে প্রণীত আত্ম-বিলাপ পাঠেই জানা যায়।

পরম দয়াশীল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মধুসূদন দত্তকে বিলাতে আইন শিখিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনেক অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহারই অর্থে ১৮৬২ সালের শেষভাগে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করেন। বিলাতে গিয়াও মাতৃ[illegible] উপেক্ষা করেন নাই। [illegible]পে ইনি চতুর্দ্দশ[illegible] করেন। ইনিই বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা প্রথম প্রচলিত করেন।

যথাসময়ে বারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং হাইকোর্টে বারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বারিষ্টারিতে তত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। ইহাঁর সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর চারি দিবস পরে ইহাঁরও মৃত্যু হয়। অনেক দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে বঙ্গের অমূল্য রত্ন শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

নিজে অর্থাভাবে দুঃখ কষ্টে সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দরিদ্রের মৃতদেহ বলিয়া সরকারি ব্যয়ে সরকারি গোরস্থানে দেহের সমাধি হইল। তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সাধের ধন বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি নিলাম হইয়া গেল; বটতলার কোন দোকানদার অতি সামান্য মূল্যে সেগুলি ক্রয় করিয়া লইল। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পথের ভিখারী হইল। সামান্য উদরান্নের জন্য পরের গলগ্রহ হইল।

একে একে তাঁহার সকল সন্তানেরা ইহ সংসারের দুঃখ এড়াইয়াছে এখন কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান এলবার্ট দত্ত বিদ্যমান। ইনি সেণ্টজেভিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর সমুদয় ব্যয় ভার ইহাঁর পিতার বন্ধুগণ বহন করিতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সরকারি গোরস্থানে ইহাঁর গোর হইয়াছে। সরকারি গোরস্থানের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের মধ্যে কাহারও গোরের উপর কোন রূপ স্মৃতিস্তম্ভাদি নির্ম্মিত না হইলে, গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে সেই গোরের দেহপঞ্জর উত্তোলিত করিয়া তৎস্থানে অপরের গোর দেওয়া হইয়া থাকে।

এই গোরস্থানের কোন কর্ম্মচারী কোন সময়ে বামাবোধিনীর সম্পাদক ও সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকট বলেন যে, প্রায় পনর বৎসর হইল মাইকেল মধুসূদন দত্তের এখানে গোর হইয়াছে, নিয়মানুসারে তৎস্থানে অপর গোর দেওয়ার সময় অনেক দিন হইল হইয়া গিয়াছে; যদি সত্বর কোন রূপ

স্তম্ভাদি নির্ম্মিত না হয়, তবে তাঁহার দেহপঞ্জর ফেলিয়া দিয়া অপরের গোরের জন্য সেখানে স্থান করা হইবে। এ কথা শুনিয়া আসিয়া বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে এ বিষয় উত্থাপন করেন এবং তাঁহারা কবিবরের জন্ম ভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যশোহর-খুলনা সম্মিলনীর সহিত একযোগে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়া, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া অনেক মাননীয় ব্যক্তির নামে জনসাধারণের নিকট এজন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। তদনুসারে বঙ্গের ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত, ও দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ১০৩৮/০ আনা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই টাকা হইতে প্রায় ৮০০ শত টাকা খরচে এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পোনের বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন; "আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূম-ণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।" বাঙ্গালী কবির জন্য বাঙ্গালী তখন রোদন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য বাঙ্গালী এত দিন কিছুই করে নাই। যে জাতি স্বদেশের মহৎ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মান না করে, তাঁহাদিগের গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টা না করে, সে জাতি কখনও উন্নত হয় না; মহত্ত্ব যাহাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই, তাহারা কখনও মহৎ হইতে পারে না।

বাঙ্গালার যিনি অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, তাঁহার সমাধি স্থান চিনিতে পারা যায় এমন কোন চিহ্ন সেস্থানে ছিল না। মধুসূদন দত্তের ইংলণ্ড প্রভৃতি কোন দেশে জন্ম হইলে আমরা তাঁহার কত গৌরব, কত সম্মান দেখিতাম। কিন্তু বাঙ্গালী আজ পোনের বৎসরের মধ্যে জাতীয় গৌরব মধুসূদনের নাম চিরস্মণীয় করিবার চেষ্টা দূরে থাক, তাঁহার সমাধির উপর একখণ্ড সামান্য প্রস্তর স্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এতদিন পরে সে কলঙ্ক কতক পরিমাণে দূর হই-য়াছে। কবিকুল ভূষণ মধুসূদনের সমাধির উপর একটী প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত হইল। সমাধি স্তম্ভটী ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে সুন্দর হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর শনিবার সমারোহ করিয়া তাঁহার সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মুক্ত করা হয়। সমাধি-স্থলে গণ্য মান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন কমিটির সম্পাদক রূপে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে সমাধিস্তম্ভ উন্মুক্ত করিতে বলেন।

আবরণ উ[illegible] কিছু বলেন। [illegible] আপনারা আমাকে যে কা[illegible]ভার দিয়াছেন তাহা আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমি মনে করি, সাহিত্যজগতে খ্যাতাপন্ন কাহা-রও উপর যদি একার্য্যভার অর্পিত হইত, এবং আমরা যে বিজ্ঞ যশস্বী কবিবরের স্মৃতির সম্মানার্থ এখানে সমবেত হইয়াছি তিনি যদি তাঁহার এই সমাধিস্থানের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতেন, তবে ইহা অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। তবে পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের শেষ ভাগে আমি তাঁহার অন্তরতম বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলাম বলিয়াই আমার উপর এই কার্য্যভার দিয়া থাকিলে ইহা ঠিক হই-য়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আমার সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবনের শেষ একাদশ বৎসর কাল আমি ইউরোপে এবং এদেশে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দভাবে পরিচিত হওয়ার অধিকারী হইয়াছিলাম।

সম্ভবতঃ বঙ্গের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, কত কাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি আমাদের যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল, আজ পনর বৎসর পরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে এখানে সমবেত হইয়াছি! মধুসূদন দত্ত আমাদের সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য বঙ্গবাসীরও তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে, তাহার তুলনায় এই সমাধি স্তম্ভ নিতান্ত সামান্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য বটে এই দীন সমাধিস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে শোকার্ত্ত স্বামী এবং সন্তান সন্ততির প্রতিষ্ঠিত কত কত সুরম্য ও সুবৃহৎ সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে; কিন্তু সকলেরই ইহা মনে করা উচিত যে, কবির স্মৃতি চিরস্থায়ী [illegible] জন্য এই স্তম্ভ গ্রথিত হয় নাই, [illegible] এই স্থানটি চিহ্নিত ক[illegible] ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। [illegible]সাকারী [illegible]বাসীগণ অর্থ কিম্বা শিল্প নৈ[illegible] দ্বারা তাঁহার যে স্মৃতি চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং তদ-পেক্ষা মূল্যবান এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রশংসার সহিত অধ্যয়ন করিবে, যত দিন বাঙ্গালী-জাতি ও বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার নাম অক্ষয় থাকিবে।

আমি এই সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মুক্ত করি-লেই আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দে মৃত্যুর-বহুকাল পূর্ব্বে কবির স্বরচিত একটী কবিতা ইহার এক পার্শ্বে খোদিত রহিয়াছে।"

তিনি আবরণ উদ্ঘাটন করিলে পর মধু-সূদনের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত আলবার্ট দত্ত সমাধি-স্তম্ভের উপর সর্ব্ব প্রথম পুষ্পস্তবক স্থাপন করি-লেন, তৎপর মনোমোহন বাবু সুচারুগ্রথিত লতাপুষ্পের হার এই বলিয়া স্তম্ভের উপর ঝুলাইয়া দিলেন যে,—"আমি বঙ্গবাসীদের প্রতিনিধি রূপে ও তাঁহাদের নামে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্তম্ভের উপরে এই মালা স্থাপন করিলাম।"

আবরণ উন্মোচন হইলে স্তম্ভের দুই দিকে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে নিম্নলিখিত দুইটী লেখা প্রকাশিত হইয়া পড়িল;—বাঙ্গলায় লেখা আছে

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে,
(জননীর কোলে, শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম), মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ইংরাজিতে যাহা লেখা আছে তাহার অর্থ:—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের একজন সর্ব্ব প্রধান কবি, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক ও মহাকাব্য প্রণেতা বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, যশোহরের অন্তর্গত সাগর-দাড়ীতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়; ও ১৮৭৩ সনের ২৩এ জুন মৃত্যু হয়; তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার কৃতজ্ঞ ও প্রশংসাকারী স্বদেশবাসীদের কর্ত্তৃক এই সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল।

তৎপর ধর্ম্মপ্রচারক ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় কিছু বলেন। তিনি বলিলেন "মানসিক কোন কোন বিষয়ে মধুস্থদন তাঁহার স্বজাতির প্রতিনিধি ছিলেন। বাঙ্গালিরা সাধারণতঃ ভাবুক এবং অপর জাতির ভাব সহজে আয়ত্ত করিতে সক্ষম; ভাব এবং চিন্তাতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ থাকে এবং সহজেই মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। শ্রীমধুস্থদনের এই সকল মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি তাঁহার শক্তির আলোচনা করিয়াছিলেন। অপরাপর অপেক্ষা তিনি বিশেষ ভাবে নিয়মিতরূপে মানসিক শক্তি সকলের চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়াই মানসিক তীক্ষ্ণতায় স্বজাতির প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালা এবং ইংরাজী উভয়ই যেন তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন। যিনি এত বহুল বিস্তৃত ভাষাসমুদ্র হইতে রত্ন সংগ্রহ করেন, তিনি কেবল নিজে লাভবান্ হয়েন না, স্বদেশবাসী জনগণকেও লাভবান্ করেন। আমি আজ আমার চতুর্দ্দিকে যত যুবকদিগকে দেখিতেছি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমার গ্রন্থকারের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করুন। বঙ্গীয় প্রধান কবিতে সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের চিন্তা প্রবাহ তাঁহাতে সম্মিলিত হইয়াছিল।

স্বর্গে কবিদিগের বৈকুণ্ঠে যেখানে কবিকুলরাজ হোমার, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি স্বর্ণ সিংহাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের এই গৌরবান্বিত প্রিয় কবি শ্রীমাইকেল মধুস্থদন দত্ত সসম্মানে বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সুখ শান্তিতে বিরাজ করুন; তাঁহার মাতৃভাষা আমাদেরও মাতৃভাষা। যাঁহার প্রতিভার মহিমা আমরা গান করিয়া থাকি, দেহপঞ্জর যেখানে প্রোথিত রহিয়াছে, সেই স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা ধন্য হই। শ্রীমধুস্থদনের নাম সমুদয় বঙ্গে, সমুদয় ভারতে চিরস্থায়ী হউক।"

তৎপর হাইকোর্টের উকিল এবং আমাদের একজন প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীতে এই বলিয়া শেষ করিলেন।

"তাঁহার গোরের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া তাঁহার স্মৃতি যে স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিয়াছে, তাহা সজীব রাখা যে উচিত তাহা আমাদের উপলব্ধি করা বিধেয়। তিনি যে অমূল্য সাহিত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার উৎকৃষ্ট স্মৃতিচিহ্ন; কিন্তু তাঁহার প্রতিভা যে এই জাতীয় কর্ত্তব্য জ্ঞানের ভাব উদ্রিক্ত করিয়াছেন, তাহা অধিকতর না হইলেও তত্তুল্য স্মৃতিচিহ্ন বলিতে হইবে।"

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা "সখা"র জন্য সমাধিস্তম্ভের এক ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলাম। তাহা লিথগ্রাফ করিয়া তোমাদিগকে উপহার দিতেছি। [illegible] সঙ্গে স্তম্ভের [illegible] মধুস্থদন দত্তের এবং [illegible] ছবি দিলাম। [illegible] বাবু, কালীচরণ বাবু, [illegible] বাবুর প্রতিমূর্ত্তি সখায় দিবার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ফটোগ্রাফ চাহিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই সখাকে আপন আপন ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ধাঁধা।

গত অক্টোবর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। যবন।

২। বাগান।